শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের

জীবনবৃত্তান্ত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীশ্রীচরণাশ্রিত

সেবক রামচন্দ্র প্রণীত।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সমাধি-মন্দির

যোগোদ্যান, কাঁকুড়গাছী হইতে

স্বামী যোগবিনোদ কর্ত্তৃক প্রকাশিত

চতুর্থ সংস্করণ।

কলিকাতা

১৭ নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন,

"কালিকা যন্ত্রে"

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

৭৬ রামকৃষ্ণাব্দ।

সন ১৩১৭ সাল।

মূল্য ১৲ টাকা, ডাকমাশুল ৵০ আনা।



শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব।



শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রিয় শিষ্য মহাত্মা রামচন্দ্র

অবতরণিকা

পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত লিখিব বলিয়া বহুদিন হইতে বাসনা ছিল। অনুমান ছয় বৎসর অতীত হইল, একখানি ক্ষুদ্রাকারে জীবনী লিখিতও হইয়াছিল; কিন্তু ছাপা হয় নাই। সেই জীবনীখানি, কাশীর প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় দেখিয়া কাশী হইতে ছাপাইবার মানসে গ্রন্থকারের নিকট হইতে গ্রহণ করেন, কিন্তু বলিতে পারি না কি কারণে তাহা ছাপা হয় নাই। দুই বৎসর পরে সেই পাণ্ডুলিপিগুলি পুনরায় ফিরাইয়া লওয়া হয়; এতাবৎ কাল তাহা তদবস্থাতেই ছিল। সম্প্রতি বরিজহাটী নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু অপূর্ব্বচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের উৎসাহে আমরা এই গুরুতর কার্য্যে পুনরায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। কৃতকার্য্য হওয়া না হওয়া ভগবানের ইচ্ছা।

জীবনবৃত্তান্ত লেখা কঠিন হইলেও অসাধ্য নহে। কারণ ঘটনাবলীর যথাযথ বিন্যাস করাই জীবনীর উদ্দেশ্য। কিন্তু পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত সেরূপ নহে, সাধুই হউন আর অসাধুই হউন, প্রত্যেক ব্যক্তি কোন প্রকার নিয়মে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। কেহ সত্যবাদী, কেহ না হয় মিথ্যাবাদী, কেহ কপটী, কেহ সরল, অথবা কাহার জীবনে কোন কোন ভাব মিশ্রিত আছে। পরমহংসদেবের জীবনে সে প্রকার কোন বিষয় ধরিতে পাওয়া যায় না, তাঁহার কার্য্যকলাপ অতিশয় বিচিত্র প্রকার, সহজে কিম্বা অতিশয় চেষ্টা করিলেও তাহার প্রকৃত ভাব জ্ঞাত হওয়া যায় না। তাঁহার জীবনের যে দিক দেখা যায়, সেই দিকেই আশ্চর্য্য হইতে হয়। তাহাতে কোন বিষয়ের অভাব ছিল না। যে ভাবে যে কেহ তাঁহার নিকট পরামর্শ চাহিয়াছেন, সেই রূপেই তাঁহার দ্বারা সহায়তা লাভ করিয়া গিয়াছেন। তিনি কখন গভীর জ্ঞানসম্পন্ন গুরুরূপে, কখন বরদাতা ইষ্টদেবরূপে, কখন বৈজ্ঞানিক সাধুরূপে, কখন ধীসম্পন্ন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বন্ধুরূপে, কখন স্নেহময়ী মাতারূপে, কখন ন্যায়বান পিতারূপে প্রকাশ পাইয়াছেন।

তাঁহার এই ভাব-বৈচিত্র্য দেখিয়া, নিতান্ত সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া বিশেষ চেষ্টা করিয়াও আমরা কোন কারণ বা ভাবান্তর বাহির করিতে পারি নাই। করিব

কি? মন প্রাণ যে হরণ করিয়া লইতেন। কোন কার্য্য করিবার আর অধিকার থাকিত না।

আমরা পাছে প্রতারিত হই, এ ভাবনা বিলক্ষণ ছিল! মনুষ্যের কর্ত্তব্য কি, তাহাও এক প্রকার পাঁচজনের মত স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম্। বিজ্ঞান, দর্শনাদি দ্বারা বিশুদ্ধ ভাববিশিষ্ট হইলে যে প্রকারে ধর্ম্ম হইবার সম্ভাবনা, তাহাও জানিয়া রাখিয়াছিলাম, কি করিতে আছে এবং কি করিতে নাই তাহাও জানা ছিল; কিন্তু কি করিব! ঈশ্বর নাই বলিয়াই বিশ্বাস ছিল এবং স্বভাব ব্যতীত আর কিছু স্বীকার করা না করা একই কথা বলিয়া ধারণা ছিল; তিনি সে সকল বিকৃত করিয়া দিলেন। আমাদের বিদ্যা বুদ্ধি আর তাঁহার নিকট স্থান পাইল না, পূর্ব্বে যে সকল সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক বলিয়া ধারণা হইয়া গেল। তাঁহাকে যাহা বলিবার নয়, আমরা তাহাও বলিয়া ফেলিলাম।

এই প্রকার জীবনী লেখাও কঠিন এবং পাঠ করাও কঠিন। পাঠক পাঠিকাগণ! আপনারা যে প্রকার সাধারণ জীবনচরিত পাঠ করিয়া থাকেন, ইহা সে প্রকার নহে। আমরা যেমন প্রথমে পরমহংসদেবকে মনে করিয়াছিলাম, তাহার পর সে সংস্কার পরিবর্ত্তন হইয়া যায়, আপনাদের দশাও সেইরূপ হইবে। বর্ত্তমানকালে পরমহংসদেবের জীবনীর ন্যায় জীবনী কেহ কস্মিন্ কালে আশাও করেন নাই এবং পাইলেও বিশ্বাস হইবে না। আজ কাল যেমন বাজার, গ্রন্থকারেরা প্রায় সেইরূপে পরিচালিত হইয়া থাকেন। সে স্থলে তাহাদের সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই গ্রন্থকার আপনার শ্রম সফল জ্ঞান করিয়া থাকেন এবং পুস্তকের সংস্করণের উপর সংস্করণ হইয়া যায়। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্যও তাহা নহে এবং আমাদের পাঠক পাঠিকারাও তাহা আশা করিতে পারেন না।

জীবনী লিখিতে হইলে কাহারও মুখাপেক্ষা করা যায় না। যাহা ঘটনা, তাহার অপলাপ করিলে বিষম দোষ ঘটিয়া থাকে। এই নিমিত্ত অনেক গুহ্য কথাও আমরা ব্যক্ত করিয়া ফেলিয়াছি।

পরমহংসদেবের সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিত হইল, তাহার কিয়দংশ আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং কিয়দংশ তাঁহার শ্রীমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি। তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে পরমহংসদেবের আত্মীয় শ্রীহৃদয়ানন্দ মুখোপাধ্যায় যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, আমরা সেইরূপ লিখিতে বাধ্য হইয়াছি। এই

বিষয়টী সত্য কি না, অবগত হইবার নিমিত্ত শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন মিত্র মহাশয় পরমহংসদেবের স্বদেশে গমন পূর্ব্বক, তথাকার লোকের নিকট সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া হৃদয়ের কথাই পোষকতা করিয়াছেন।

পরমহংসদেবের কার্য্য কলাপের ধারাবাহিক বিবরণ লিখিবার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাহা পারিলাম না। তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা তিনি ভিন্ন অপরে কেহ জানেন না। এমন কি, হৃদয় তাঁহার সহিত একত্রে থাকিয়াও, বিশেষ কিছুই অবগত নহেন। দক্ষিণেশ্বরের প্রাচীন ব্যক্তিদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছি, তাঁহারা কিছুই বলিতে পারেন নাই। পরমহংস-দেব দিন তারিখ মাস সন কাহাকে বলে জানিতেন না। কোন্ সাধনের পর কি করিয়াছেন, তিনি আমাদের যাহা বলিয়াছেন, আমরা তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম।

তিনি আমাদের অনেক কথাই কহিয়াছেন, কিন্তু তৎসমুদয় এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সন্নিবেশিত করা অসম্ভব এবং সাধারণের সমক্ষে সে সকল গভীরতম কথা বলায় কোন ফল নাই। কার্য্যক্ষেত্র দেখিয়া ভবিষ্যতে একখানা কেন, বোধ হয়, ভূরি ভূরি গ্রন্থ প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

পাঠক পাঠিকাগণ! আপনাদের প্রতি আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। এই রামকৃষ্ণচরিত পাঠ করিতে যগুপি আপনাদের কোন স্থানে সন্দেহ কিম্বা জিজ্ঞাস্য থাকে, তাহা হইলে সেই বিষয় লিখিয়া পাঠাইলে আমরা অতি আনন্দের সহিত সে সম্বন্ধে বলিবার যে টুকু শক্তি থাকিবে, বলিব, তাহার ত্রুটি হইবে না।

কলিকাতা।
১১ নং মধুরায়ের লেন।
রথযাত্রা, সন ১২৯৭ সাল।

ভক্তানুগৃহীত
শ্রীরামচন্দ্র দত্ত দাসস্য

সূচীপত্র

বিষয়।		পৃষ্ঠা।
ডাক্তার সরকারের সহিত গিরীশ ও জনৈক ভক্তের বিচার		১৪০
কালীভাবে পূজা গ্রহণ	...	১৪২
কাশীপুরে আসন পরিবর্ত্তন	...	১৪৪
কল্পতরু রূপ প্রদর্শন	...	১৪৫
শশীর সেবা ও দাস্য ভক্তি	...	১৪৭
মহাসমাধি	...	১৫০
কাশীপুরে দেহের অগ্নি-সংস্কার	...	১৫৩
কাঁকুড়গাছীর যোগোদ্যানে সমাধি	...	১৫৪

পরিশিষ্ট।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের

জীবনবৃত্তান্ত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

হুগলি জেলার অন্তঃপাতী শ্রীপুর কামারপুকুর গ্রামে শ্রীক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের নিবাস ছিল। প্রবাদ আছে যে, এই চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অতিশয় ধর্ম্মনিষ্ঠ ও প্রকৃত জাপক ছিলেন। তিনি এমন ভক্তিসহকারে তাঁহার ইষ্টমূর্ত্তি রঘুবীরের পূজার্চ্চনাদি করিতেন যে, বাহিরের লোকেরা ঠাকুর যেন প্রত্যক্ষ হইয়া পূজা গ্রহণ করিতেছেন, এরূপ অনুমান করিত। আরও প্রবাদ আছে যে, তিনি একটী সরোবরে প্রত্যহ স্নান করিতেন। যে পর্য্যন্ত তাঁহার স্নান সমাপন না হইত, সে পর্য্যন্ত পুষ্করিণীতে অন্য কোন ব্যক্তি পাদ্-নিমজ্জিত করিতে সাহস করিত না। তাঁহার তপঃপ্রভাবে তদ্‌পল্লিস্থ সকলেই বশীভূত ছিল এবং সহসা কেহই তাঁহার সমীপে অগ্রসর হইতে পারিত না। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সুশীলা ও সদ্‌গুণসম্পন্না এক সহধর্ম্মিণী ছিলেন। তাঁহার এমনই দয়ার্দ্র হৃদয় ছিল যে, কাহাকে ক্ষুধাতুর দেখিলে, গৃহে যে কোন দ্রব্য থাকিত, তাহা তৎক্ষণাৎ তাহাকে ভোজন না করাইয়া, তিনি কোন মতে স্থির হইতে পারিতেন না। তাঁহার গর্ভে তিন পুত্র সন্তান জন্মে। জ্যেষ্ঠ রামকুমার, মধ্যম রামেশ্বর এবং পরমহংসদেব সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিলেন।

১৭৫৬ শকাব্দার ১০ই ফাল্গুন, শুক্লপক্ষ দ্বিতীয়া তিথি, বুধবারে পরমহংস-দেব ভূমিষ্ঠ হন।*

পরমহংসদেব বাল্যকালে কিঞ্চিৎ কৃশকায় ছিলেন। তিনি দেখিতে উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, সকলের প্রিয় এবং মিষ্টভাষী ছিলেন। তাঁহাকে সকলে গদাই বলিয়া

* রামকৃষ্ণের জন্ম এবং বাল্যকালের অবস্থা সম্বন্ধে আশ্চর্য্য কিম্বদন্তি আছে। "ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় গয়াধামে গমন করিয়া একদিন রজনীযোগে স্বপনে দেখিলেন যে, একটি চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, "দেখ, আমি তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিব।" চটোপাধ্যায় মহাশয়ের সহসা নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল এবং মনে মনে নানাবিধ

ডাকিত; কিন্তু প্রকৃত নাম রামকৃষ্ণ ছিল। এই গ্রামে ধর্ম্মদাস লাহা নামক এক ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার পুত্র গঙ্গাবিষ্ণু লাহা। ক্ষুদিরাম ইহার সহিত রামকৃষ্ণের সেঙ্গাৎ (পল্লিগ্রামের লোকেরা যাহার সহিত বন্ধুতা করেন, তাহাকে কখন কখন সেঙ্গাৎ কহিয়া থাকেন) পাতাইয়া দেন। রামকৃষ্ণ সেই

তর্ক বিতর্ক হইতে লাগিল। যৎকালে তিনি গয়াধামে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাঁহার স্ত্রী একদিন নিজগ্রামের বাটীর সন্নিকটে অপর দুইটী প্রতিবাসিনীর সহিত দণ্ডায়মান ছিলেন। ঐ বাটীর সন্নিধানে একটী শিবের মন্দির আছে। সেই শিবালয়ের দিক হইতে ঘনীভূত বায়ু তাঁহার উদর মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ ঐ সঙ্গিনীদ্বয়কে কহিলেন। ইহাদের মধ্যে একজনের নাম ধনি ছিল। পরে ক্রমে ক্রমে তাঁহার গর্ভের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় বাটীতে আসিয়া এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, না স্ত্রীর প্রতি সন্দেহ করিলেন, না তাঁহার স্বপ্নবৃত্তান্ত কাহাকেও খুলিয়া বলিলেন। গর্ভকালে রামকৃষ্ণের জননীর রূপলাবণ্যের ইয়ত্তা ছিল না। পাড়ার মেয়েরা বলিত, "মাগীর শেষবয়সে এমন রূপ হইল কেন? বোধ হয় এইবার মরিবে।" তিনি সকলের কাছে বলিতেন যে, আমি কত রকমের ঠাকুর দেবতা দেখিতে পাই। এত সন্তানাদি হইয়াছে, কিন্তু কখনও এমন দেখি নাই। লোকেরা মাগী পাগল হইয়াছে বলিয়া উপহাস করিত। দশমাস দশদিন পূর্ণ হইলে রামকৃষ্ণ ভূমিষ্ঠ হন। তাঁহার পিতা তাঁহার নাম গদাধর রাখিলেন, লোকে সেইজন্য গদাই বলিয়া ডাকিত। ইতিপূর্ব্বে ক্ষুদিরামের অবস্থা অত্যন্ত হীন ছিল। তাঁহার জেষ্ঠপুত্র রামকুমার তখন উপযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি দশকর্ম্মান্বিত ও সুদক্ষ ছিলেন। তাঁহার উদার প্রকৃতির জন্য অনেকে তাঁহাকেও পাগল বলিত। রামকৃষ্ণের জন্মকাল হইতে রামকুমারের উপার্জ্জনাদি অধিক পরিমাণে হইতে লাগিল। বাটীতে দ্রব্যাদির আর অভাব রহিল না। তিনি এইরূপ সহসা অবস্থা পরিবর্ত্তন হইতে দেখিয়া সর্ব্বদাই কহিতেন যে, আমার বোধ হয়, আমাদের বাটীতে কোন দেবতা আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা না হইলে এপ্রকার সংসারে সুখ স্বচ্ছন্দতা কিরূপে হইল? একদিন ক্ষুদিরাম এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিয়াছিলেন যে, "তোমরা একটা বিপদ না ঘটাইয়া ছাড়িবে না। যাহা হয় হইয়াছে, ও কথা কাহার নিকট বলিতে নাই।"

রামকৃষ্ণ যখন চতুর্থ কিম্বা পঞ্চম মাসে উপনীত হইয়াছেন, একদিন তাঁহার মাতা গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার শিশু সন্তান নাই, একটী আট দশ বৎসরের বালক শয়ন করিয়া রহিয়াছে। তিনি অতি ব্যস্তে চীৎকার করিয়া বাহিরে আসিলেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই চীৎকার শুনিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করায়, তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা ব্যক্ত করিলে পর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কহিলেন, এ সকল হইবে তাহা আমি জানি, তুমি গোলমাল করিও না। মাতার প্রাণ কি তাহাতে শান্তিলাভ করিতে পারে? তিনি পুনরায় কহিলেন যে, "তুমি রোজা আনাইয়া একটা উপায় কর, বালককে ভূতে পাইয়াছে।" রঘুবীর আছেন, তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে, এই বলিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন।

জন্য লাহাদের বাটীতে সর্ব্বদা গমনাগমন করিতেন। গঙ্গাবিষ্ণুর মাতা রামকৃষ্ণকে গদাধর বলিয়া ডাকিতেন। যখন তিনি যে দ্রব্য প্রস্তুত করিতেন, অগ্রে গদাধরকে খাওয়াইতেন এবং সর্ব্বদা বলিতেন, হ্যাঁরে গদাধর! তোকে কেন এত ভালবাসি বল্ দেখি। তোকে না দেখ্‌লে প্রাণ চঞ্চল হয়ে উঠে। কখন কখন তোকে ঠাকুর ব'লে জ্ঞান হয়।" রামকৃষ্ণ একটু হাসিয়া চলিয়া যাইতেন।

এই লাহাবাবুদের অতিথিশালা ছিল। (শুনিয়াছি অদ্যাপিও আছে)। সুতরাং নানাভাবের নানাবিধ অতিথি তথায় আসিতেন। রামকৃষ্ণ অতিথিদিগের সহিত বসিয়া থাকিতেন। তাঁহারা তাঁহাকে তিলকাদি পরাইয়া দিতেন এবং যে সকল ভোজ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতেন, তাহা তাঁহাকে খাওয়াইতেন। মধ্যে মধ্যে অতিথিরা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া রামকৃষ্ণের পিতামাতাকে দেখিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাদের বাটীতে যাইতেন। একদিন রামকৃষ্ণ একখানি নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া অতিথিদিগের নিকট গিয়াছিলেন। তিনি তথায় যাইয়া সেই বস্ত্রখানিকে খণ্ড খণ্ড পূর্ব্বক আপনি কোপিন পরিধান করেন এবং অপর খণ্ড হস্তে লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও জননীর নিকট কহিলেন, "তোমরা দেখ, কেমন আমি সাধু সেজেছি। আজ সাধুরা আমায় সাজিয়ে দিয়েছে, রুটি খাওয়াইয়াছে, আমি ঘরে কিছুই খাব না।"

রামকৃষ্ণকে এইরূপে যে আদর করিয়া লইয়া যাইত, জাতি বিচার না করিয়া তাহারই প্রদত্ত অন্ন ভোজন করিতেন। লেখা পড়া সম্বন্ধে একেবারে তাঁহার কিছুই আস্থা ছিল না (তাঁহার হস্তলিখিত একখানি রামায়ণ আছে, তাহাতেই তিনি যে লেখা পড়া কিরূপ জানিতেন, স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে)। এজন্য বাঙ্গলাভাষাও ভাল করিয়া শিক্ষা করেন নাই। যখন তাঁহাকে পাঠশালায় প্রেরণ করা হয়, তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে, "লেখা পড়া শিখিয়া কি করিব? তাহার ফল ত কেবল চালকলা; এমন বিদ্যা আমি শিখিব না।" তাঁহার মেধা শক্তি এত প্রবল ছিল যে, যখন যে কোন বিষয় শ্রবণ করিতেন, তৎক্ষণাৎ তাহা তাঁহার অভ্যাস হইয়া যাইত। এইরূপে যাত্রা, কীর্ত্তন, চণ্ডীর গীত ও নানাবিধ সঙ্গীতাদি তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়াছিল। প্রতিবেশীরা তাহার নিকট সময়ে সময়ে সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া সুখী হইতেন। তাঁহার কণ্ঠ অতি সুমধুর ছিল। যাঁহারা তাঁহার বয়োবৃদ্ধকালে সঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারা বালক কালের অবস্থা কিয়ৎপরিমাণে অনুমাণ করিতে পারিবেন।

রামকৃষ্ণের ভূমিষ্ঠকাল হইতে কিশোরকাল পর্য্যন্ত ধনি নাম্নি এক কর্ম্মকারের কন্যা তাঁহাকে লালন পালন এবং পুত্রাধিক স্নেহ করিত। ধনি স্নেহবশে রামকৃষ্ণ যে ব্রাহ্মণকুমার, তাহাও বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল। ধনি যখন যাহা ভক্ষণ করিত, তাহা রামকৃষ্ণকে না দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিত না। রামকৃষ্ণের জ্ঞান হইলে পর, ধনি বলিয়াছিল যে, "বাবা! তোমার পৈতের সময় আমি তোমাকে ভিক্ষা দিব।" রামকৃষ্ণ তাহা স্বীকার করিয়াছিলেন। পরে যখন উপনয়নের দিন উপস্থিত হইল, রামকৃষ্ণ ধনির নিকট অগ্রে ভিক্ষা চাহিলেন। ধনি শূদ্রজাতি, ব্রহ্মচারীকে কি বলিয়া ভিক্ষা দিবে, এই হেতু রামকুমার আপত্তি উত্থাপন করিলেন, কিন্তু পরিশেষে রামকৃষ্ণের ইচ্ছাই ফলবতী হইয়াছিল। ধনি তদবধি রামকৃষ্ণের ভিক্ষামাতা হইলেন।

কৃষ্ণলীলা বিষয়ক প্রায় সমুদয় ঘটনাবলী তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। সময়ে সময়ে রাখাল বালক ও অন্যান্য বয়স্যদিগের সমভিব্যাহারে মাঠে গমন করিতেন। তিনি নিজে কৃষ্ণ সাজিতেন এবং অন্যান্য বালকদিগকে শ্রীদাম সুবল ইত্যাদি নাম প্রদান করিয়া বৃন্দাবনের ভাব ক্রীড়া করিতেন, যাঁহারা দূর হইতে সেই সকল অবলোকন করিতেন, তাঁহারা চমৎকৃত ও আনন্দে বিমোহিত হইয়া যাইতেন। ঠাকুর দেবতার প্রতি রামকৃষ্ণের ভক্তি ছিল এবং স্বহস্তে মৃত্তিকার ঠাকুর গড়িয়া পূজা করিতেন ও সময়ে সময়ে তিনি তদ্ভাবে অচেতন হইয়া পড়িতেন। এইরূপে প্রায় দশ বারো বৎসর অতিবাহিত হইয়া যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রামকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কলিকাতার অন্তঃপাতী ঝামাপুকুর নামক স্থানে একটী চতুষ্পাঠী ছিল। তিনি লেখা পড়ার উদ্দেশ্যে তথায় আসিয়া অবস্থিতি করেন। কিন্তু এ স্থানে আসিয়াও পাঠ সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগী হন নাই। পাড়ার ভদ্রমহিলারা তাঁহাকে বিশেষ ভালবাসিতেন এবং তাঁহার নিকট গীত শ্রবণ করিয়া প্রীতিলাভ করিতেন। একে ব্রাহ্মণ, তাহাতে বালক, দেখিতে রূপবান্, মিষ্টভাষী এবং মধুর গীত গান করিতে পারিতেন; সুতরাং, পাড়ার প্রত্যেক হিন্দু মহিলার নিকট সমাদৃত হইতেন।

সন ১২৫৯ সালের আষাঢ় মাসে কলিকাতার দক্ষিণ বিভাগের অন্তঃপাতী

জানবাজারনিবাসিনী মাড়-কুল-গৌরবা বিখ্যাতনামা রাসমণি দাসী দক্ষিণেশ্বর নামক স্থানে প্রচুর অর্থব্যয়ে কালী ও রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তিদ্বয় তাঁহার গুরুর নামে স্থাপন করিয়া, পরমহংসদেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সুদক্ষ এবং সুপণ্ডিত জানিয়া, পূজা-কার্য্যে বরণপূর্ব্বক দক্ষিণেশ্বরে প্রেরণ করেন। পরমহংসদেবও অগত্যা জ্যেষ্ঠের সমভিব্যাহারে গমন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

যে দিবস উক্ত দেবদেবী প্রতিষ্ঠিত হন, সেই দিবস তথায় জনাকীর্ণ হইয়াছিল। ধূমধামের ইয়ত্তা ছিল না। ভোজ্য পদার্থ অপরিমিত পরিমাণে প্রস্তুত হইয়াছিল; কিন্তু পরমহংসদেব তাহা কিছুই স্পর্শ করেন নাই। তিনি সমস্ত দিবস অনাহারে থাকিয়া রাত্রিকালে নিকটস্থ এক মুদীর দোকান হইতে এক পয়সার মুড়্কী ক্রয় করিয়া ভক্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি কি জন্য যে মন্দিরের সামগ্রী স্পর্শ করেন নাই, আমরা তাহার কোন কারণ প্রদর্শন করিতে পারিলাম না।

দক্ষিণেশ্বর কলিকাতার উত্তর অনুমান তিন ক্রোশ দূর হইবে। ঠাকুরবাটীর উদ্যান গঙ্গার পূর্ব্বতীরে অবস্থিত। প্রবাহিনী স্বভাবতঃই প্রীতিপ্রদ; বিশেষতঃ, হিন্দুগণ যখন জাহ্নবীর তীরে দণ্ডায়মান হইয়া, তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তখন তাঁহাদের হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় ভক্তিভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে। সেই সঙ্গে দেবমন্দির। যাহার প্রকাণ্ড আকার, শিল্পকার্য্যপ্রসূত মনোহর দৃশ্য ও গম্ভীর ভাব প্রত্যক্ষ করিলে, এমন কি ভিন্ন শ্রেণীর দর্শকমণ্ডলীরও চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া যায়। এই দেব উদ্যানের উত্তরাংশে জাহ্নবী-কূলে দীর্ঘকাল-ব্যাপী অতি বিস্তীর্ণ একটী বটবৃক্ষ আছে। ইহার কাণ্ড প্রকাণ্ড, শাখা প্রশাখা দ্বারা অনুমান এক বিঘা জমি সমাচ্ছাদিত হইয়া আছে। মধ্যে মধ্যে তাহার শাখাদিগের অবলম্বন স্বরূপ এক একটী ঝুরি লম্বমান হইয়া গুঁড়ীবিশেষ হইয়া গিয়াছে। ইহার দক্ষিণ ভাগে একখানি কুটীর ছিল। এক্ষণে সে স্থানে ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ হইয়াছে। এই বটবৃক্ষের উত্তর পূর্ব্বাংশে একটী বেলগাছ আছে। পরমহংসদেবের জীবনচরিত্র সম্বন্ধে এই বৃক্ষদ্বয়ের বিশেষ সম্বন্ধ আছে, সেই জন্য উহারা উল্লিখিত হইল।

রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে গমন করিয়া, প্রথমে বেশকারী, পরে রাধাকৃষ্ণ পূজায় ব্রতী হইয়াছিলেন। অনন্তর তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার লোকান্তর গমনে রাসমণি দাসী তাঁহাকে কালীপূজায় নিযুক্ত করেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রামকৃষ্ণ যখন পঞ্চদশ কিম্বা ষোড়শ বর্ষে উপনীত হন, সেই সময়ে তাঁহার অভিভাবকেরা বিবাহের জন্য অনুষ্ঠান করেন। রামকৃষ্ণ বিবাহের কথা শুনিয়া কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নাই; বরং তিনি তাহাতে আনন্দিত হইয়াছিলেন। বিবাহ কি, কেন বিবাহের প্রয়োজন, তাহা তিনি কিছুই জানিতেন না। বিশেষতঃ ঈশ্বরানুরাগী ১৫।১৬ বৎসরের বালকের পক্ষে কখনই সম্ভবনীয় নহে।

রামকৃষ্ণের স্বদেশের নিকটস্থ জয়রামবাটী নামক গ্রামে রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যাকে তাঁহার পাত্রী স্থিরীকৃত করা হয়। পাত্রীর নাম শ্রীমতী সারদা মণি দেবী। সারদামণির বয়ঃক্রম তখন আট বৎসর মাত্র।

বিবাহের দিন স্থির হইলে, রামকৃষ্ণ আনন্দচিত্তে দেশে শুভযাত্রা করেন এবং শুভলগ্নে বিবাহাদি সমাধা করিয়া পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক স্বকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

বিবাহের পর সময়ে সময়ে তাঁহার স্ত্রীর কথা মনে পড়িত। কখন কখন শ্বশুরালয়ে গমন করিবার জন্যও মনে বাসনা হইত; কিন্তু মনের সাধ মনে উঠিয়া মনেই ক্রীড়া করিত এবং উহা মনেই বিলয় প্রাপ্ত হইয়া যাইত।

রামকৃষ্ণ পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন যে, মনুষ্যদিগের বিবিধ সংস্কার আছে। যথা, কর্ণবেধ, চূড়াকরণ, দীক্ষা, যজ্ঞোপবীত, বিবাহ ইত্যাদি। বিবাহকালীন তাঁহার মনে মনে ঐ ভাব বলবতী ছিল। এই জন্যই বোধ হয়, পরিণয়কালে তিনি কোন প্রকার মতামত প্রকাশ করেন নাই। বিবাহের পর যে শ্বশুরালয়ে গমনের অভিলাষ হইত, তাহার কারণ কিছুই তিনি জানিতেন না। বোধ হয়, ঠাকুরবাটীর অন্যান্য ব্যক্তিরা যখন ঐ সম্বন্ধে কথোপকথন করিত, তখনই তাঁহারও মনে শ্বশুরালয়ের উদ্দীপন হইয়া যাইত; কিন্তু তাঁহার আশা আর ফলবতী হয় নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রামকৃষ্ণ পূজায় ব্রতী হইয়া অতি বিচিত্র ভাবে তাহা সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। তিনি নিতান্ত আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তিসহকারে দেবীর পূজা করিতেন। কখন তাঁহাকে সুবাসিত পুষ্প মাল্যাদির দ্বারা মনের সাধে সুসজ্জিত করিতেন, কখন বা দেবীর চরণকমলে কমল-কুসুম অথবা বিল্ব জবা স্থাপন পূর্ব্বক অপূর্ব্ব চরণ-শোভা সন্দর্শন করিয়া আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইতেন। কখন বা রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত ও সময়ান্তরে নরেশচন্দ্র প্রভৃতি শক্তি-সাধকগণবিরচিত শক্তি-বিষয়ক গীতগুলি গান করিতেন। কখন বা কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হইয়া সরোদনে বলিতেন, "মা! আমায় দয়া কর্ মা, তুই মা রামপ্রসাদকে দয়া কর্লি, তবে আমায় কেন দয়া কর্বি না মা! মা! আমি শাস্ত্র জানি না মা! আমি পণ্ডিত নই মা, মা! আমি কিছুই জানি না,আমি কিছুই জানিতে চাহি না, তুই আমায় দয়া কর্বি কি না বল্? মা! আমার প্রাণ যায় মা, আমায় দেখা দাও; আমি অষ্টসিদ্ধাই চাই না মা, আমি লোকের নিকট মান চাই না মা, লোক আমায় জানুক, মানুক, গনুক, এমন সাধ নাই মা, তুই আমায় দেখা দে।" রামকৃষ্ণ এইরূপে প্রত্যহ সন্ধ্যার পর আরতি সমাপন করিয়া একাকী দেবীর সম্মুখে উপবেশনপূর্ব্বক রোদন করিতেন এবং দর্শনের জন্য কতই প্রার্থনা করিতেন। যখন ভক্তেরা দেবদেবীর মন্দিরে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহাদের হৃদয়ে যে কি অপূর্ব্ব ভক্তির উদ্রেক হয়, তাহা ভক্তমাত্রেই অনুভব করিয়া থাকেন। উহা বাক্য অথবা শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা কখনই সাধ্যসঙ্গত নহে। এমন্ দেবী-মন্দিরে দেবীর সম্মুখে, তাহাতে নির্জ্জন স্থান, আবার তদ্সহ বালকের সরল ও অকপট বিশ্বাস এবং অনুরাগ। যে যে অবস্থা অনুকূল হইলে ঈশ্বর দর্শন হয়, অর্থাৎ অনুরাগ এবং অকপট বিশ্বাস,রামকৃষ্ণের তাহাই হইয়াছিল। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং তাঁহার চরণে মনার্পণ করা, প্রত্যেক ধর্ম্মের মূল কথা, রামকৃষ্ণও তাহাই করিয়াছিলেন। তিনি দিবারজনী মা কালীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। ক্রমে প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। যখন প্রাণ কাঁদিল, যখন ব্রহ্মময়ী দর্শনের জন্য প্রাণ ছুটিল, যখন জগতের সমুদয় বস্তু হইতে প্রাণ বিদায় গ্রহণ করিল, যখন প্রাণ মাতার দর্শনাভাবে ওষ্ঠাগত হইল, তখন অন্তর্যামিনীও তাহা জানিলেন। একদিন রামকৃষ্ণ দেবীর সম্মুখে উপবেশন

করিয়া "মা! আমায় দেখা দে মা" বলিয়া রোদন করিতেছিলেন, এমন সময়ে তিনি সহসা উন্মত্তের ন্যায় হইয়া পড়িলেন। মুখমণ্ডল ও চক্ষুদ্বয় আরক্তিম হইল, চক্ষের দৃষ্টি বহির্জ্জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল; অবিরাম নয়নধারায় বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যে স্থানে উপবিষ্ট ছিলেন,সেই স্থান যেন প্লাবিত হইতে লাগিল। অন্যান্য লোকেরা তাঁহাকে স্থানান্তরে লইয়া গেল। পরদিন দিবাভাগে নয়নোন্মীলন করিতে পারিলেন না। মুখে আহার তুলিয়া দিলে তবে ভোজন করিলেন। শৌচ প্রস্রাব অজ্ঞাতসারে হইয়া যাইত, কিন্তু কেবল মা বলিতে পারিতেন এবং মা মা করিয়া রোদন করিতেন। রামকৃষ্ণের এই অবস্থা ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তখন তাঁহার এই অবস্থাটী যেন মাতৃস্তনপায়ী বালকের ন্যায় হইয়াছিল। শিশু যেমন তাহার জননীকে না দেখিতে পাইলে, মা মা বলিয়া চীৎকার করিয়া থাকে, রামকৃষ্ণকে দেখিলে অবিকল তাহাই মনে হইত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার সেই সময়ে কি অবস্থা লাভ হইয়াছিল ও মনের ভাব কিরূপ ছিল, তাহা আমরা কি জানিব এবং কিরূপেই বা বর্ণনা করিব? তবে বাহিরের লক্ষণ দেখিয়া, শাস্ত্রের সাহায্যে, সাধুদিগের বাক্যক্রমে এবং গুরুপ্রসাদে এইমাত্র বলিতে পারা যায় যে, তিনি বিরহাবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন। কারণ একবার সেই সচ্চিদানন্দময়ীর জ্যোতিঘনমূর্ত্তি দর্শন করিয়া, তাঁহার সুন্দর ছবি, অলৌকিক রূপলাবণ্য, অনির্ব্বচনীয় ভাবকান্তি, জগদানন্দের ঘনীভূত রূপ দেখিয়া তাহাতে বঞ্চিত হইবামাত্র বিরহ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। এই বিরহাবস্থার বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। ঈশ্বরকে দর্শন না করিয়া, তাঁহার অস্তিত্ব উপলব্ধি না করিয়া, তাঁহার স্বরূপজ্ঞান না পাইয়া, কেবল নাম শ্রবণ পূর্ব্বক যখন মনুষ্যগণের প্রবল অনুরাগের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে, তখন তাঁহাকে একবার দেখিলে, অথবা তাঁহার শক্তির বিশেষ কোন প্রকার প্রকাশ দেখিতে পাইলে, অনুরাগ যে পরিবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, তাহার কিছুই বিচিত্রতা নাই। রামকৃষ্ণ ইতিপূর্ব্বে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ লাভ না পাইয়াই যখন অনুরাগের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন, তখন দর্শনের পর কি কেবল চক্ষের দেখাতে তাঁহার প্রাণে তৃপ্তি লাভ হইতে পারে? আমরা যদ্যপি কোন মহাত্মার সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে তাঁহার অন্ততঃ দুটো কথা না শুনিয়া কখনই স্থানান্তরে গমন করিতে আমাদের ইচ্ছা হইবে না। মহান্ হইতে মহান্ যিনি, শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতম যিনি, আনন্দ হইতে পরমানন্দ যিনি, সৎ হইতেও সৎ যিনি, মঙ্গল হইতে পরমমঙ্গল যিনি, তাঁহার

স্বরূপ দর্শন করিয়া রামকৃষ্ণ যে প্রেমাকাঙ্ক্ষী না হইবেন, তাহা চিন্তা করিয়া সাব্যস্থ করিতে হইবে না। যে রূপ বিচারের অতীত, বিজ্ঞানশাস্ত্র সম্যক্ রূপে যাহার বৃত্তান্ত দিতে পারে না; যাঁহার মহিমা অপার, অনন্ত এবং অতুল; যাঁহার সম্বন্ধে অগণন শাস্ত্র, অগণন মত, অগণন ভাব বিভিন্ন অর্থে পরিচয় দিতেছে; বেদে যাঁহাকে অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অনাদি বলিয়া নিরস্ত হইয়াছে; যাঁহার দর্শন ষড়দর্শনে একপ্রকার অদর্শন করিয়া দিয়াছে; পুরাণে যাঁহার কত রূপের বর্ণনা করিয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবতে যাঁহার প্রেমের কাহিনীর স্রোত চালাইয়াছে, সেই জগৎপতি জগদীশ্বরকে দর্শন করিয়া মনোমধ্যে যে কিপ্রকার আনন্দ ও উৎসাহ সমুত্থিত হইবার সম্ভাবনা, তাহা সাধারণ মনের সম্পূর্ণ বহির্ভূত কথা।

রামকৃষ্ণ এই উন্মত্তাবস্থায় ক্রমান্বয়ে ছয়মাস ছিলেন। শাস্ত্রে বিরহের যে সকল লক্ষণ উল্লিখিত আছে,তৎসমুদয়ই তাঁহাতে প্রকাশ পাইয়াছিল। তদনন্তর ক্রমে ক্রমে তাঁহার এই অবস্থা কিয়ৎপরিমাণে সাম্য হইয়া আসিতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রামকৃষ্ণ উন্মত্তাবস্থা অতিক্রম করিয়া যখন সহজ ভাব প্রাপ্ত হইলেন, তখন তাঁহার সাধনকার্য্য আরম্ভ হইল। তিনি সর্ব্বদা বলিতেন যে, "ফুল না হইলে ফল হয় না, কিন্তু অলাবু ও কুমড়াদির অগ্রে ফল বহির্গত হয়, তদনন্তর ফুল ফুটিয়া থাকে।" রামকৃষ্ণের অগ্রে ঈশ্বর-দর্শন, তদনন্তর সাধন কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল।

ঈশ্বরসাধনে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে মনকে যেরূপে প্রস্তুত করিতে হয়, রামকৃষ্ণ তাহাই করিয়াছিলেন। তাঁহার মনে উদয় হইল যে, অভিমান বা অহঙ্কার ঈশ্বর পথের কণ্টক এবং আবরণ-স্বরূপ; কারণ মনে যদ্যপি অহংজ্ঞান নিয়ত পরিপূর্ণ থাকে, তাহা হইলে সে স্থানে ঈশ্বরভাব কখনই প্রবেশ করিতে পারিবে না। তিনি তন্নিমিত্ত প্রত্যহ সরোদনে মাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেন, "মা! আমার অহং নাশ করিয়া দাও। আমার আমি বিলুপ্ত করিয়া তথায় তুমিই বর্ত্তমান থাক। আমি হীনের হীন, দীনের দীন, এই বোধ যেন আমার সর্ব্বক্ষণ থাকে। ব্রাহ্মণ হউক কিম্বা ক্ষত্রিয় হউক, বৈশ্য হউক কিম্বা শূদ্র হউক, অথবা সমাজ-গণিত নীচ ব্যক্তি, যাহারা হাড়ি মুচি বলিয়া উল্লিখিত, তাহারাই হউক; কিম্বা

পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি হউক; সকলেই মা আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এই জ্ঞান, এই বোধ, এই ধারণা হইয়া যাক্।" কখন বা এরূপ কার্য্য করিতেন, যাহাতে অন্যান্য লোকেরা বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিত। তাহাতে তাঁহার মনে কোনপ্রকার ভাবান্তর বা অভিমান আসিত না। তিনি কখন কখন মার্জ্জনী দ্বারা পায়খানা পরিষ্কার করিতেন, কিন্তু তাহাতেও তাঁহার মনে অভিমান হইত না। ইহা দেখিয়া লোকে কত কি বলিত। তিনি উপদেবতা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন বলিয়া কেহ অনুমান করিত এবং কেহ বা তাঁহার উন্মাদরোগ হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিল। এই সকল অকার্য্য দ্বারা রামকৃষ্ণ লোকের নিকট বিলক্ষণ তিরস্কারভাজন হইতেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার গ্রাহ্য হইত না। তাঁহার মনের প্রবল বেগের নিকট বন্ধুর উপদেশ, শত্রুর উপহাস, মন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের তাড়না, কিছুই স্থান পাইত না। তিনি যখন যে কার্য্য করিবেন মনে করিতেন, তাহা যে পর্য্যন্ত সমাপ্ত না হইত, সে পর্য্যন্ত তাঁহার মনোযোগের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হইত না।

রামকৃষ্ণ "মা" শব্দ এখনও পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি যাহা করিতে যাইতেন, তাহাই মাকে জানাইতেন এবং মা মা বলিয়া মধ্যে মধ্যে কতই রোদন করিতেন। তিনি কখন কখন গঙ্গাতীরে পতিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে "মা! মা!" বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহার সেই "মা" বলা অতি অপূর্ব্ব ছিল। যিনি তাঁহার সে অবস্থা দেখিয়াছেন, তিনিই বিমুগ্ধ হইয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিয়াছেন, "বালক একবারে উন্মত্ত হইয়া গিয়াছে, হয়ত উহার কোন প্রকার পীড়ায় অতিশয় যন্ত্রণা হইতেছে, সেই জন্য মা মা বলিয়া চীৎকার করিতেছে।" যখন তিনি মাকে ডাকিতেন, তখন কাহারও কোন কথার প্রত্যুত্তর দিতে পারিতেন না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

লোকের যে পর্য্যন্ত আমি জ্ঞান থাকে, সে পর্য্যন্ত তাহার কোন কার্য্য করিবার অধিকার হয় না। রামকৃষ্ণ সে অভিমান অচিরাৎ দূর করিয়া লজ্জা ঘৃণা এবং ভয় প্রভৃতি বিবিধ বন্ধন হইতে বিমুক্তি লাভ করিয়া মনঃসংযম-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি মনে মনে বুঝিতে পারিলেন যে, জড় জগতে যে সকল পদার্থ আছে, তাহাদের বিশ্লিষ্ট করিয়া দেখিলে কামিনী এবং কাঞ্চন,

এই দ্বিবিধ আদি ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। কামিনী কাঞ্চন হইতেই সকল পদার্থের সম্বন্ধ আসিয়া থাকে। কামিনী দ্বারা আপনার উৎপত্তি এবং কামিনী হইতে সন্তানাদি জন্মিয়া বিবিধ সম্বন্ধের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

যেমন, স্ত্রী দ্বারা পুত্র কন্যার জন্ম হয়। তাহাদের পরিণয়াদি হইলে কুটুম্বাদি বিস্তৃত এবং কালে তাহারা সন্তানাদি প্রসব পূর্ব্বক বংশের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে অতি বিস্তীর্ণ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া যায়। এই অবস্থায় পতিত হইলে মনুষ্যদিগের মনের আর সমতা রক্ষা হইতে পারে না। এ প্রকার ব্যক্তিদিগের মন খণ্ড খণ্ড হইয়া কোথায় চলিয়া যায়, তাহা পরে অনুসন্ধান করিয়াও প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

কাঞ্চন সম্বন্ধেও তদ্রূপ। অর্থের জন্য বিদ্যালাভ করিতে হয়, অর্থের জন্য পরপাদুকাবহন করিতেও অপমান বোধ হয় না, অর্থের জন্য কার্য্যবিশেষে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকিতে হয় এবং অর্থের জন্য সতত সশঙ্কিত ও চিন্তিত থাকিতে হয় ; সুতরাং মনের আর বিরাম কাল থাকিল না।

যে ব্যক্তি অনন্ত ঈশ্বরকে লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার পার্থিব আসক্তি অর্থাৎ কামিনীকাঞ্চনভাব বিবর্জ্জিত হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। একথা রাম-কৃষ্ণের হৃদয়ে আপনি উত্থাপিত হইয়া উঠিয়াছিল। তখন তাঁহার দিব্যজ্ঞান হইল যে, সেই সর্ব্বসারাৎসার ঈশ্বরই ইহ জগতের একমাত্র অবলম্বনীয় বস্তু এবং কামিনীকাঞ্চন অসার ও ত্যজনীয় পদার্থ। তিনি তদনন্তর এক হস্তে রৌপ্য মুদ্রা ও অপর হস্তে এক খণ্ড মৃত্তিকা লইয়া মনকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতেন, "মন! ইহাকে বলে টাকা ও ইহাকে বলে মৃত্তিকা। মন! এক্ষণে ইহাদের বিচার করিয়া দেখ। টাকা রূপার চাক্তি বা গোলাকার, ইহাতে বিবির মুখ অঙ্কিত আছে। ইহা জড় পদার্থ। টাকায় চাউল, বস্ত্র, বাড়ী, হাতী, ঘোড়া ইত্যাদি হয়, দশজনকে ডাল ভাত খাওয়ান যায় এবং তীর্থযাত্রা, দেবতা ও সাধু সেবাও হইয়া থাকে, কিন্তু সচ্চিদানন্দ লাভ হইবার উপায় নাই। কারণ অর্থের দ্বারা মনে অহঙ্কার উপস্থিত হয়। ইহার দ্বারা অহংভাব একে-বারে বিনষ্ট হইতে পারে না। অর্থে কখনই আসক্তিবিহীন মন হয় না। সুতরাং দেবতা বা সাধুর উদ্দেশে কার্য্য হইলেও তাহাতে রজঃ তমোভাবের প্রাধান্য হইয়া উঠে ; রজঃ কিম্বা তমোতে সচ্চিদানন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।"

"সচ্চিদানন্দের প্রতি যাহার মন ধাবিত হইবে, যে কেহ পূর্ণব্রহ্মের প্রেমানন দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইবে, তাহার মনে কোন গুণের আধিক্যতা থাকিবে না।

এমন ব্যক্তির গুণত্রয় অতিক্রম করিয়া শুদ্ধসত্ত্বে গমন করা আবশ্যক। শুদ্ধসত্ত্বে উপনীত হইলে তবে ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে।” রামকৃষ্ণ তাহা জানিয়াছিলেন। তিনি ইহাও নিশ্চয় বুঝিয়াছিলেন যে, টাকায় কিঞ্চিৎ মঙ্গলজনক কার্য্য হয় বটে, কিন্তু ইহাতে যে পরিমাণ অহঙ্কার আসিয়া থাকে, তদ্দ্বারা সঞ্চিত পুণ্য অপেক্ষা কোটি কোটি গুণ পাপের প্রাদুর্ভাব হইয়া যায়। অতএব কিঞ্চিৎ পুণ্যের অনুরোধে পাপরাশি যে পদার্থ দ্বারা উপার্জ্জন করা যায়, এমন দ্রব্যে আসক্ত হওয়া দূরে থাকুক, তাহার সংস্পর্শ পর্য্যন্ত না রাখাই কর্ত্তব্য। তিনি একদা বলিয়াছিলেন যে, “কোন ব্যক্তির অতিথিশালা ছিল। যে কোন ব্যক্তি তথায় আসিত, সকলেই আশ্রয় পাইত। একদা একজন কশাই একটী গাভী লইয়া যাইতেছিল, পথিমধ্যে গাভী লইয়া কশাই বিব্রত হইয়া পড়ে। কশাই যতই গাভীকে প্রহার ও তাড়না করিতে লাগিল, সে কিছুতেই আর একপদও অগ্রসর হইল না। কশাই ক্ষুধা তৃষ্ণায় অতিশয় বিপন্নাবস্থায় পতিত হইয়া, তৎক্ষণাৎ ঐ গাভীটীকে একটী বৃক্ষে বন্ধন পূর্ব্বক সেই দাতার বাটীতে যাইয়া অতিথি হইল। অবারিত দ্বার, কশাই যাইবামাত্র অমনি উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিল। আহারান্তে বিলক্ষণ বল পাইয়া গাভীকে অনায়াসে আপন বাটীতে লইয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিল। গাভী সংহার করিবার যে পাপ হইল, তাহার অধিকাংশ সেই দাতাকে অবলম্বন করিল। কারণ তাহার সহায়তা না পাইলে কশাই গাভীকে কোন মতে লইয়া যাইতে পারিত না।”

মৃত্তিকা লইয়া তিনি বলিতেন যে, “ইহাও জড় পদার্থ. মৃত্তিকাতে শষ্য জন্মিয়া থাকে, তদ্দ্বারা জড় জীবন রক্ষা হয় বটে। মৃত্তিকায় গৃহাদি প্রস্তুত হয় এবং দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি গঠিত হইয়া থাকে। অর্থের দ্বারা যাহা হয়, মৃত্তিকার দ্বারাও তাহাই হয়। দুই, এক জাতীয় জড়পদার্থ এবং উভয়েরই পরিণাম এক প্রকার।” তিনি মনকে পুনরায় বলিতেন, “মন! ইহাদের লইয়া থাকিবে, অথবা সচ্চিদানন্দের চেষ্টা করিবে?” তাঁহার মন অর্থ লইল না, অর্থকে অতি যৎসামান্য জড়পদার্থ বলিয়া জ্ঞান হইল। তিনি নয়ন মুদ্রিত করিয়া, “টাকা মাটি, মাটি টাকা, টাকা মাটি, মাটি টাকা” ইত্যাকার বার বার জপ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল বিলম্বে তিনি টাকা ও মাটি গঙ্গায় নিক্ষেপ করিয়া দিলেন। তদবধি তিনি কখনও টাকা স্পর্শ করিতে পারিতেন না। এমন কি কোন প্রকার মূল্যবান ধাতু স্পর্শ করিলে

তিনি অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ করিতেন। যত্তপি কখন তাঁহার সমীপে কেহ অর্থের কথা বলিত, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা নিবারণ করিতেন। অর্থ লইয়া তাঁহাকে অনেকে অনেক প্রকার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার মানসিক এবং শারীরিক অনাসক্তি পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইয়াছে।

অতঃপর রামকৃষ্ণ কামিনী লইয়া বিচার করিয়াছিলেন। মনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মন! কামিনী সম্ভোগ করিবে? কামিনী কাহাকে বলে অগ্রে বুঝিয়া লও। ইহা একটী হাড়ের খাঁচা। মাংস ও তদুপরি চামড়া দ্বারা আবৃত। মুখকে চন্দ্রের সহিত কবিরা তুলনা করেন, কিন্তু সেই জ্যোতিঃ কাহার? চামড়া স্বতন্ত্র করিলে কি বহির্গত হইবে? মাংস, শোণিত এবং বসা ইত্যাদি। তাহা লইয়া কি সম্ভোগ করিতে পার? কামিনীদিগের শরীরে যে সকল ছিদ্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য আছে। শারীরিক পুষ্টি সাধনের জন্য কোন ছিদ্র দ্রব্যসামগ্রী লইয়া যাইবার প্রণালীস্বরূপ এবং কোন ছিদ্রের পুরীষ নির্গমনের জন্য ব্যবস্থা হইয়াছে। এই প্রকার যে কামিনী, তাহাকে লইয়া লোক উন্মত্ত রহিয়াছে। কামিনী দ্বারা ইহকাল পরকাল একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়। কারণ, আত্মেন্দ্রিয় সুখের জন্য যত্তপি স্ত্রী গৃহীত হয়, তাহা হইলে মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হইয়া যাইবে; ফলে, মনের শক্তি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া আসিবে। কিম্বা কেবল সন্তানাদির জন্য যথানিয়মে স্ত্রীসহবাস করিলে তাহাতেও মন বিচ্ছিন্ন হইবার বিশেষ হেতু রহিয়াছে। এইরূপ মন একদিকে স্ত্রীর মোহিনী শক্তিতে বিমোহিত হইয়া রহিল, আর একদিকে বাৎসল্য মোহে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। মনের যখন এমন অবস্থা হইল, তখন তাহার দ্বারা অনন্ত ঈশ্বরের চিন্তা কখন হইতে পারে না। সুতরাং কামিনী ঈশ্বরলাভের প্রতিবন্ধক জন্মাইয়া দিল। মন! এক্ষণে চিন্তা করিয়া দেখ, এই জড় পদার্থে তুমি বিক্রীত হইয়া থাকিবে, কিম্বা জড়পদার্থের সৃষ্টিকর্তাকে লাভ করিবার জন্য প্রস্তুত হইবে?" রামকৃষ্ণের মন কামিনী পরিত্যাগ করিল। তাঁহার মনে হইল যে, ঈশ্বরের শক্তিকে মায়া বলে। এই মায়া-শক্তি হইতে জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে। মায়াকে তিনি মাতা বলিতেন এবং মাতারূপে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। মায়া হইতে মেয়ে, এই নিমিত্ত প্রত্যেক মেয়ের প্রতি তাঁহার তদবধি মাতৃভাব জন্মিয়া গেল।

রামকৃষ্ণের মনে বিচার-ভাব সর্ব্বদাই থাকিত। তিনি কখন বিনা বিচারে কোন কার্য্যই করিতেন না। কামিনীকাঞ্চন বিচার দ্বারা যে ভাব লাভ করিয়া-

ছিলেন, তাহা এত প্রবলরূপে কার্য্য করিয়াছিল যে, কখন কোন উত্তম বস্ত্র কিম্বা অন্য কোন পদার্থ তাঁহার ব্যবহারের জন্য প্রদান করা হইলে, তিনি তাহার কারণ বহির্গত করিয়া তদ্দ্বারা সচ্চিদানন্দলাভের সহায়তা জ্ঞান করিলে উহা লইতেন, নতুবা তৎক্ষণাৎ অতি অবজ্ঞাসূচক ভাব দ্বারা পরিত্যাগ করিতেন। তাঁহার বিচারের অতি সুন্দর প্রণালী ছিল। তাঁহার বিচারের মধ্যে বিশ্লেষণ (analysis) এবং সংশ্লেষণ (synthesis) প্রক্রিয়া বিশিষ্টরূপে দেখা যায়। তিনি পদার্থের স্থূলজ্ঞান লাভ করিয়া তাহা হইতে সূক্ষ্মজ্ঞানে গমন করিতেন। সূক্ষ্মভাবে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিয়া, পরে তাহার কারণ অবলম্বন পূর্ব্বক পরিশেষে মহাকারণে মনোনিবেশ করিতেন। এই মহাকারণে তিনি সচ্চিদানন্দকেই অদ্বিতীয় ভাবে দেখিতে পাইতেন। মহাকারণ হইতে সংশ্লেষণ প্রথানুসারে তিনি কারণ, সূক্ষ্ম এবং স্থূলে প্রত্যাগমন করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া পড়িতেন। তিনি তাই বলিতেন, "যেমন খোসা ছাড়াইয়া মাঝ পাওয়া যায়, পরে মাঝ হইতে খোসা পর্য্যন্ত আসিয়া স্পষ্ট দেখা যায় যে, যদিও স্থূলদৃষ্টিতে খোসা এবং মাঝ স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া জ্ঞান হয়, কিন্তু মহাকারণে বিচার করিয়া দেখিলে উহাদের এক সত্বার উৎপত্তি বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে।"

রামকৃষ্ণ এইরূপে মন লইয়া সাধন করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার অভিমান দূরীকৃত হইল। তিনি মনে তাহা বুঝিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রাণ পরীক্ষা দিতে চাহিল। তখন তাঁহার এই ভাবোদয় হইল যে, অভিমান যদ্যপি গিয়া থাকে, তাহা হইলে উহা অবশ্য কার্য্যে প্রকাশ পাওয়া উচিত। তিনি নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া অভিমান দূরীকরণের স্বতন্ত্র ক্রিয়া বাহির করিলেন। তাঁহার জ্ঞান হইল যে, পৃথিবীতে ভাল মন্দ, সৎ অসৎ, ন্যায় অন্যায়, চন্দন বিষ্ঠা, বিষ অমৃত ইত্যাদি নানাপ্রকার অহঙ্কারের কথা আছে। এই সকল অহঙ্কার হইতে মন যদ্যপি বিশ্লিষ্ট হয়, তাহা হইলে সে মন দ্বারা সচ্চিদানন্দ লাভ হইতে পারিবে। রামকৃষ্ণের এমনই একাগ্রতা ছিল যে, যখন যে ভাব আসিত, কাল বিলম্ব না করিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া লইতেন। কিরূপে এই নূতন ভাব হইতে উত্তীর্ণ হইবেন, তিনি এই কথা তাঁহার সচ্চিদানন্দময়ী জননীর নিকট জানাইলেন। তিনি কালীর মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া দুই হস্তে সচন্দন পুষ্প গ্রহণ পূর্ব্বক বলিলেন, "মা! এই নে তোর ভাল, এই নে তোর মন্দ, আমায় শুদ্ধ ভক্তি দে মা," এই কথা বলিয়া দুই হস্তের দুইটী পুষ্প কালীর

চরণে অর্পণ করিলেন; আবার ঐরূপে পুষ্প লইয়া বলিলেন, "মা! এই নে তোর সৎ, এই নে তোর অসৎ, এই নে তোর শুচি, এই নে তোর অশুচি, আমায় ভক্তি দে; এই নে তোর বিষ, এই নে তোর অমৃত, আমায় ভক্তি দে।" রামকৃষ্ণ কালীর পূজা করিয়া মনের বল পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি এক হস্তে বিষ্ঠা ও এক হস্তে চন্দন লইয়া মনকে বলিলেন, "মন! ইহাকে বলে চন্দন, দেবতার ও লোকের অঙ্গের শোভা সম্পাদন করে। ইহার কি সুমধুর সৌরভ! আঘ্রাণ করিলে শরীর স্নিগ্ধ হইয়া যায়। আর ইহাকে বলে বিষ্ঠা, পৃথিবীর সকল পদার্থ হইতে হেয়।" তিনি চন্দন বিষ্ঠা লইয়া সমভাবে বসিয়া রহিলেন, মনের সমতা কোন মতে বিনষ্ট হইল না।

রামকৃষ্ণ যখন এই প্রকার সাধন করিলেন, তখন মন্দিরের লোকেরা তাঁহার উন্মত্ততা সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় করিল। যাহাদের মনে উপদেবতার ভাব ছিল, তাহাদের তাহা এক্ষণে বদ্ধমূল হইয়া গেল। অঘোরী ব্যতীত বিষ্ঠা লইয়া কাহার সাধন নাই, কিন্তু অঘোরীর সম্প্রদায়ভুক্ত তিনি ছিলেন না। সুতরাং কেহই তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারে নাই।

যদিও পুরাকালে জনক প্রভৃতি মহর্ষিগণ সুখ ও দুঃখ সম্বন্ধে সমভাব দেখাইয়া গিয়াছেন, কিন্তু সে কথা রামকৃষ্ণে কেহই প্রয়োগ করে নাই। মন্দিরের অন্যান্য কর্ম্মচারীর কথা কি, তাঁহার আত্মীয় হলধারী বহুশাস্ত্রবিশারদ হইয়াও উপদেবতার কথা বলিতেন। সময়ে সময়ে রামকৃষ্ণকে অন্তরালে লইয়া গিয়া কত উপদেশ দিতেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইত না। মন্দিরের কোন ব্যক্তি বিষ্ঠা চন্দনের কথা শ্রবণ করিয়া রামকৃষ্ণকে বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিল, "ভট্টাচার্য্য মহাশয়! তুমি নাকি বিষ্ঠা চন্দন এক করিয়াছ, ভাল ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াছ! কিন্তু শুনিলাম, তোমার নিজের মল লইয়াছিলে, তা এ প্রকার ব্রহ্মজ্ঞানী ত সকলকেই বলা যায়। আপনার মল কে না স্পর্শ করে? যদ্যপি অন্যের বিষ্ঠা স্পর্শ করিতে পার, তাহা হইলে ও কথা গণ্য হইতে পারে।" রামকৃষ্ণ অতি শান্তভাবে এই সকল কথা শ্রবণ করিলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, এ ব্যক্তি নিতান্ত অন্যায় কথা বলে নাই। বাস্তবিক আপনার বিষ্ঠা স্পর্শ করায় সাধনা কি হইল? বরং অভিমানেরই কার্য্য হইয়াছে; এই কথা তিনি মাতাকে জানাইলেন। মহাশক্তির শক্তি অমনি তরুণ সাধকপ্রবর রামকৃষ্ণের শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। রামকৃষ্ণের মনে এমন প্রচণ্ডভাব আসিল যে, তিনি তৎক্ষণাৎ গঙ্গাতীরে যে স্থানে সকলে মল মূত্রাদি পরিত্যাগ

করিয়া থাকে, সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া তথা হইতে সদ্যত্যক্ত মল মৃত্তিকাবৎ ব্যবহার করিলেন। এমন কি, জিহ্বা দ্বারা উহা স্পর্শ করিতেও তাঁহার ঘৃণার উদ্রেক হয় নাই। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, যখন তিনি বিষ্ঠায় জিহ্বা সংলগ্ন করিয়াছিলেন, তখন কোন প্রকার দুর্গন্ধ অনুভব করেন নাই।

রামকৃষ্ণদেবের এই সাধনের দ্বারা অতি গূঢ় তাৎপর্য্য বহির্গত হইতেছে। বিষ্ঠা চন্দন এক করা কেবল বিচারের কথা নহে। যাঁহারা বিচার করিয়া বস্তুর গুণাগুণ স্থির করিয়া থাকেন, তাঁহাদের অবস্থা এবং যাঁহারা বিচারের পর প্রকৃত কার্য্য করেন, তাঁহাদের স্বতন্ত্র অবস্থা হইয়া থাকে। "এক ব্যক্তি একটী বেল কাঁটা লইয়া চক্ষু মুদ্রিত পূর্ব্বক মনে মনে বিচার করিয়া দেখিল যে, ইহা উদ্ভিদ পদার্থসম্ভূত। ইহাতে অগ্নি সংস্পর্শ করিয়া দিলে এখনি ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। ফলে, সে ব্যক্তি প্রকৃত পক্ষে কাঁটাটী ভস্মীভূত করিল না। সে যেমন কাঁটাটীর উপর হস্তনিক্ষেপ করিল, অমনি উহা বিদ্ধ হইয়া অশেষ প্রকার ক্লেশের কারণ হইয়া উঠিল।" অথবা, "সিদ্ধি সিদ্ধি বলিলে কাহারও নেশা হইতে পারে না। সিদ্ধি আনিয়া বাটিতে হয়, তাহা কেবল স্পর্শ করিলে কিম্বা মুখের ভিতর রাখিয়া দিলেও সিদ্ধির ফল লাভ করা যায় না; তাহা উদর মধ্যে যাওয়া চাই। তথায় কিয়ৎকাল থাকিয়া শরীরে শোষিত হইলে তবে সিদ্ধির আনন্দ উপলব্ধি করা যায়।" অতএব কার্য্য ব্যতীত কোন বিষয়ের ফললাভ হইতে পারে না। রামকৃষ্ণদেব বিষ্ঠার গন্ধ পর্য্যন্ত কি জন্য প্রাপ্ত হন নাই, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, যে ব্যক্তির মন ঈশ্বরে পূর্ণরূপে অর্পিত হয়, বাহ্যিক কার্য্যে কিম্বা পদার্থবিশেষে কখনই সে ব্যক্তির মন সংলগ্ন হইতে পারে না; এই জন্য সে সকল পদার্থের ভাবও উপলব্ধি হইতে পারে না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বকথিত নানাপ্রকার সাধন দ্বারা সংযত-মন হইলে, রামকৃষ্ণদেবের কর্ম্মের ভাব আসিল। তিনি গোকল ব্রত হইতে বেদ, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি পূর্ব্বপ্রচলিত কর্ম্মকাণ্ডের প্রক্রিয়া একে একে সাধন করিয়াছিলেন। এই সকল সাধনের ভাব আপনি তাঁহার মনে উদয় হইত, কাহাকে জিজ্ঞাসা কিম্বা কোন শাস্ত্র পাঠ করিয়া তিনি অবগত হইতেন না। তাঁহার সাধনের ধারাবাহিক ইতিহাস কোনমতে প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। কারণ তিনি কখন

কি করিতেন, তাহা তিনিই বিস্মৃত হইয়া যাইতেন। উপদেশ কালে যাহা তাঁহার মনে আসিত এবং প্রকাশ করা প্রয়োজন বোধ করিতেন, তাহাই তিনি বলিতেন। তাঁহার কথার ভাবে আমরা যাহা বুঝিয়াছি, সেইরূপে লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি।

সাধারণ ব্রত নিয়মাদি সমাধা করিয়া তিনি যোগের উচ্চতম সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে যে বটবৃক্ষের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার নিম্নদেশে পঞ্চবটী নামক যোগের স্থান প্রস্তুত করিয়াছিলেন। পঞ্চবটী বর্গ-পরিমিত চারি হাত স্থান হইয়া থাকে। ইহার এক কোণে নিম্ব, দ্বিতীয় কোণে বিল্ব, তৃতীয় কোণে অশ্বত্থ বা বট, চতুর্থ কোণে শেফালিকা এবং মধ্য-স্থলে আম্লকী বৃক্ষ আরোপণ করিতে হয়। এই স্থানটীর চতুর্দ্দিকে জবা-ফুলের বেড়া এবং তাহাতে অপরাজিতা কিম্বা মাধবীলতা বেষ্টিত থাকে। পরমহংস-দেব এইরূপে পঞ্চবটী প্রস্তুত করিয়া, বৃন্দাবনের ধুলা আনাইয়া তন্মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। রজনীযোগে যখন চারিদিকে মনুষ্য কোলাহল নিস্তব্ধ হইত, যখন নিশাচরগণ স্ব স্ব বিবর ও বাসস্থান হইতে বহির্গত হইয়া আহারের অন্বে-ষণে ভ্রমণ করিত, যখন যামিনী ঝিল্লিরবে মনের সাধে পরমপুরুষের গুণানু-কীর্ত্তন করিত, সেই সময়ে পরমহংসদেব নিঃশব্দে ঐ পঞ্চবটী মধ্যে প্রবেশ করিতেন এবং তথায় উপবেশন করিয়া ধ্যানে নিমগ্ন হইতেন। কতক্ষণ সেই অবস্থায় থাকিতেন এবং কি করিতেন, তাহা কেহ অদ্যাপিও জানিতে পারেন নাই। পঞ্চবটীতে সাধনকালে তিনি তোতাপুরীর নিকটে সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করেন। তিনি সন্ন্যাসী হইয়া কুম্ভকাদি যোগ দ্বারা নির্ব্বিকল্প-সমাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কথিত আছে যে, এই নির্ব্বিকল্প সমাধি যোগের চরমাবস্থার কথা। কতকাল হটযোগ করিয়া আসনাদি আয়ত্ত হইলে তাহার পর প্রাণা-য়াম, ধ্যান, ধারণাদি করিতে পারিলে, তবে সমাধি হইয়া থাকে; কিন্তু পরম-হংসদেব তিন দিনে তদবস্থা লাভ করিয়াছিলেন। তোতাপুরী এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া পরমহংসদেবের নিকটে একাদশ মাস অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তোতাপুরীর এই সাধন করিতে বিয়াল্লিশ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল।

কুম্ভকযোগের সময় তাঁহার মুখগহ্বরস্থ ঊর্দ্ধ-মাঢ়ীর সম্মুখ দিকের মধ্যস্থান হইতে ক্রমাগত শোণিত নির্গত হইত। সেই শোণিতের বর্ণ সিম পাতার বর্ণের ন্যায় দেখাইত। ঔষধাদি দ্বারা ঐ শোণিত রুদ্ধ করা যাইতে পারিত না। কিয়ৎকাল শোণিত স্রাবের পর আপনি স্থগিত হইয়া যাইত। এই

শোণিত-নির্গমনে পরমহংসদেব এক এক দিন অতিশয় কাতর হইতেন এবং মুখ-গহ্বরে বস্ত্র প্রবিষ্ট করিয়া সঞ্চাপন ক্রিয়া দ্বারা শোণিতধারা রুদ্ধ করিবার বিফল প্রয়াস পাইতেন। কিছুক্ষণ শোণিত স্রাবের পর উহা আপনি স্থগিত হইয়া যাইত। এই সময়ে তাঁহার শরীর অতিশয় স্থূল হইয়াছিল এবং রূপ-লাবণ্যে দিক্ আলোকিত করিত। তিনি বস্ত্র পরিধান করিতে পারিতেন না, তজ্জন্য একখানি মোটা উত্তরীয় বসন দ্বারা সমস্ত শরীর আবৃত করিতেন। এই সময়ে সাধুরা তাঁহাকে পরমহংস বলিয়া সম্বোধন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। পরমহংসদেব যদিও কুম্ভকাদি যোগ করিতেছিলেন, তথাপি তাঁহার কালীমন্দিরে প্রবেশ করা বন্ধ হয় নাই। তাঁহার ভাবান্তর কাল হইতে হৃদয়ানন্দ মুখোপাধ্যায় নামক পরমহংসদেবের জনৈক আত্মীয় কালীর পূজা করিতেছিলেন। তিনি পরমহংসদেবের সেবাশুশ্রূষাদিও করিতেন। যখন তিনি অজ্ঞানাবস্থায় থাকিতেন, তখন হৃদয় আসিয়া তাঁহাকে আহার করাইতেন এবং গাত্রের কর্দ্দমাদি পরিষ্কার করিয়া দিতেন। পরমহংসদেবের পূজা করা সেই জন্য নিয়মের অন্তর্গত ছিল না। যখনই ইচ্ছা হইত, কালাকাল, শুচি অশুচি কিম্বা অন্য কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া পূজা করিতে যাইতেন। কোন দিন হয় ত কালীকে কেবল চামর ব্যজন করিতে করিতে সমাধিস্থ হইতেন। তখন হাতের চামর হাতেই থাকিত। কখন বা দেবীর চরণ ধরিয়া মনে মনে কত কি কথা বলিতেন এবং কখন বা শিবের সহিত কত কি রহস্য করিতেন। কোন কোন দিন প্রাতঃকাল হইতে নানাবিধ পুষ্প চয়ন করিয়া দেবীকে পূজা করিতেন এবং কখন বা সুললিত গীত ও অদ্ভুত নৃত্য করিয়া আপনভাবে আপনি মাতিয়া উঠিতেন। পরমহংসদেব যে গোপনে গোপনে সাধন ভজন করিতেছিলেন, তাহা মন্দিরের কেহই জানিত না। সন্ন্যাসী সাধুরা সর্ব্বদাই তথায় আসিতেন এবং তাঁহাদের আবশ্যকীয় ভোজ্য-সামগ্রী দিবার জন্য রাসমণির ব্যবস্থাও ছিল, সুতরাং নূতন নূতন সাধু ফকির আসাতে কেহ কিছুই বুঝিতে পারিতেন না। পূর্ব্বকথিত হলধারী পরমহংসদেবের এক আত্মীয় ঐ মন্দিরে বাস করিতেন। বেদান্তশাস্ত্রে তিনি বিশেষ অধিকারী ছিলেন। হলধারী সাকার পূজাদি নিতান্ত ঘৃণা করিতেন। নৃত্য গীত বা সঙ্কীর্ত্তনাদি মস্তকের বিকার এবং মায়ার কার্য্য বলিয়া উপহাস করিতেন। তিনি পরমহংসদেবকে মধ্যে মধ্যে উপদেশ দিতেন এবং বেদান্ত শাস্ত্র শ্রবণ করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতেন। পরমহংসদেব এইরূপ বার

বার হলধারীর নিকট আপন দুরবস্থা শ্রবণ করিয়া এক দিন গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং মা মা বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণদেব যেমন মা মা করিয়া ডাকিয়াছেন, অমনি আদ্যাশক্তি কালীরূপে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি মাতাকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, "মা! হলধারী বলে যে, আমার মাথা খারাপ হইয়াছে, যাহা কিছু দর্শন করি, তাহা আমার চক্ষের দোষ, মায়া মাত্র। মা! সত্যি করে আমায় বলে দে, আমার কি হলো।" অভয়া অমনি অভয় দিয়া বলিলেন, "তুমি যেমন আছ, অমনি থাক।" এই বলিয়া মাতা অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। রামকৃষ্ণ তদবধি আর কাহারও কথায় কর্ণপাত করিতেন না, কাহারও প্রতি দৃক্‌পাতও করিতেন না।

কালীর প্রতি পরমহংসদেবের এ প্রকার আত্ম-নিবেদনের ভাব ছিল যে, যখন যে কোন কার্য্য করিতেন, মাতাকে না জানাইয়া কখনই তাহাতে নিযুক্ত হইতেন না। তিনি কিন্তু কখন কোন দ্রব্য প্রার্থনা করেন নাই, তাহার প্রয়োজনও বুঝিতেন না এবং অপ্রয়োজনও অনুমান করিতে পারিতেন না।

একদিন তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার পঞ্চবটীর বেড়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, এ কথা কাহাকে বলি এবং কে বা আমার কথা রক্ষা করিবে। ভর্ত্তাভারি বলিয়া এক জন ঐ উদ্যানের মালি ছিল, এই ব্যক্তি পরমহংসদেবকে চিনিয়াছিল। সে একদিন পরমহংসদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, "পৃথিবীতে উচ্ছিষ্ট হয় নাই কি?" পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন যে, "ব্রহ্ম-বিজ্ঞান এ পর্য্যন্ত উচ্ছিষ্ট হয় নাই এবং কখন হইবারও নহে।" ভর্ত্তাভারি তদবধি তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিল। এই উচ্ছিষ্টের কথা আমরা পরেও তাঁহার নিকট শুনিয়াছি। তিনি বলিতেন যে, বেদ, পুরাণ, শাস্ত্রাদি ঋষি মুনির মুখবিগলিত হইয়াছে, সুতরাং উচ্ছিষ্ট; কিন্তু ব্রহ্ম-বিজ্ঞান বাক্যাতীত অবস্থার কথা। তাহা হাবার স্বপ্নবৎ বোধ হয়; লোককে কোনমতে প্রকাশ করিয়া বলা যায় না। যাহার হয়, সেই বুঝিতে পারে।

পরমহংসদেব ভর্ত্তাভারিকে আপন মনের কথা দুই একটা বলিতেন। পঞ্চবটীর বেড়ার কথা তাহাকেই বলিয়াছিলেন, কিন্তু সে সামান্য ভৃত্য, কোথায় কি পাইবে, তজ্জন্য কিছুই করিতে পারে নাই। পঞ্চবটীর বট-বৃক্ষমূলে রামকৃষ্ণদেব কি হইবে বলিয়া চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে গঙ্গাতে

বান আসিল। বানের সঙ্গে এক বোঝা বাঁকারি এবং আর এক বোঝা এক মাপের কতকগুলি বাঁশের খুঁটী ভাসিয়া পরমহংসদেবের সম্মুখে ডুবিয়া গেল। রামকৃষ্ণদেব তাহা দেখিতে পাইয়া ভর্ত্তাভারিকে তৎক্ষণাৎ বলিলেন। ভর্ত্তাভারি আনন্দে বিহ্বল হইয়া একেবারে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক জলে পড়িল এবং ডুব দিয়া বাঁকারি এবং খুঁটীগুলিকে উপরে উত্তোলন করিল। ভর্ত্তাভারি আপনি উহা দ্বারা পঞ্চবটীর বেড়া বন্ধন করিয়া দিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বেড়া সংস্কারের জন্য যে যে দ্রব্যগুলির প্রয়োজন ছিল, তৎসমুদয় তন্মধ্যে পাওয়া গিয়াছিল।

পরমহংসদেব এই ঘটনাতে বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, "লোকে আমায় পাগল বলে। কিন্তু আমি মাকে দেখিতে পাই, কথা বলি, তিনিও কত কি বলেন। এ সকল কি মিথ্যা, ভ্রম দর্শন করি? ভাল, অদ্য পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক্।" এই প্রকার স্থির করিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, কিরূপ পরীক্ষা করা যাইবে। কিন্তু তখন কিছুই মনে আসিল না।

একদিন তিনি গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছেন, এমন সময়ে রামধন বলিয়া রাসমণির একজন অতি প্রিয় কর্ম্মচারী সেই স্থান দিয়া গমন করিতেছিল। রামধন পরমহংসদেবের প্রতি নিতান্ত বিরূপ ছিল, এমন কি, কখন কথা কহিত না। পরমহংসদেব রামধনকে দেখিয়া মনে মনে মাকে বলিলেন, "মা! তুমি যদি সত্য হও, তা হ'লে রামধনকে আমার নিকটে বন্ধুর ন্যায় এখন এনে দাও। তবে জানবো যে, তুমি আমার কথা শুন, আর সকলই সত্য বলে ধারণা হবে।" এই কথা মনে হইবামাত্র রামধন সহসা রামকৃষ্ণের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার নিকটে নাবিয়া আসিল এবং মৃদুস্বরে বলিল, "ভট্টাচার্য্য মহাশয়! কালীর সাক্ষাৎ পাইয়া থাক ভাল, তা অত বাড়াবাড়ি করবার আবশ্যক কি?" এই কথা বলিয়া রামধন চলিয়া গেল।

রামকৃষ্ণদেবের যদিও এক্ষণে উন্মত্ততার অনেক সাম্য হইয়াছিল, কিন্তু তিনি সময়ে সময়ে অধীর হইয়া পড়িতেন। যখন কম্প হইত, তখন পাঁচজনে ধরিয়া রাখিতে পারিত না। এই নিমিত্ত চিকিৎসাদি বন্ধ করা হয় নাই। বৈদ্যেরা বায়ুরোগ সাব্যস্থ করিয়া নানাবিধ তৈল মর্দ্দন করাইতেন। স্নিগ্ধকারক ও বায়ুনাশক ঔষধি সেবন করান হইত এবং কেহ কেহ স্ত্রী সহবাস করিতে পরামর্শ দিত।

স্ত্রী-সহবাস সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ আপত্তি ছিল। বিবাহের পর কার্য্যানুরোধে তিনি স্ত্রীর মুখাবলোকন করিতে পান নাই। তদনন্তর তাঁহার অবস্থা পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। সেই সময়ে তিনি প্রকৃতিকে সকলের উৎপত্তির কারণ জ্ঞানে মাতৃ সম্বোধন করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহার তদবধি ধ্রুবজ্ঞান হইয়াছিল যে, স্ত্রীমাত্রেই শক্তির অংশ, অতএব শক্তিতে গমন করিলে মাতৃহরণ অপরাধ সংঘটিত হইয়া যাইবে। মন্দিরের লোকেরা এ কথা জানিত এবং তাহারা সেইজন্য তাঁহাকে পূর্ণ পাগল বলিয়া গণনা করিত।

স্ত্রী-সহবাস না করাই যখন তাঁহার উন্মত্ততার কারণ বলিয়া স্থির হইল, তখন হৃদয় মুখোপাধ্যায় গোপনে এ সম্বন্ধে অনেক উপদেশ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু সে কথায় তাঁহার মন চঞ্চল করিতে পারেন নাই। কথায় যখন কোন কার্য্য হইল না, তখন হৃদয় মুখোপাধ্যায় ঠাকুরবাটীর এক প্রৌঢ়া পরিচারিকাকে দশ টাকা পুরস্কার স্বীকার করিয়া পরমহংসদেবের পশ্চাৎ নিযুক্ত করিয়া দিল। এই পরিচারিকা কোথা হইতে একটী যুবতী কামিনী সকলের অজ্ঞাতসারে পরমহংসদেবের শয়ন-গৃহে আনিয়া উপস্থিত করিয়া দিল। পরমহংসদেব সেই স্ত্রীলোককে দেখিয়া অমনি তথা হইতে স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন এবং হৃদয়কে যথোচিত তিরস্কার করিলেন।

এইরূপে কিয়দ্দিবস অতীত হইয়া গেল। একদা কলিকাতার প্রসিদ্ধ কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের নিকট পরমহংসদেব হৃদয়ের সমভিব্যাহারে আগমন করেন। তথায় জনৈক পূর্ব্বাঞ্চলের পণ্ডিত কবিরাজ উপস্থিত ছিলেন। গঙ্গাপ্রসাদ বায়ুরোগ নির্ণয় করিয়া পূর্ব্ব হইতেই তৈলাদি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেই পণ্ডিত পরমহংসদেবকে দেখিয়াই হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "এই ব্যক্তির কি কোন প্রকার যোগ করা অভ্যাস আছে? লক্ষণে যেন যোগীর ন্যায় বোধ হইতেছে।" হৃদয় তাহা স্বীকার করিল। পরমহংসদেবের অবস্থা সম্বন্ধে এই পণ্ডিত সর্ব্ব প্রথমে উল্লেখ করেন। কিন্তু তাঁহার কথায় কোন ফল হইল না। হৃদয়ও সে কথা বুঝিল না এবং কবিরাজ মহাশয়ের তাহা ধারণা হইল না। তিনি তৈল ব্যবহার করাইতে লাগিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মন্দিরের লোকেরা যখন রামকৃষ্ণদেবকে উন্মত্ত বলিয়া স্থির করিল, যখন নিকটস্থ গ্রামের পণ্ডিতপ্রবরেরা তাহাই অনুমোদন করিয়া দিলেন, তখন রাসমণি কর্ত্তব্যজ্ঞানে নানাপ্রকার চিকিৎসাদি করাইতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণদেব তখনও আপন ভাব পরিবর্ত্তন করেন নাই। তাঁহার কার্য্যকলাপ দেখিলে মনে হইত যে, তিনি কাহাকেও গ্রাহ্য করিতেন না, কাহারও কথার এক পরমাণু মূল্য জ্ঞান করিতেন না এবং মনুষ্যকে মনুষ্য বলিয়া বিচার করিতেন না। তাঁহার যখনই যে ভাব মনে আসিত, তিনি তাহা তৎক্ষণাৎ সম্পন্ন না করিয়া কোনমতে স্থির হইতে পারিতেন না। বাস্তবিক যে তিনি সকলকে ঘৃণা করিতেন, তাহা নহে। তিনি দাম্ভিকতা সহকারে দেবোদ্দেশে যে সকল কার্য্য করিতেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে অহংভাব হইতে হইত না। তাহা অনুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া করিতেন। তাঁহার উপদেশে শুনিয়াছি যে, জীবনের নিশ্চয়তা অতি সন্দেহজনক, যে কোন উপায়ে হউক, যাহাতে ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়, তাহাই সকলের করা কর্ত্তব্য। কারণ, সময় থাকিতে তাহার উপায় না করিয়া লইলে পরিণামে অনুশোচনা করিতে হয়।

পরমহংসদেব মনে মনে কোন সঙ্কল্প করিতেন না। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, তিনি সচ্চিদানন্দময়ী মাতার শ্রীচরণে তাঁহার আত্মসমর্পণ করিয়া মাতৃ-স্তনপায়ী শিশুর ন্যায় স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার মনে যখন যে ভাব উদ্দীপিত হইত, সেই ভাবেই তাঁহাকে যন্ত্রবৎ কার্য্য করাইয়া লইত। এই নিমিত্ত তাঁহার ভাবোন্মত্ততাবস্থায় তাঁহাকে আর এক প্রকার দেখাইত।

একদিন প্রাতঃকালে একটী যুবতী আলুলায়িতকেশা গৈরিকবস্ত্রপরিধানা সন্ন্যাসিনীকে জাহ্নবীর তীরে উপবিষ্ট দেখিয়া পরমহংসদেব তাঁহাকে ডাকিয়া আনিবার জন্য হৃদয়কে আদেশ করেন। হৃদয় এই কথা শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইল। কারণ ইতিপূর্ব্বে যাঁহার স্ত্রীজাতির সহিত কোন সংস্রব ছিল না, যাঁহার নিকট স্ত্রীলোকের নাম করিলে মহা বিভ্রাট হইয়া উঠিত, তাঁহার এ প্রকার ভাবান্তর দেখিলে সহজেই দুর্ব্বল চিত্তে সন্দেহ উপস্থিত হইয়া থাকে।

হৃদয়ের মনে যাহাই হউক, সে তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণীকে পরমহংসদেবের সমীপে আনিয়া উপস্থিত করিল। ব্রাহ্মণীকে দেখিয়া পরমহংসদেব মা বলিয়া ভাবে নিমগ্ন হইয়া যাইলেন। পরে নানাপ্রকার তত্ত্ব-কথা আলাপন দ্বারা উভয়েই আনন্দিত হইয়াছিলেন। এই সন্ন্যাসিনী "ব্রাহ্মণী" বলিয়া উল্লিখিত আছেন। তিনি অসাধারণ গুণসম্পন্না ছিলেন। হিন্দু, বিশেষতঃ বঙ্গমহিলার মধ্যে এ প্রকার দ্বিতীয় স্ত্রীলোক অদ্যাপি কেহ দেখিয়াছেন কি না, বলিতে পারি না। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার এমন ব্যুৎপত্তি ছিল যে, তৎকালীন পণ্ডিতাগ্রগণ্য বৈষ্ণবচরণ ও পূর্ণানন্দ প্রভৃতি মহাশয়েরা নির্ব্বাক্ হইয়াছিলেন। হিন্দুদিগের যে সকল সাম্প্রদায়িক শাস্ত্র আছে, তৎসমুদায় তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল এবং যেন সাধন দ্বারা সকলই আয়ত্তাধীনে রাখিয়াছিলেন। সুতরাং বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, গীতা, তন্ত্র এবং বৈষ্ণবগ্রন্থাদিতে তাঁহার সম্যক্‌রূপে অধিকার ছিল। কেবল তাহা নহে, আধুনিক ঘোষপাড়া, নবরসিক, পঞ্চনামী, বাউল প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রণালীও তিনি জানিতেন।

এই ব্রাহ্মণী পরমহংসদেবের অবস্থা ও ভাব শাস্ত্রসঙ্গত বলিয়া উল্লেখ করেন এবং ঈশ্বরের নামে যে জড়বৎ ভাবপ্রাপ্ত হইতেন, তাহা মৃগী বা হিষ্টিরিয়া জনিত নহে, উহাকে তিনি মহাভাব বলিয়া ব্যক্ত করিলেন।

ব্রাহ্মণীপ্রমুখাৎ মহাভাবের কথা শ্রবণ করিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া রহিল। ভাব কাহাকে বলে, তাহাই বৈষ্ণব ব্যতীত কেহ জানে না, সে স্থলে মহাভাবের অর্থ কে বুঝিবে? মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের এই মহাভাব হইত, তাহা বৈষ্ণবগ্রন্থে উল্লিখিত আছে, কিন্তু এক্ষণে বৈষ্ণবদিগের দুরবস্থা সংঘটিত হওয়ায় সে ভাবের ভাব বোধ হওয়া দূরে থাকুক, অতি অল্প ব্যক্তিরই অর্থ-বোধ হইবার সম্ভাবনা। ব্রাহ্মণীর প্রমুখাৎ মহাভাবের কথা প্রকাশ পাইলে সকলে ভাব বলিয়া একটা কথা শিক্ষা করিল, কিন্তু ইহা দ্বারা পরমহংসদেবের প্রতি কাহার শ্রদ্ধাভক্তি হইল না। কিছুদিন পরে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে কোন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত দেবালয়ে উপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় আসিয়া কলিকাতার পণ্ডিতদিগের সহিত বিচার করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করায়, রাসমণির জামাতা মথুরানাথ বিশ্বাস তৎকালীক মহাপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতবর বৈষ্ণব-চরণকে লইয়া যান। যে সময়ে তাঁহারা উপস্থিত হন, পরমহংসদেব এবং পণ্ডিতমহাশয় তখন দেবী-মন্দিরের সম্মুখভাগে উপবিষ্ট ছিলেন। পরম-হংসদেব বৈষ্ণবচরণকে দেখিবামাত্র অমনি ভাবে বিহ্বল হইয়া দ্রুতপদে

গমন পূর্ব্বক তাঁহার স্কন্ধোপরি আরোহণ করিলেন। বৈষ্ণবচরণ পরমহংস-দেবের অপূর্ব্ব ভাবাবেশ দেখিয়া তাহা বুঝিতে পারিলেন এবং “চৈতন্য” জ্ঞান করিয়া নিজ রচিত শ্লোকাদি দ্বারা বন্দনাদি করিতে লাগিলেন। এই শ্লোক সকল তাঁহার পূর্ব্বের রচনা নহে, তাহা সেই সময়ের মনের উচ্ছ্বাসে নির্গত হইয়াছিল। বৈষ্ণবচরণের এই অসাধারণ শক্তি দেখিয়া দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত-মহাশয় আপনি পরাজয় স্বীকার করিলেন এবং পরমহংসদেবের সন্নিধানে কিছুদিন বাস করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

বৈষ্ণবচরণ পরমহংসদেবকে পাইয়া আনন্দে উৎসাহিত হইয়া পড়িলেন। ব্রাহ্মণীও বৈষ্ণবচরণকে অতিশয় প্রীতি করিতে লাগিলেন।

পরমহংসদেব সম্বন্ধে ব্রাহ্মণী যে মহাভাবের কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন, বৈষ্ণবচরণও তাহা সমর্থন করিতে লাগিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে শাস্ত্রাদি আনিয়া পরমহংসদেবের পূর্ব্ব সাধনের অবস্থাগুলি মিলাইয়া লইয়া দেখিলেন যে, কিছুই অশাস্ত্রীয় হয় নাই। পরমহংসদেব লৌকিক শাস্ত্রানভিজ্ঞ হইয়া কিরূপে এই দুরূহ সাধনের প্রক্রিয়ায় আপনার নিজ যত্নে সিদ্ধ হইয়াছিলেন, ইহা ভাবিয়া বৈষ্ণবচরণ আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। যদিও তিনি গুরু পাইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের দ্বারা বিশেষ কোন কার্য্যের সহায়তা প্রাপ্ত হন নাই।

যখন বৈষ্ণবচরণ ব্রাহ্মণীর কথা প্রমাণ করিয়া দিলেন, তখন পরমহংসদেব সম্বন্ধে মথুর বাবু ও অন্যান্য ব্যক্তির কিঞ্চিৎ বিশ্বাস জন্মিল। ব্রাহ্মণী পরমহংস-দেবের নিকট ক্রমান্বয়ে দ্বাদশ বৎসর অবস্থিতি করিয়াছিলেন। পরমহংসদেব সেই সময়ে তন্ত্রোক্ত সাধনে নিযুক্ত হন এবং ব্রাহ্মণীর নিকট বিশেষ সহায়তা লাভ করেন। ইতিপূর্ব্বে যে বিল্ববৃক্ষের কথা কথিত হইয়াছে, তাহার নিম্নদেশে তিনি পঞ্চমুণ্ডী প্রভৃতি লইয়া তন্ত্রোক্ত যাবতীয় প্রক্রিয়া সমাধা করেন। * কথিত

* তন্ত্রসাধকদিগের মধ্যে দুইটী প্রধান শ্রেণী সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, দক্ষিণাচারী ও বামাচারী। দক্ষিণাচারীরা সাত্ত্বিকভাবে ভগবতীর পূজাদি সমাপন করিয়া একান্ত মনে মন্ত্র জপ করিয়া সিদ্ধাবস্থা লাভ করিয়া থাকেন।

বামাচারীদিগের কার্য্যকলাপ সম্পূর্ণ তামসভাবে পরিপূর্ণ। ইহাতে কুলস্ত্রীর পূজা করিতে হয়। কুলস্ত্রী অর্থে যে স্ত্রী কুলভ্রষ্টা বা পরপুরুষগামিনী, তাহাকেই বুঝাইয়া থাকে। নটস্ত্রী, কাপালী, বেশ্যা, রজকী, নাপিতের ভার্য্যা, ব্রাহ্মণী, শূদ্রানী, গোপকন্যা, মালাকারকন্যা প্রভৃতি-নয় প্রকার স্ত্রীকে কুলকামিনী কহে। পঞ্চতত্ত্ব বা পঞ্চমকার, যথা মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা,

আছে যে,একদা নরশির লইয়া সাধন করিতে পরমহংসদেবের মনে কিঞ্চিৎ বিকৃতভাব উপস্থিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণী তাহা অবলোকন করিয়া বলিয়াছিলেন,"ওকি বাবা! এই দেখ না আমি উহা কামড়াইতেছি,"এই বলিয়া তিনি আপনি দেখাইয়া দিয়াছিলেন। তন্ত্রের সাধন স্বভাবতঃ অতি ভয়ানক। পঞ্চ মকার ব্যতীত সাধনের কার্য্য হইতে পারে না। যদিও অনেকে তাহার ভাবার্থ প্রকাশ করিয়া শব্দার্থ বিপর্য্যয় করেন, কিন্তু তাহা গ্রন্থের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে।

তন্ত্র সাধনের সময় বহুল তান্ত্রিকের সমাগম হইত। পরমহংসদেব তাঁহাদের জন্য কারণ অর্থাৎ মদ্য, চাউল এবং ছোলাভাজা সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। কালীঘাটের অচলানন্দ স্বামীও সর্ব্বদা গমনাগমন করিতেন। পরমহংসদেব নিজে কখন কারণ জিহ্বায় স্পর্শ করেন নাই। তিনি অঙ্গুলির অগ্রভাগে লইয়া কালী কালী বলিয়া কপালে ফোঁটা পরিতেন। তন্ত্রমধ্যে ঊর্দ্ধমুখতন্ত্র নামক যে গ্রন্থ আছে, তাহার সাধন অতীব ভয়ঙ্কর এবং সাধারণের নিকট তাহা পরিচয় দেওয়া যায় না। তাহার প্রক্রিয়াগুলি অশ্লীলতায় পরিপূর্ণ, কিন্তু সাধকের তাহাতে কোন সংস্রব নাই। এই সাধন দ্বারা মনের শক্তি বিলক্ষণরূপে পরীক্ষিত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণীর দ্বারা পরমহংসদেব এই সাধন সম্পন্ন করিতেও বিশেষ সুবিধা পাইয়াছিলেন।

তন্ত্রোক্ত সাধনের পর তিনি কর্ত্তাভজা, নবরসিক ও বাউল প্রভৃতি নানা প্রকার সাধন করেন। ব্রাহ্মণী এই সকল ধর্ম্মপ্রণালী অতি সুন্দররূপে জানিতেন। কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের চন্দ্রনাথ নামক পূর্ব্বদেশীয় এক ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণী আনাইয়াছিলেন। আমরা শুনিয়াছি, পরমহংসদেবের যখন মহাভাব হইত, তখন তিনি বাহ্যজ্ঞান পরিশূন্যাবস্থা প্রাপ্ত হইতেন। চন্দ্র অমনি তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া বলিতেন, "ও রামকৃষ্ণ! ওকি!" কিন্তু সে কথায় পরমহংসদেবের অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে পারিতেন না। কর্ত্তাভজাদিগের মতে সহজ-

মৈথুন এবং খ-পুষ্প অর্থাৎ রজঃস্বলা স্ত্রীলোকের রজঃও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বামাচারীদিগের লতাসাধন প্রভৃতি যে সকল কার্য্য নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা অশ্লীলতায় পরিপূর্ণ। এই কার্য্য দ্বারা ধর্ম্মভাবের যে কি উত্তেজনা হয়, তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন। এই মতের শব-সাধনাটী অতি গুরুতর কার্য্য, তাহার সন্দেহ নাই। কৃষ্ণপক্ষের মঙ্গলবারে অথবা অষ্টমী কিম্বা চতুর্দ্দশী তিথিতে, শ্মশানে, নদীতীরে, বিল্বমূলে, কিম্বা অরণ্যে, অস্বাভাবিকরূপে মৃত ব্যক্তির দেহ আনিয়া তাহার পূজা করিতে হইবে। পূজান্তে মৎস্যাদি উপচার লইয়া উহার বক্ষোপরে উপবেশন পূর্ব্বক মন্ত্রজপ করিতে হয়।

জ্ঞানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া ধারণা আছে। তাঁহারা বলেন যে, বহির্জ্ঞানের সহিত অন্তর্জ্ঞান থাকিবে। ইহা অতি নিম্ন শ্রেণীর কথা। বৈদান্তিক নির্ব্বিকল্প-সমাধির ভাব তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই। যে ভাব যোগীরা যোগ সাধন করিয়া লাভ করেন, যাহা মহাপ্রভুর প্রতি মুহূর্ত্তেই হইত, সেই নির্ব্বিকল্প-সমাধি পরমহংস-দেব কুম্ভকযোগ করিয়া প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যোগের দ্বারা যে সমাধির অবস্থা উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা অতিরিক্ত কষ্টসাধ্য; কিন্তু পরমহংসদেব সেইভাব লাভ করিবার অতি সহজ প্রণালী দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি মহাপ্রভুর ন্যায় কথায় কথায় বহির্চৈতন্য হারাইয়া ফেলিতেন। এমন কি, একদা এই অবস্থায় তাঁহার গাত্রের উপরে গুলের অগ্নি পতিত হইয়া তথাকার মাংসপেশী ভেদ করিয়া গিয়াছিল,তথাপি তাঁহার সংজ্ঞা হয় নাই। পরমহংসদেবের উদরের বাম-ভাগে যে একটী ক্ষত চিহ্ন ছিল, তাহা এইরূপে উৎপন্ন হয়। চন্দ্র অনেক চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই কিছু করিতে না পারিয়া পরিশেষে স্বস্থানে প্রস্থান করেন।

কর্ত্তাভজার সাধনের সময়ে তিনি বালীনিবাসী তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্যের নিকট মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করিতেন। এই নিমিত্ত অনেকে অদ্যাপি তাঁহাকে কর্ত্তাভজা বলিয়া জানেন।

পরমহংসদেবের ভাবের ন্যায় ব্রাহ্মণীরও ভাব হইত। ব্রাহ্মণী পরমহংস-দেবের সহিত বাৎসল্য-ভাবের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি সময়ে সময়ে নানাবিধ বেশভূষায় ভূষিত হইয়া, তন্নিকটস্থ পল্লীর মহিলাদের সমভিব্যাহারে বাম হস্তে রৌপ্যপাত্রে ক্ষীর নবনী প্রভৃতি ভোজ্য সামগ্রী লইয়া, যেরূপে যশোদা গোপালের অদর্শনে দগ্ধহৃদয়ে কাতরপ্রাণে বৎসহারা গাভীর ন্যায় দ্বারকায় গমন করিয়াছিলেন, সেইরূপে পরমহংসদেবের আবাস-গৃহাভিমুখে ধাবিত হইতেন এবং তাঁহার বিরচিত গোপাল-বিষয়ক গীত গান করিতে করিতে যেমন গৃহদ্বারে উপস্থিত হইতেন, অমনি মূর্চ্ছিতা হইয়া যাইতেন। পরে অনবরত গোপাল নাম তাঁহার কর্ণ-বিবরে শ্রবণ করাইলে চৈতন্য সম্পাদন হইত। এই ব্রাহ্মণী সম্বন্ধে নানাপ্রকার ঘটনা শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু সাধারণের নিকট তৎসমুদয় প্রকাশ করিতে এ ক্ষেত্রে কুণ্ঠিত হইলাম।

পরমহংসদেব অন্যান্য প্রকার সাধন করিতেন বটে, কিন্তু কালীর মন্দিরে গমন করিতে কখন বিস্মৃত হইতেন না। ব্রাহ্মণীও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতেন। একদা কোন বিশেষ কারণে কালীর পূজায় ছাগ বলিদান হইয়াছিল। তাহার রুধিরের সরা যখনই দেবীর সম্মুখে প্রদত্ত হইল, ব্রাহ্মণী

তাহা ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই সন্ততক্ত শোণিতাক্ত রম্ভা ও সন্দেশ এবং তৎসহ শোণিতও অম্লানবদনে ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন। পরমহংসদেব তাহা দর্শন করিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়াছিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

কথিত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণী এবং বৈষ্ণবচরণের কথায় মথুর বাবু পরমহংস-দেবকে সিদ্ধপুরুষ বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন। বোধ হয়, তিনি তন্নিমিত্ত তাঁহার স্বচ্ছন্দতার জন্য নানাপ্রকার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে পরমহংসদেবের সহিত অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন। রাসমণি দাসীও বুঝিতে পারিলেন যে, পরমহংসদেব প্রকৃত সিদ্ধপুরুষ হইয়াছেন। যাহা হউক, মথুর বাবু এবং রাসমণি প্রভৃতি মন্দিরের কর্তৃপক্ষীয়েরা পরমহংসদেব সম্বন্ধে অতি উচ্চভাব গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা ক্রমে বুঝিলেন যে, পরমহংসদেবের সাধন ভজন অতি আশ্চর্য্য এবং অস্বাভাবিক প্রকারে সাধিত হইয়াছে। তাঁহারা জানিলেন যে, পরমহংসদেব সাধারণ পরমহংসদিগের ন্যায় স্বভাববিশিষ্ট নহেন, তাঁহার সাধারণ জৈবভাব বিলুপ্ত হইয়া শিবত্ব সঞ্চারিত হইয়াছে এবং তিনি যে কালীদেবীর বরপুত্রবিশেষ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এমনও কখন কখন কেহ বলিতেন যে, হয়ত সেই রামপ্রসাদই পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই সময়ে পরমহংসদেবের বয়ঃক্রম অনুমান চব্বিশ পঁচিশ বৎসর হইবে। তাঁহার শরীর অতিশয় বলিষ্ঠ ছিল এবং রূপলাবণ্যে চিত্ত চমকিত হইয়া যাইত। পূর্ণ-যুবক রামকৃষ্ণকে কেহই যুবা বলিয়া জ্ঞান করিত না। তাঁহাকে পঞ্চমবর্ষীয় বালকের ন্যায় সকলে ব্যবহার করিত। স্ত্রীলোকেরা তাঁহার সম্মুখে আসিতে কখন লজ্জা করিতেন না, অথবা তাঁহাদের কোন মতে লজ্জার উদ্রেক হইত না। হৃদয় স্ত্রীলোক লইয়া তাঁহার সহিত যে সকল অত্যাচার করিয়াছিল, রাসমণি এবং মথুর বাবুও তাহা জানিতেন; কিন্তু এমনই মনুষ্যের দুর্ব্বল মন, এমনই অবিশ্বাসী হৃদয় যে, এই বালকবৎ, উন্মাদবৎ রামকৃষ্ণকে লইয়া ইন্দ্রিয় পরীক্ষা করা হইয়াছিল।

কলিকাতার অন্তঃপাতী মেছুয়াবাজারের লছ্মীবাই নাম্নী বারাঙ্গনার সহিত পরামর্শ করিয়া পরমহংসদেবকে তথায় লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। লছ্মীবাই একটী গৃহমধ্যে পনের ষোলটী পূর্ণ যুবতীদিগকে অর্দ্ধোলঙ্গাবস্থায় রাখিয়াছিল।

পরমহংসদেবকে সেই গৃহের মধ্যে লইয়া গিয়া মথুর বাবু অদৃশ্য হইলেন। পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে, এই সময়ে পরমহংসদেব উলঙ্গাবস্থায় থাকিতেন। একখানি উত্তরীয় বস্ত্রের দ্বারা অঙ্গাবরণ থাকিত। উলঙ্গ রামকৃষ্ণদেব দেখিলেন যে, গৃহটী যুবতীমণ্ডলী দ্বারা পরিবৃত। তাহাদের রূপলাবণ্যে, অঙ্গসৌষ্ঠবে ও নয়নভঙ্গী দ্বারা মুনির মন, অকামী ও নপুংসকের চিত্তবিকার উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। স্ত্রীলোকেরা একেই জগন্মোহিনী, তাহাতে আবার সেইদিন হরহৃদিবিহারিণী হরমোহিনীর স্নেহাঞ্চলাচ্ছাদিত রামকৃষ্ণের মনোমোহনের অভিপ্রায়ে মোহিনীজাল বিস্তীর্ণ করিয়া প্রাণপণে স্ব স্ব অভীষ্ট সিদ্ধির মানসে প্রতীক্ষা করিতেছিল। পরমহংসদেব তাহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবামাত্র অমনই সকলকে "মা আনন্দময়ী! মা আনন্দময়ী!" বলিয়া মস্তকাবনত পূর্ব্বক প্রণিপাত করিলেন এবং তাহাদের মধ্যস্থলে উপবেশন করিয়া "মা ব্রহ্মময়ী! মা আনন্দময়ী!" বলিতে বলিতে সমাধিস্থ হইয়া যাইলেন। সমাধিকালে তাঁহার দুই নয়নে অনর্গল প্রেমাশ্রু বহির্গত হইতে লাগিল। বারাঙ্গনারা পরমহংসদেবের ভাব অবলোকন করিয়া ভীত হইল এবং শশব্যস্ত হইয়া কেহ বায়ু ব্যজন করিতে লাগিল ও কেহ অপরাধিনী হইয়াছি বলিয়া গললগ্নীকৃতবাসে ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে লাগিল। এই ঘটনায় মথুর বাবু নিতান্ত লজ্জিত হইয়াছিলেন এবং পরমহংসদেবের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি বৃদ্ধি হইয়া গেল। তিনি তদনন্তর তাঁহার পাদপদ্মে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া কৃতদাসের ন্যায় আপনাকে বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

মথুর বাবুর পরীক্ষার কথা সকলেই শ্রবণ করিলেন, তাহাতে কেহ আশ্চর্য্য হইল এবং কেহ বা নানাপ্রকার দোষারোপ করিতে লাগিল। এই সময়ে অনেকের মনে এইরূপ ধারণা হইয়াছিল যে, রামকৃষ্ণ সিদ্ধ হইতে পারেন নাই, তবে ইন্দ্রিয় জয় পক্ষের কারণ এই যে, নানাপ্রকার স্নায়বীয় রোগবশতঃ পুরুষার্থহানি হইয়াছে, তন্নিমিত্ত স্ত্রীর নিকট গমন করিতে অসমর্থ হইয়া থাকেন। এইরূপে যাহার যে প্রকার স্বভাব, সে সেই প্রকারে পরমহংসদেবকে দর্শন করিতে লাগিল। রাসমণি দাসীও একথা শ্রবণ করিলেন। তিনি নিজে পরমহংসদেবের সিদ্ধাবস্থা জ্ঞাত হইয়াও (বিষয়ীর মন এমনই দুর্ব্বল যে) পুনরায় তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। আমরা পরমহংসদেবের নিকটে শুনিয়াছি যে, "একদিন সন্ধ্যার সময় আমি কুঠীতে শয়ন করিয়া আছি, এমন সময়ে গিন্নির প্রেরিত দুইজন স্ত্রীলোক আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল।

তাহারা দুই চারিটী অন্য কথা কহিয়া অমনি আমার (সৌজন্যের অনুরোধে লিখিতে পারিলাম না) ধারণ করিল। আমি মা! মা! মা! বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলাম। পরে, আর আমার কোন জ্ঞান ছিল না। চৈতন্য লাভ করিয়া দেখি যে, তাহারা আমার পদধারণ করিয়া রোদন করিতেছে।” পরমহংসদেব অমনি চরণ সঙ্কুচিত করিয়া তাহাদের মা আনন্দময়ী বলিয়া নমস্কার করিলেন। স্ত্রীলোকদ্বয় তদনন্তর নানাপ্রকার অনুনয় বিনয় পূর্ব্বক প্রস্থান করিল।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, পরমহংসদেব স্ত্রীজাতিকেই প্রকৃতির অংশ জ্ঞানে মা বলিতেন। তিনি কালীর মন্দিরে যাইয়া প্রার্থনা করিতেন, “মা! অবিদ্যাও তুই,আর বিদ্যাও তুই। তুই মা গৃহস্থের কুলবধূ,আবার তুই মা মেছো-বাজারের খান্‌কী। মা! তুই উভয় রূপেই আমার মা। আমি তোর্ সন্তান।”

পরমহংসদেব দুইবার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও তথাপি অব্যাহতি পাইলেন না। একদা বৈষ্ণবচরণ পরমহংসদেবকে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কাছিবাগান নামক স্থানে লইয়া গিয়াছিলেন। সে স্থানে নবরসিক ভাবের লোকের বাসই অধিক। পরমহংসদেব তথায় উপস্থিত হইবামাত্র স্ত্রীলোকেরা আসিতে লাগিল এবং তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া উপবেশন করিল। এই স্ত্রীলোকেরা বারাঙ্গনা নহে; কিন্তু তাহাদের ধর্ম্মের এ প্রকার জঘন্যভাব যে,তাহা সাধারণের নিকটে প্রকাশ করিতে অপারক হইতেছি। এই শ্রেণীর মতে প্রকৃতিসাধনই একমাত্র আনন্দ সম্ভোগের নিদানস্বরূপ; সুতরাং প্রকৃত আধ্যাত্মিকতত্বে জলাঞ্জলি দিয়া পরকীয় রসাস্বাদনের বিকৃতভাব সাব্যস্ত করিয়া তাহারা ইন্দ্রিয়-সুখ-চরিতার্থ করাই ধর্ম্মের সার জ্ঞান করিয়া থাকে। এই ধর্ম্মের সহিত বৃন্দাবনের রাসলীলার সাদৃশ্য দেখান হয়; কিন্তু রাসলীলার প্রকৃত ভাবের অধিকারী কেবল পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই হইয়াছিলেন এবং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক সেই শৃঙ্গার রসকাহিনী শ্রবণ করিয়াছিলেন। নবরসিকেরা শৃঙ্গার রসে আপনারা মাতিয়া থাকে। বৈষ্ণবচরণ পরম পণ্ডিত হইয়া এই মতটী বিশিষ্টরূপে পোষকতা করিতেন। সে যাহা হউক, পরমহংসদেবকে প্রাপ্ত হইয়া নবরসিক-দের কোন যুবতী শশব্যস্ত হইয়া তাঁহার পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলী মুখমধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া ফেলিল এবং দ্বিতীয় যুবতী অতি কুৎসিত কার্য্যের ভাব দেখাইল। পরমহংসদেব বৈষ্ণবচরণকে তিরস্কার পূর্ব্বক তথা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। নবরসিকেরা তাঁহাকে “অটুট্” বলিয়া জানিতে পারিল।

যখন পরমহংসদেবকে এইরূপে নানাবস্থায় ফেলিয়া পরীক্ষা দ্বারা তাঁহার ইন্দ্রিয় বিকার সম্বন্ধে সকলেরই ভ্রম বিদূরিত হইল, তখন অন্য কেহ তাঁহাকে ভক্তি দেখান আর নাই দেখান, মথুর বাবু সর্ব্বাপেক্ষা বিমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পরমহংসদেব ইচ্ছামত কালীর পূজা করিতে যাইতেন। এই পূজা নিত্য পূজার মধ্যে পরিগণিত হইত না। কারণ, পরমহংসদেবের উন্মত্তাবস্থা হইতেই হৃদয়ানন্দ তাঁহার কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। একদা তিনি পূজা করিতে গিয়া দেবীর জন্য যে সকল পুষ্প মাল্যাদি প্রস্তুত করা ছিল, তাহা আপনার গলদেশে ধারণ পূর্ব্বক ও চন্দনাদি নিজ অঙ্গে প্রলেপন করিয়া সমাধিতে বসিয়াছিলেন। মন্দিরের কর্ম্মচারীরা ইহাতে বিরক্ত হইয়া, যাহাতে তিনি একাকী মন্দিরে প্রবেশ করিতে না পারেন, এমন যুক্তি করিয়াছিল; কিন্তু পরমহংসদেব যখন নিজের ভাবে মন্দিরে গমন করিতেন, তখন তাঁহাকে কোন কথা বলিবার কাহার সাহস হইত না। আর একদিন তিনি পূজা করিতে গিয়া দেবীর পাদপদ্মে পুষ্প বিল্বদল প্রদান না করিয়া মন্দিরের মধ্যে ভৃত্য এবং অন্যান্য পদার্থ যাহা কিছু উপস্থিত ছিল, তৎসমুদয়ই পূজা করিয়াছিলেন। তিনি মধ্যে কতকগুলি বিড়াল রাখিয়াছিলেন। পূজার সময় চিনি প্রভৃতি দ্রব্য সামগ্রী কালীকে নিবেদন করিয়া না দিয়া কখন কখন তাহা বিড়ালদের খাইতে দিতেন ও আপনিও ভক্ষণ করিতেন। পরমহংসদেবের এই প্রকার স্বেচ্ছাচার ভাব দর্শন করিয়া মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক যারপরনাই বিরক্ত হইয়া তৎসমুদয় মথুর বাবুর কর্ণগোচর করিল। মথুর বাবুর নিকট হইতে কোন প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই পরমহংসদেবের মন্দিরে প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ হইল। এই আদেশ দ্বারবানের প্রতি ভারার্পণ করার পর, একদা পরমহংসদেব মন্দিরে প্রবেশ করায় সে প্রথমে তাঁহাকে নিষেধ করিল; কিন্তু তিনি এমন ভাবে বিহ্বল হইয়া যাইতেছিলেন যে, সে কথা তাঁহার কর্ণবিবরে প্রবিষ্ট হইল না। দৌবারিক এতদ্দৃষ্টে বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক তাঁহার গতিরোধ করিবার জন্য প্রয়াস পাইল। পরমহংসদেব তাহাকে একটী মুষ্ট্যাঘাত করিয়া মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক ইচ্ছামত পূজা করিতে

লাগিলেন। দ্বারবান এক মুষ্ট্যাঘাতে এত অধীর হইয়াছিল যে, সে তৎক্ষণাৎ সেই স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তত্ত্বাবধায়ক এই সংবাদে ক্রোধে অধীর হইয়া নানাপ্রকার কাল্পনিক ভাবে তাহা মথুর বাবুকে নিবেদন করিয়া পাঠাইল। মথুর বাবু পরমহংসদেবের বিরুদ্ধে কর্ম্মচারীদিগের বর্ণনাতিশয্য ও দোষারোপ দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কার্য্যের প্রতি কেহ কোন কথা বলিতে পারিবে না। তাঁহার যাহা ইচ্ছা করিবেন। এই কথায় বৃত্তিভোগী কর্ম্মচারীরা বাহ্যিক নিরস্ত হইল বটে, কিন্তু অন্তরে অন্তরে ক্রোধে, অপমানে, হতাশায় জর্জ্জরীভূত হইতে থাকিল।

পরমহংসদেবের প্রতি মথুর বাবুর এতাদৃশ ভক্তি এবং বাধ্যবাধকতা দেখিয়া সকলে মনে মনে স্থির করিল যে, ভট্টাচার্য্য মহাশয় মথুর বাবুকে "গুণ" করিয়াছে। তাহা না হইলে, যে মথুর বাবুর বিক্রমে সকলেই আতঙ্কে জড় সড় হইত, যে মথুর বাবুর নিকটে এক সময়ে পরমহংসদেব অগ্রসর হইতে পারিতেন না, আজ সেই মথুর বাবু পরমহংসদেবের এতাদৃশ বশীভূত হইয়া যাইলেন যে, কালী পূজার উপকরণাদি ভক্ষণ করিয়া নিস্তার পাইয়া গেলেন। হিন্দুদিগের পক্ষে একার্য্য নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয়। কালী যাহাদের ইষ্টদেবী, ভগবতী, স্বয়ং ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী, তাঁহার দ্রব্য একজন মনুষ্যে ভক্ষণ করিয়া ফেলিল; তাহাতে দ্বিরুক্তি না করা সামান্য কথার কথা নহে। সাধারণ লোকের পক্ষে একথা যারপরনাই অন্যায় এবং অবৈধ বলিয়া অবশ্যই পরিগণিত করিতে হইবে। কিন্তু মথুর বাবু বাতুল হন নাই এবং তাঁহার বাহ্যজ্ঞানও বিলুপ্ত হয় নাই, তবে কেন তিনি পরমহংসদেবের এ প্রকার ব্যবহারে কোন কথা বলেন নাই; আমরা তাহার কারণ অবগত আছি। সে কথা স্থানান্তরে প্রকাশ করিব।

মথুর বাবু পরমহংসদেবের এই অন্যায় কার্য্যে পোষকতা করিলে, তাহা রাসমণিরও কর্ণগোচর হইল। রাসমণি মনে মনে নিতান্ত বিরক্ত হইয়াও মথুর বাবুর কথার প্রতি কোন মতামত প্রকাশ করিতে পারিলেন না। পরে একদিন তিনি স্বয়ং মন্দিরে আগমন করিলেন।

রাসমণি পট্টবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক দেবী-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, পরমহংসদেবও তথায় রহিয়াছেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে হইতে যখনই মন্দিরে আসিতেন, পরমহংসদেবের নিকট দুই একটী শক্তিবিষয়ক গীত শ্রবণ না করিয়া যাইতেন না। এবারেও তদ্রূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। পরমহংসদেব গান করিতে লাগিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ রাসমণির মন গানে সংলগ্ন না হইয়া কোন

মোকদ্দমায় চলিয়া গেল। পরমহংসদেব তাহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার পৃষ্ঠদেশে করাঘাত করিয়া যথোচিত ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। রাসমণি দাসী স্ত্রীলোক, বিশেষতঃ মন্দিরের কর্ত্রী, তাঁহাকে তাঁহার বেতনভোগী পূজক করাঘাত করিল, এ সংবাদে সকলেই ভীত হইল এবং ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের এই বার কি হয় বলিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য কৌশল, রাসমণি এইরূপ অপমানে ক্রুদ্ধা কিম্বা অভিমানিনী না হইয়া বিমর্ষভাবে মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া যাইলেন। রাসমণি, কি জন্য তাঁহার অভিপ্রায় কিছুই প্রকাশ করিলেন না, তাহা কাহারও অনুমানের গোচর নহে, হয় তাঁহাকে ব্রাহ্মণ জ্ঞানে, না হয় বাতুল বলিয়া, অথবা নিজের মনের কথা জানিতে পারিয়াছেন সুতরাং সিদ্ধপুরুষ বিবেচনায়, নিস্তব্ধ হইয়াছিলেন। যাহা হউক, তখন তিনি কিছু বলিলেন না বটে, কিন্তু সময়ান্তরে পরমহংসদেবকে নিভৃতে পাইয়া বলিয়াছিলেন, "ভট্টাচার্য্য মহাশয়! মথুর কি আপনাকে কিছু * বলিয়াছিল?" পরমহংসদেব কোন প্রত্যুত্তর দেন নাই।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, পরমহংসদেবের মনে যখন যে কোন ভাবের উদ্রেক হইত, তিনি তাহারই অনুষ্ঠান করিতেন এবং সেই কার্য্যের সহায়তা হেতু একজন সাধু আসিয়া উপস্থিত হইতেন। অনন্তর তাঁহার মনে ভগবান্ রামচন্দ্রের ভাব † আসিয়া অধিকার করিল। তিনি বুঝিলেন যে, হনুমানই রামচন্দ্রের প্রকৃত ভক্ত। তাঁহার অনুবর্ত্তী না হইলে রামচন্দ্রের চরণ লাভ করা যায় না। হনুমানের অহৈতুকী ভক্তি ছিল। তিনি পৃথিবীতে যে কোন পদার্থ দেখিতেন, তাহার মধ্যে রামচন্দ্রকে দেখিতে না পাইলে তাহা গ্রহণ করিতেন না। তাঁহার ন্যায় নিষ্ঠা ভক্তি অতি বিরল। তিনি জানিতেন যে,

---

* রাসমণির মনে হইয়াছিল যে, মথুর বাবু পরমহংসদেবের দ্বারা তাঁহাকে বশীভূত করিবার মানস করিয়াছিলেন।

† কোন কোন ভক্ত বলেন যে, তিনি কালী দর্শন করিবার পূর্ব্বে রামমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সাধন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার মুখ হইতে শোণিত নিঃসৃত হইয়াছিল। একথা সত্য হইলেও তিনি হনুমানের ভাব সাধন যে পরে করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সর্ব্বত্রেই রামচন্দ্র আছেন, রামচন্দ্র ব্যতীত কোন বস্তু হইতে পারে না, তথাপি রামচন্দ্রের নবদূর্ব্বাদল সদৃশ রূপ ভিন্ন অন্য কোনরূপ দেখিতে চাহিতেন না। এই নৈষ্ঠিক ভক্তি প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত পরমহংসদেব হনুমানের ভাব সাধন করিয়াছিলেন। যখন তাঁহাতে পবন-সুতের ভাবাবেশ হইত, তখন তাঁহার নিকট কেহই থাকিতে পারিত না। তাঁহার হাবভাব ও শারীরিক অন্যান্য লক্ষণে মনুষ্যস্বভাবের বিপরীত ভাব প্রকাশ পাইত। তিনি তদবস্থায় রঘুবীর শব্দ এমন উচ্ছ্বাস ও গম্ভীর বাক্যে বলিতেন, যেন তিনি তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া সম্বোধন করিতেছেন বলিয়া সকলের জ্ঞান হইত। এই অবস্থায় তাঁহার সম্মুখে পেয়ারা ও অন্যান্য সাময়িক ফল সংস্থাপন না করিলে, তিনি মহা গোলযোগ উপস্থিত করিতেন। ফল পাইলে তাহা আপনি কামড়াইয়া ভক্ষণ করিতেন। কখন তিনি কাপড়ের লাঙ্গুল পরিয়া বৃক্ষের উপর বসিয়া থাকিতেন এবং রাম রঘুবীর বলিয়া চীৎকার করিতেন। পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন যে, এই সময়ে তাঁহার ইঞ্চিপ্রমাণ লাঙ্গুল জন্মিয়াছিল, উহা পরে খসিয়া যায়। এই সময়ে পরমহংসদেব জনৈক রামাৎ সন্ন্যাসীর নিকট রামমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এই সাধুর একটী পিতলের রামমূর্ত্তি ছিল। এই মূর্ত্তির প্রতি পরমহংসদেবের বাৎসল্যভাব হইত। শুনিয়াছি, তিনি যখন বাগানে যে কোন স্থানে যাইতেন, রামলালা (ঐ মূর্ত্তির নাম) তাঁহার সঙ্গে যাইতে চাহিতেন। সময়ে সময়ে পরমহংসদেব তাঁহার সহিত এমন ভাবে বাক্যালাপ করিতেন যে, সে কথা শুনিলে বাস্তবিক ঘটনা বলিয়া নিশ্চয় বুঝা যাইত। একদা বৃষ্টির সময়ে পরমহংসদেব বহির্দ্দেশে গমন করিতেছিলেন, পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "ফের যদি অমন ক'রে বিরক্ত কর্‌বি, তা হ'লে তোকে প্রহার ক'র্ব্ব। শুন্‌লিনে—আরে পাগল, বাগানে কাদা হয়েছে, পায়ে লাগ্‌বে। বৃষ্টিতে গা মাথা ভিজে যাবে, শেষে কি জ্বর ক'রে বস্‌বি ?" আর একদিন গঙ্গাস্নানের সময় পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন, "দেখ্ অত ক'রে জলে থাকিস্‌নে, অত জলে যাস্‌নে, ডুবে যাবি। আয় তোর গা পরিষ্কার করিয়া দিই।" আমরা তাঁহার মুখে এই সকল কথা শুনিয়াছি। তিনি আরও বলিতেন যে, রামলালা দেখিতে ঠিক তিন চারি বৎসরের বালকের ন্যায়। অমন অঙ্গসৌষ্ঠব ও দেহের কান্তি কেহ কখন দেখে নাই। তাহার কথা শুনিলে আপনাকে আপনি ভুলিয়া যাইতে হয়। রামলালা মূর্ত্তিটী পরমহংসদেবকে পূর্ব্বোক্ত সাধু দিয়া গিয়াছিলেন। উহা অদ্যাপি দক্ষিণেশ্বরে আছে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

পরমহংসদেব এইরূপে রাম-বিষয়ক সাধনান্তে নানাবিধ সম্প্রদায়ের সাধুর সহিত মিলিয়া তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট দীক্ষিত এবং সাধন দ্বারা তাহাতে সিদ্ধমনোরথ হইয়া পরিশেষে শ্রীদাম সুবলাদির ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক সখ্য প্রেমের সাধন আরম্ভ করেন। তখন তিনি ভাবাবেশে শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া মনের সাধে অলকা তিলকা দ্বারা সুসজ্জিত করিতেন। কখন বা, চরণে নূপুর পরাইয়া রুণু ঝুনু শব্দ শ্রবণ করিয়া আপনিও আনন্দে নৃত্য করিতেন। কখন বা, গহন কাননে কৃষ্ণের অদর্শন বশতঃ বুক চাপড়াইয়া রোদন করিতেন। কখন বা, এই বিরহান্তে কৃষ্ণকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক "ভাই কানাই আর তোকে ছেড়ে দেবোনা ভাই! তোর অদর্শনে প্রাণ ব্যাকুল হ'য়ে উঠে, আমরা দশদিক্ শূন্যময় দেখি। এই নে ভাই! ফল খা,"—ইত্যাকার কত কথাই বলিতেন! কখন বা, তিনি নন্দ যশোদার বাৎসল্যভাবে গোপাল গোপাল বলিয়া রোদন করিতেন এবং সময়ান্তরে গোপালকে ক্রোড়ে লইয়া অপার আনন্দ সম্ভোগ করিতেন।

কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় এইরূপ বিবিধ সাধন করিয়া পরমহংসদেব সখীভাবের সাধন আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি সকল সাধনের পূর্ব্বে ভক্তবিশেষের শরণাগত হইয়াছিলেন, সখীভাবেও তাহাই দৃষ্ট হইয়াছিল। সখীভাবে দুইবার সাধন করেন। প্রথমে, তিনি অষ্ট নায়িকার ভাবাবলম্বন পূর্ব্বক নায়িকাদিগের বেশ-ভূষায় বিভূষিত হইয়া ও দক্ষিণ হস্তে চামর গ্রহণানন্তর মহাকালের বক্ষঃস্থল-বিরাজিত মহাকালীর সম্মুখে দাসীর ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিতেন। মধ্যে মধ্যে নৃত্য করিতেন এবং চামরের দ্বারা বায়ু ব্যজন করিয়া দেবীর শরীরে শৈত্যোৎ-পাদন করিতেন।

দ্বিতীয় প্রকার সখীভাবে, বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীমতি রাধিকার অষ্টসখীর সেবিকা হইয়াছিলেন। তিনি স্ত্রীর বেশ ধারণ করিবার নিমিত্ত মস্তকে পরচুলা, নাসিকায় বেসর (পশ্চিমাঞ্চলের নাসাভরণবিশেষ) চক্ষে অঞ্জন, ললাটে সিন্দূর, নাসাপৃষ্ঠে তিলক, অধরে তাম্বুল, কর্ণে কর্ণাভরণ, কণ্ঠে হার, বক্ষে কাঁচুলী এবং তদুপরি ওড়্না, বাহুযুগলে নানাবিধ অলঙ্কার, পরিধানে পেশোয়াজ, কটিদেশে চন্দ্রহার এবং চরণদ্বয়ে নূপুর পরিধান করিতেন। এই অলঙ্কার পরিচ্ছদাদি মথুর বাবু প্রদান করিয়াছিলেন। পরমহংসদেব বেশভূষা ধারণ পূর্ব্বক কোন্

স্থানে উপবেশন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতেন, "কোথায় ললিতা! কোথায় বিশাখা! একবার আমার প্রতি দয়া কর। আমি অতি হীন, অতি দীন, আমার উপায় কি হইবে? আমি শুনিয়াছি যে, শ্রীমতি তোমাদের প্রেমে চির-বিক্রীত। তোমাদের দয়া ব্যতীত রাধার সাক্ষাৎ কেহ পাইতে পারে না। আমি পূজা জানি না,আমি ভজন জানি না, আমি তোমাদের দাসীর দাসী, আমায় দয়া কর। তোমাদের দয়া না হ'লে রাধাকে পাবো না।" এই বলিতে বলিতে তাঁহার হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার হইয়া আসিত, তাঁহার নয়নযুগল হইতে অনর্গল অশ্রু নির্গত হইত এবং বাক্য গদ্গদ হইয়া আসিত। তিনি তখন সরোদনে কীর্ত্তনের সুরে বিরহ-বিষয়ক গান করিতে করিতে সমাধিস্থ হইয়া যাইতেন। তিনি অচিরাৎ শ্রীমতির দর্শনলাভ করিলেন। তিনি একদিন বসিয়া আছেন,এমন সময়ে দেখিলেন,একটী অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যবিশিষ্টা পূর্ণযুবতী তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। তিনি অলঙ্কারে বিভূষিতা, তাঁহার পরিচ্ছদ জরীর পেশোয়াজ, কাঁচুলী এবং ওড়না। মস্তকে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ কোঁকড়ান কেশজাল, ইহার কিয়দংশ মুখের উপর পতিত হইয়া বদনকান্তির অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পাদন করিতেছিল। পরমহংসদেবের প্রতি নিরীক্ষণপূর্ব্বক ঈষৎ হাস্যিলেন এবং উভয় হস্তের অঙ্গুলির মধ্যে অঙ্গুলি স্থাপনা পূর্ব্বক সঞ্চাপন করিতে করিতে অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। তদবধি তাঁহার সখীভাব চলিয়া গেল। তিনি কখন বলিতেন, "কোথায় শ্রীমতি! কোথায় রাধে প্রেমময়ী! একবার আমায় দয়া কর। তুমি অষ্ট সখীর শিরোমণি,তুমি মহাভাবময়ী মহাভাবপ্রসবিনী, তুমি দয়া কর। তোমার দয়া না হইলে আমি ত কৃষ্ণের দেখা পাবো না। কৃষ্ণচন্দ্র তোমার, তোমার প্রেমে তিনি বাঁধা আছেন। তুমি ছাড়িয়া দিলে তবে তাঁহার দেখা পাবো। তাই বলি, আমায় দয়া কর। কৃষ্ণ দর্শনের জন্য আমার প্রাণ ব্যাকুলিত হইতেছে। নিষেধ মানে না, বারণ শোনে না, কৃষ্ণ এনে দেখাও। দেখ সখি! চেয়ে দেখ, আমার প্রাণ কোথায়? প্রাণ ওষ্ঠাগত, প্রাণ বক্ষ-পিঞ্জর ভেদ করিয়া বুঝি বহির্গত হইয়া যায়। আমায় রক্ষা কর, কৃষ্ণ দিয়ে প্রাণ বাঁচাও। তোমার কৃষ্ণ আমি লইব না, তোমাকে ফিরাইয়া দিব। আমি কেবল একবার চক্ষের দেখা দেখিব।" এইরূপে রোদন করিতে করিতে তিনি সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িতেন। ক্রমে, তিনি আপনাকেই শ্রীমতি জ্ঞান করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার ন্যায় স্বভাব প্রকাশ করিয়া কৃষ্ণকে স্বামী বলিয়া সম্বোধন করিতেন। কখন বা, কৃষ্ণের অদর্শনে এইরূপ গীত গান করিতেন।

শ্যামের নাগাল পেলুম না স'ই।
আমি কি সুখে আর ঘরে র'ই॥
শ্যাম যে মোর নয়নের তারা,
তিলেক আধো না দেখ্‌লে স'ই হই দিশেহারা;
আবার শ্যামের লেগে ভেবে ভেবে দিশেহারা হ'য়ে র'ই॥
শ্যাম যদি মোর হ'তো মাথার চুল,
আমি যতন ক'রে বাধ্‌তুম বেণী, স'ই দিয়ে বকুল ফুল;
আমি বনপোড়া হরিণের মত ইতি উতি চেয়ে র'ই॥
শ্যাম যখন অই বাজায় গো বাঁশী,
আমি তখন যমুনাতে জল লয়ে আসি;
আমার কাঁকের কলসী কাঁকে রৈল, শ্যামের বদন পানে চেয়ে র'ই॥

গীত সমাপ্তির সহিত তাঁহারও বাক্য সমাপ্ত হইয়া আসিত। তিনি স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতেন, চক্ষের পলক পতিত হইত না। বদনে হাস্যের ছটা, দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী অঙ্গুলি দ্বারা কি যেন নির্দ্দেশ করিতেছেন। এই ভাব ক্রমে অবসাদন হইয়া আসিলে, তবে পূর্ব্ব প্রকৃতিস্থ হইতে পারিতেন।

সখীভাব সাধন-কালীন পরমহংসদেবের স্বভাব চরিত্র ও শারীরিক গঠন অবিকল স্ত্রীলোকের ন্যায় হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার নিকট আমরা শ্রবণ করিয়াছি যে, এই সময়ে তিনি প্রতি মাসে তাঁহার বস্ত্রে শোণিত চিহ্ন * দেখিতে পাইতেন।

সখীভাবে অবস্থিতি কালে পরমহংসদেব স্ত্রীলোকদিগের সহিত অধিক সময়

* আধুনিক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা এই কথায় আমাদের বাতুল বলিয়া সাব্যস্ত করিবেন, তাহার ভুল নাই; কিন্তু তাঁহাদের গোচরার্থ বিলাতের একটী ঘটনা এই স্থানে উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইলাম। যদ্যপি কোন বিষয়ের প্রগাঢ় সংস্কার জন্মিয়া যায়, তাহা হইলে সেইরূপ কার্য্য প্রকাশ পাইবার কোন প্রকারে কেহই প্রতিবন্ধক জন্মাইতে পারে না। একদা ডাক্তার ওয়ার্ডেন আমাদের নিকট গল্প করিয়াছিলেন যে, একব্যক্তির স্ত্রীর মৃত্যু হইলে তাহার শিশু সন্তান যখন ক্রন্দন করিত, সে ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ উহাকে বক্ষোপরে স্থাপন পূর্ব্বক মাতার ন্যায় সান্ত্বনা করিতে প্রয়াস পাইত। শিশুটী যতক্ষণ বক্ষের উপর থাকিত, ততক্ষণ সে আপনাকে বিস্মৃত হইয়া যাইত। কিছুদিন এই ভাবে দিন যাপন করিয়া ঐ পুরুষটীর স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার হইয়াছিল। সংস্কারে (Impression) যা হইবার নহে, তাহাও হইতে পারে। এই মর্ম্মে ইংরাজী পুস্তকে ভূরি ভূরি উপাখ্যান আছে। ইংরাজী পুস্তকের দোহাই না দিলে, আজকাল কেহ কোন কথা বিশ্বাস করেন না, তন্নিমিত্ত এ প্রস্তাবের অবতারণা করিতে হইল।

অতিবাহিত করিতেন। কথায় কথায় সহজ জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া তিনি জড়ভাব প্রাপ্ত হইতেন। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, এই ভাবকে ব্রাহ্মণী মহাভাব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। মহাভাব সেই জন্য পরমহংসদেবের এই সাধন-ফল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না, তাহা কুম্ভক যোগের পূর্ব্বে আপনা হইতেই উদয় হইত। এই মহাভাবের বৃত্তান্ত চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে বিশেষরূপে বিবৃত আছে। মহাভাব সাক্ষাৎ শ্রীমতি-স্বরূপিনী, মহাভাব উপস্থিত হইলে অশ্রু, কম্প, স্বরভঙ্গ, পুলক, স্বেদ, উন্মত্ততা এবং মৃতপ্রায় লক্ষণ সকল পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই ভাব মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের জীবনবৃত্তান্তেই শুনা গিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার অপ্রকটাবস্থার পর এ পর্য্যন্ত আর কোন ব্যক্তিতে মহাভাবের লক্ষণ দেখা যায় নাই। পরমহংসদেবের শিষ্যদিগের মধ্যে অনেকেরই ভাব হইতে দেখা গিয়াছে এবং চৈতন্য প্রভুর সমকালীন তাঁহার শিষ্যদেরও ভাবাবেশ হইত বলিয়া জনশ্রুতি আছে, কিন্তু মহাভাব শ্রীচৈতন্য এবং পরমহংসদেব ব্যতীত আর তৃতীয় ব্যক্তির দেখা যায় নাই।

পরমহংসদেব একদিকে সখীভাবে মহাভাব লাভ করিয়া কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত বিহার-সুখ সম্ভোগ করিতেন এবং অপরদিকে দিবা রজনী স্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যে বাস করিতেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার মনের কথা কেহ বুঝিতে পারে নাই। মথুর বাবু তখন পরমহংসদেবের নিতান্ত অনুগত ছিলেন। তাঁহাকে না দেখিলে তিনি চতুর্দ্দিক শূন্যময় বোধ করিতেন, সুতরাং সর্ব্বদাই কাছে কাছে থাকিতেন। তাঁহার আহারের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। পরিধানের নিমিত্ত বালুচরের অত্যুৎকৃষ্ট চেলী আনাইয়া তিনি আপন হস্তে পরাইয়া দিতেন। শীতকালে বহু মূল্যের বস্ত্রাদি প্রদান করিতেন, কিন্তু পরমহংসদেব উহা একবারের অধিক ব্যবহার করিতে পারিতেন না। মূল্যবান পরিধেয় বস্ত্রগুলি প্রায়ই তিনি ছিঁড়িয়া ফেলিতেন এবং দেড়সহস্র টাকা মূল্যের একখানি শীত বস্ত্র সম্বন্ধে আমরা শুনিয়াছি যে, মথুর বাবু আপনি বারানসী শালখানি গায়ে জড়াইয়া দিয়াছিলেন। পরমহংসদেব কিয়ৎকাল পরে ভাবাবেশে কহিতেছিলেন, "মন! এর নাম শাল, ভ্যাড়ার-লোম, আগুনে দিলে পুড়িয়া যায়। তখন এমন দুর্গন্ধ নির্গত হয় যে, কেহ তাহাতে সুস্থির হইতে পারে না। এই শালের দাম দেড়সহস্র টাকা। ইহা গায়ে দিলে মনে রজোগুণ বাড়িয়া যায়। সাধারণ লোক এ শাল গায়ে দিতে পারে না। তাহারা কালো মোটা চাদর ব্যবহার করিয়া থাকে। এ শাল গায়ে দিয়া তাহাদের নিকটে

যাইলে মন গরম হইয়া উঠে, সেই লোকদিগকে হীন বলিয়া জ্ঞান হয়। পাছে তাহাদের গায়ে গা ঠেকে, এই জন্য অতি গর্ব্বিত ভাবে, 'ওরে তুই ছোট লোক সরে যা' এইরূপ অহঙ্কারের কথা বাহির হইয়া থাকে।" এই প্রকার আপনা আপনি বিচার করিতে করিতে সেই শালখানি মৃত্তিকায় নিক্ষেপ করতঃ তদুপরি 'থু থু' করিয়া থুৎকার প্রদান করিতেছিলেন, এমন সময় মথুর বাবু আসিয়া তাহা দর্শন করিলেন। তাঁহার চক্ষে জল আসিল এবং মনে করিলেন, এ মহাপুরুষের নিকট আর আমি অর্থের গরিমা প্রকাশ করিব না।

তিনি অতঃপর পরমহংসদেবকে জানবাজারস্থ বসতবাটীর অন্তঃপুরে লইয়া রাখিলেন। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, মথুর বাবু তাঁহাকে না দেখিলে বড়ই কাতর হইতেন, সে বিষাদ আর তাঁহার থাকিল না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

পরমহংসদেব জানবাজারে আসিয়া সর্ব্বদাই অন্তঃপুরে বাস করিতেন। অন্তঃপুরবাসিনীগণ সকলেই তাঁহাকে অতি আদরের ধন বলিয়া জানিতেন। পরমহংসদেবকে পুরুষ বলিয়া কেহ লজ্জা করিত না, কিম্বা সহসা তাঁহার সম্মুখে আসিতে কেহ সঙ্কুচিত হইত না। বাটীর মহিলাগণ কেহ তাঁহাকে সন্তানের ন্যায় বোধ করিতেন এবং কেহ বা সাধু বলিয়া জ্ঞান করিতেন। মথুর বাবুর কন্যারাই প্রায় তাঁহাকে তৈলাদি মর্দ্দন পূর্ব্বক স্নান করাইয়া দিতেন। পরমহংসদেব সময়ে সময়ে ভাবাবেশে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া উলঙ্গ হইয়া পড়িতেন; কিন্তু তাহাতে কাহারও মনে বিকার উপস্থিত হইত না। বরং তাঁহারাই বস্ত্রাদি পরাইয়া দিতেন।

পরমহংসদেবের যখন যে স্থানে যাইবার ইচ্ছা হইত, তিনি স্থানাস্থান, কালাকাল, কিম্বা ব্যক্তিবিশেষ বিচার না করিয়া তথায় চলিয়া যাইতেন। কখন কখন মথুর বাবু সস্ত্রীক বিছানায় শয়ন করিয়া থাকিলে, পরমহংসদেব ঘরে ঢুকিয়াই চলিয়া আসিতেন, মথুর বাবু এবং তাঁহার স্ত্রী তাহাতে বিরক্ত হইয়া বলিতেন, "বাবা! তুমি আবার আমাদের দেখে সরে যাও কেন? তোমার কি অন্য কোন রকম ভাব আছে? বালকেরা যাহা বুঝিতে পারে, বাবা! তোমার যে সে বুদ্ধিও নাই।" যে দিবস মথুরের মনে কোন প্রকার ভাবোদয় হইত, সেই দিবস পরমহংসদেবকে আপনার নিকট শয়ন করিতে বলিতেন। পরমহংসদেব তাহাতে কোন প্রকার আপত্তি করিতেন না।

শুনা গিয়াছে যে, পরমহংসদেব তথায় প্রায় স্ত্রীবেশে থাকিতেন। যখন কোন প্রতিমা পূজাদি হইত, দেবীর বিসর্জ্জনকালীন পরমহংসদেব অন্যান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় বরণ করিতে যাইতেন। তখন তাঁহাকে এমন দেখাইত যে, অবগুণ্ঠনভাবে না থাকিলে, তাঁহাকে ছদ্মবেশী বলিয়া কেহ চিনিতে পারিত না। একদা জগদ্ধাত্রী প্রতিমূর্ত্তি নিরঞ্জন সময় বরণাদি সমাধা হইবার পর, মথুর বাবু রোদন করিয়া পরমহংসদেবকে বলিয়াছিলেন, "বাবা! আমার মা চলিয়া যাইতেছে, আমি কেমন করিয়া তাহা সহ্য করিব?" পরমহংসদেব মথুর বাবুর বক্ষোপরি হস্তার্পণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "ভয় কি, আনন্দময়ী মা তোমার হৃদয়ে আছেন।" মথুর বাবু তখন নিরস্ত হইলেন বটে, কিন্তু কিয়ৎকাল পরে তাঁহার চক্ষুদ্বয় লোহিতবর্ণ হইয়া গেল, বাক্য নিঃসরণ রহিত হইল এবং ক্রমে চেতনাবস্থা অন্তর্হিত হইয়া আসিল। সহসা এই প্রকার অবস্থা পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত সকলেই ভীত হইলেন এবং চিকিৎসাদি দ্বারা রোগোপশমের ব্যবস্থা হইতে আরম্ভ হইল; কিন্তু কিছুতেই উপকার হইল না। মধ্যে মধ্যে রোগী "বাবাকে নিকটে আন" এইরূপ প্রলাপ বলিতে লাগিলেন। পরমহংসদেব মথুর বাবুর এই প্রকার কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন এবং মাতার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তিনি অতঃপর মথুরের নিকটে গমন পূর্ব্বক গাত্রে হস্তার্পণ করিয়া তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। তদবধি সময়ে সময়ে মথুর বাবুর ভাবাবেশ হইত।

পরমহংসদেব যে কি কারণে স্ত্রীবেশে স্ত্রী-মণ্ডলীর মধ্যস্থলে বাস করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয়, কেহ কেহ বুঝিতে পারিয়াছেন, কিন্তু সাধারণ লোকেরা ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া, নানাবিধ কুভাবে তাহা পর্য্যবসিত করিয়া লইবেন, তাহার সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, পরমহংসদেব সখীভাব সাধনের সময়ে জানবাজারে যাইয়া বাস করিয়াছিলেন। তিনি যে নিরবচ্ছিন্ন এস্থানে থাকিতেন, তাহা নহে। কখন দুই দিন, কখন দশ দিন এবং কখন বা মাসাধিকও হইত। তাঁহার যখনই মন যাইত, সময় অসময় বিচার না করিয়া দক্ষিণেশ্বর চলিয়া আসিতেন।

সখীভাবের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এই স্থানে কিছু আভাস দেওয়া কর্ত্তব্য। কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে নিষ্কাম কর্ম্মই সর্ব্বপ্রশংসনীয় এবং আনন্দপ্রদ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সকাম কর্ম্মে অভীষ্ট সিদ্ধ না হইলে, নিরানন্দের সীমা থাকে না; কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্মে কর্ম্মফল আকাঙ্ক্ষা না করিয়া, কেবল কর্ম্ম করিতে হয়।

ইহাতে ফলাফলের প্রত্যাশা না থাকায় কর্ম্মীর মনে উৎসাহ কিম্বা নিরুৎসাহ একেবারেই স্থান পাইতে পারে না। ফলে, এ ক্ষেত্রে সর্ব্বদা আনন্দ বিরাজিত থাকে। সখীভাব নিষ্কাম ধর্ম্মের ন্যায় আকাঙ্ক্ষাবিহীন সাধনাবিশেষ। বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শুভমিলন করাইবার জন্যই সখীদিগের নানাবিধ আয়োজন হইত; নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করা তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য ছিল না। এই নিমিত্ত সখীদিগের ভাবকে নিষ্কাম ভাব বলা হয়।

তত্ত্বপক্ষে, সখীভাবকে মনোবৃত্তিদিগের সহিত তুলনা করা যায়। জীবাত্মা বা লিঙ্গশরীর, অর্থাৎ যে চৈতন্যাংশ পাঞ্চভৌতিক দেহ লইয়া স্বতন্ত্র হইয়া রহিয়াছেন, স্বভাবতঃ উহা জড়জগতের বিবিধ প্রকার আবরণে আবৃত থাকিয়া তাহার নিজ কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া এক কিম্ভূত-কিমাকার ধারণ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া থাকেন। এই জীবাত্মাকে প্রকৃতি বা রাধাও বলা যাইতে পারে। সখী-স্বরূপ। মনোবৃত্তিদিগের সাহায্যে জীবাত্মার পূর্ব্বাবস্থা ক্রমে বিদূরিত হইয়া পরমাত্মা বা শ্রীকৃষ্ণ লাভের সুবিধা হয়। মোহাদি বিবিধ মায়াবরণ হইতে জীবাত্মা স্বতন্ত্র হইলে, উহার স্বপ্রকাশ কহা যায়। এই সময়ে যে সকল অবস্থা সময়ে সময়ে উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহাদিগকে সাধারণ কথায় ভাব বলে। পরমাত্মা বা শ্রীকৃষ্ণ মস্তক-গহ্বরে সহস্র দল কমলোপরে বাস করিতেছেন। মনোবৃত্তি-সখীদিগের সহিত জীবাত্মা-সতী নিম্নদেশ হইতে বিবিধ ভূমি * অতিক্রম করিয়া যখন সহস্রদলে আগমন পূর্ব্বক পরমাত্মার সহিত সুমিলন কার্য্য সমাধা করেন, তখন সখীগণ ঐ যুগলমূর্ত্তির সন্নিধানে আদেশ পালনার্থ অবস্থিতি করে। এই অবস্থাকে মহাভাবের অব্যবহিত পরবর্ত্তী অবস্থা বা সমাধি কহা যায়। জীবাত্মার স্বস্থান পরিত্যাগ কাল হইতে পরমাত্মার সন্নিহিত হওয়া পর্য্যন্ত সময়কে মহাভাব বলে।

যে পর্য্যন্ত জীবাত্মা জৈব সম্বন্ধ সংস্থাপন পূর্ব্বক অবস্থিতি করেন, সে পর্য্যন্ত তিনি জীব নামে অভিহিত। জীবাত্মা স্বস্থান চ্যুত হইলে, ঐ জীবের জীবন নাশ হইয়া মৃত্যুদশা সমাগত হইয়া থাকে, যাহাকে মৃত্যু কহে। যোগ সাধনের দ্বারা যখন মৃত্যুর ন্যায় অবস্থা লাভ হয়, তাহাকেই সমাধি কহা যায়। সমাধিস্থ হইলে, পুনরায় ইচ্ছা করিয়া জৈবভাবে আসা যায়। সাধারণ মৃত্যু হইতে সমাধির এইমাত্র প্রভেদ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

* তন্ত্রমতে ইহাকে চক্র কহে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

পরমহংসদেব পূর্ব্বোল্লিখিতমতে জ্ঞান ও ভক্তি পন্থার বিবিধ শাখা পরিভ্রমণ পূর্ব্বক প্রাচীন হিন্দুদিগের বিধিবদ্ধ ও রাগানুগা ধর্ম্ম সকল এবং তাঁহার নিজ কল্পিত প্রণালীবিশেষ সাধন করিয়া তাহাদিগের চরমাবস্থায় উপনীত হইয়া দেখিলেন যে, সকল মতের পরিণাম ফল একপ্রকার। বৈদান্তিক মতের পরমহংসদিগের যে অবস্থা, তন্ত্র মতের সিদ্ধাবস্থায় কৌলদিগের * তদ্রূপ ভাব। কর্ত্তাভজাদিগের 'সহজ' বা 'আলেখ' নবরসিকের 'অটুট', বাউলদিগের 'সাঁই' এবং বৈষ্ণবদিগের 'মহাভাব' প্রভৃতি নানাবিধ ভাবের সহিত মিলাইয়া লইলেন; কিন্তু সাধনের শেষাবস্থায় কাহার সহিত কাহার পার্থক্য দেখিতে পাইলেন না। তিনি বিবিধ ধর্ম্মের আভ্যন্তরিক অবস্থা এই প্রকার প্রত্যক্ষ করিয়া বুঝিলেন যে, সাধারণ পক্ষে ধর্ম্ম জগৎ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া আছে। প্রথম, জ্ঞান বা আত্মতত্ত্ব পক্ষে এবং দ্বিতীয়, ভক্তি বা লীলা পক্ষে। বৈদান্তিক, তান্ত্রিক ও বৈষ্ণব শাস্ত্রাদি প্রথম শ্রেণীর এবং পৌরাণিক মতাদি দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। বৈদান্তিক মতে "সেই আমি বা আমিই সেই" অর্থাৎ যাহা কিছু আছে, ছিল বা হইবে, তাহা আমার অন্তর্গত অথবা আমি ছিলাম, আছি এবং হইব। ফলে, আমি ব্যতীত আর কিছুই নাই, ছিল না এবং হইবে না। যেমন পাঞ্চভৌতিক বিষয়ীভূত জগৎ। ইহার সর্ব্বস্থানেই পাঁচের সত্ত্বা উপলব্ধি হইয়া থাকে। যদ্যপি কোন একটী পদার্থ লইয়া বিচার করা যায়, তাহা হইলে কারণ ধরিয়া দেখিলে, তাহার অন্তর্গত পদার্থ সর্ব্বত্রই রহিয়াছে, জ্ঞান-দৃষ্টিতে দেখিতে পাওয়া যাইবে। কিন্তু পার্থিব পাঞ্চভৌতিক পদার্থ ব্যতীত মনুষ্যদেহে যে পরম পদার্থ আছে, তাহা অন্য কোন স্থানে সেরূপ ভাবে না থাকায়, মনুষ্য ইচ্ছাক্রমে নানাবিধ পদার্থ সৃষ্টি এবং ধ্বংস করিতে পারে। এই নিমিত্ত মনুষ্যজাতিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠপদ অধিকার করিয়াছে। জড়জগৎ হইতে চলিয়া গিয়া অর্থাৎ যোগাবলম্বন পূর্ব্বক স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ এবং মহাকারণ পর্য্যন্ত গমন করিলে, আপনার অস্তিত্ব হারাইয়া যাইবে, ইহাই বৈদান্তিক সমাধি। ভক্তিমতে মহাভাব লাভ করিয়া যে সমাধি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাও তদ্রূপ। এস্থলে কার্য্যের তারতম্য থাকিলেও ফলের প্রভেদ হইতেছে

* দক্ষিণাচারীদিগের মতবিশেষকে কুলাচার কহে; কুলাচারে সিদ্ধাবস্থাকে কৌল কহে।

ন। তন্ত্রমতে, 'পাশবদ্ধ জীব পাশমুক্ত শিব' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, মায়াবরণ দ্বারা জীবাত্মাকে স্বস্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখে। এই আবরণের নামান্তর পাশ। এই আবরণ বা পাশ বিচ্ছিন্ন হইলে, জীবের জীবত্ব বিলুপ্ত হইয়া জীব শিবত্ব বা মঙ্গলময় কার্য্য করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বৈষ্ণবমতে এই অবস্থাকে ভাব কহে। শিবত্ব লাভ করা তন্ত্রের শেষ কথা নহে। শিবের শবত্ব হইলে, তবে ব্রহ্মময়ীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়; এস্থলেও মৃত্যুর ভাব বা সমাধি নিরূপিত হইতেছে, কালীমূর্ত্তি তাহার দৃষ্টান্তবিশেষ। বাউল প্রভৃতি অন্যান্য মতে যখন মহাকারণে পরমাত্মা লইয়া কথা, তখন তাহাদের স্থূলভাবের তারতম্য থাকিলেও প্রাচীন মতের সহিত অনৈক্য হইতেছে না।

দ্বিতীয় মতে, নিত্য লীলা বা সেব্য সেবক ভাবের কার্য্য হইয়া থাকে। এ ভাবে জীবাত্মা এবং পরমাত্মার একীকরণ করিতে ভক্তের ইচ্ছা হয় না। ভাববিশেষের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক ঈশ্বর ও জীব এই অবস্থায় থাকিয়া লীলা-রসামৃত পান করিয়া থাকে। জীব এবং ঈশ্বর এই ভাবে যদিও দ্বৈতজ্ঞানের কার্য্য হয়, কিন্তু প্রত্যক্ষ দর্শনের সময়ে, সাধকের আর নিজের অস্তিত্ব বোধ থাকিতে পারে না। তাহার মন প্রাণ সেই মূর্ত্তিতে এককালে সংলগ্ন হইয়া যায়। এই অবস্থাটীর সহিত পূর্ব্বোল্লিখিত অবস্থার সাদৃশ্য আছে।

পরমহংসদেব এই প্রকার বিবিধ ধর্ম্মের আদি কারণ বহির্গত করিয়াও নিশ্চিন্ত হইলেন না। তাঁহার প্রাণ যারপরনাই উৎসাহিত হইলে তিনি শিখধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। তদনন্তর তিনি অন্যান্য ক্ষুদ্র ও বিবিধ সম্প্রদায়-ভুক্ত হইয়াছিলেন, তৎসমুদয় আমরা বিশেষ অবগত নহি। হিন্দুমত সামঞ্জস্য করিয়া তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, হিন্দু মুসলমানের প্রভেদ কি? ক্রমে ভাবময়ের এই নব ভাবতরঙ্গ উথলিয়া উঠিল। তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে অমনি তিনি মাতার নিকট মনোভাব নিবেদন করিলেন। করুণাময়ীর অপার করুণা! অকপট ভক্তের মনোরথ কিরূপে পূর্ণ করিতে হয়, দয়াময়ী মা বিনা আর কে জানিবেন? ভক্তের বাসনা মা আপনি প্রেরণ করেন এবং আপনি তাহা পূর্ণ করিবার ব্যবস্থাও করিয়া দেন। পরমহংসদেবের জীবন তাহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত।

পরমহংসদেবের বালকবৎ প্রার্থনা যেমন মাতার শ্রবণবিবরে প্রবিষ্ট হইল, অমনি তিনি সে প্রার্থনা অচিরাৎ পরিপূর্ণ করিয়া দিলেন।

গোবিন্দ দাস নামক এক ব্যক্তি, জাতিতে কৈবর্ত্ত, দমদমার সন্নিকটে গুপ্তভাবে মহম্মদীয় ধর্ম্মমতে সাধন ভজন করিতেছিলেন। তিনি এই সময়ে পরমহংসদেবের নিকটে আগমন পূর্ব্বক মুসলমানধর্ম্মের দীক্ষা দিয়া তিন দিন যথানিয়মে তাঁহাকে কার্য্য করাইলেন। তিন দিনের পর তাঁহার সে ভাব অপনীত হইয়া গেল। এই দিনত্রয় তিনি কালীর মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই, কালীর প্রসাদ ভক্ষণ করেন নাই এবং তাঁহার ভিতরের হিন্দুভাব পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছিল।

মুসলমানধর্ম্ম সাধন করিয়া তিনি হিন্দুদিগের জ্ঞান এবং ভক্তিমতের সহিত তাহা মিলাইয়া পাইয়াছিলেন। হিন্দুদিগের যে প্রকার সাধনপ্রণালীর অভিপ্রায়, মহম্মদীয়ধর্ম্মে তিনি তদ্রূপ দেখিয়াছিলেন। মহম্মদ বলিয়াছিলেন যে, যে কেহ কাফেরদিগকে সংহার করিতে পারিবে, সে পরকালে কজ্জলনয়না অপ্সরার সহিত সুখে বাস করিবে। কাফের অর্থে তিনি রিপুদিগকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কারণ, শরীরের মধ্যে রিপুগণই কাফের বা বিজাতীয় ধর্ম্মাবলম্বী, তাহাদের বিনাশ করিলে বা রিপুগণ প্রদমিত হইলে, বিদ্যাশক্তির প্রকাশ পায়। বিদ্যার সহবাস ব্যতীত মনুষ্যের সুখস্বচ্ছন্দতা লাভের দ্বিতীয় উপায় কোথায়?

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ধর্ম্মবীর পরমহংসদেব যদিও মুসলমানদিগের ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত হইলেন, তথাপি তাঁহার হৃদয় নিশ্চিন্ত হইল না। তাঁহার হৃদয়ে এখনও ক্ষুধা নিহিত ছিল। তিনি একদিন দেবমন্দিরের সন্নিহিত যদুলাল মল্লিকের উদ্যানস্থিত বাটীর কোন গৃহে দণ্ডায়মান ছিলেন। সেই স্থানে মেরীর ক্রোড়ে শায়িত বালক যীশুর চিত্রপট ছিল। পরমহংসদেব তাহা জানিতেন না। কিয়ৎকাল পরে তাঁহার মন হইতে পূর্ব্বের ভাব এককালে বহির্গত হইয়া যাইল। তিনি

তদ্দৃষ্টে চিন্তাযুক্ত হইলেন এবং "মা! মা!" বলিয়া ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। পরে যীশুর প্রতিরূপের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিলেন যে, যীশুর চিত্রপট হইতে জ্যোতিঃ আসিয়া তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিতেছে। তিনি তদনন্তর স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। অন্যান্য সাধনের ন্যায় যীশুর ভাব তাঁহার তিন দিবস ছিল। তিনি গৃহে বসিয়া বড় বড় গির্জ্জে দেখিতে ও পাদ্রীদিগের উপদেশ শুনিতে পাইতেন। এ কয়েক দিন তাঁহার মুখে কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম কিছুই নির্গত হয় নাই, অথবা তাঁহাদের কথা মনেও উদিত হয় নাই। অতঃপর তিনি একখানি যীশুর চিত্রপট আনিয়া গৃহে রাখিয়াছিলেন। উক্ত ছবিখানি অদ্যাপি দক্ষিণেশ্বরে আছে। এই ছবিখানিতে যীশু এই ভাবে চিত্রিত আছেন। কোন সমুদ্রতীরে তিনি ভ্রমণ করিতেছিলেন। এমন সময়ে একটী বৃদ্ধ আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "প্রভু! ঈশ্বরকে পাইব কিরূপে?" যীশু এই কথার কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া তাহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক সমুদ্রসলিলে কিয়দ্দূর প্রবেশ করিলেন। বৃদ্ধ অবাক্ হইয়া পরিণাম চিন্তা করিতে লাগিল। ইত্যবসরে যীশু বৃদ্ধের গ্রীবা ধারণ পূর্ব্বক জলে নিমজ্জিত করিয়া কিয়ৎকাল পরে ছাড়িয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার প্রাণের এখন অবস্থা কিরূপ?" বৃদ্ধ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে সভয়ে কহিল, "প্রাণ যায়!" যীশু কহিলেন, "ঈশ্বরের বিরহে যখন এইরূপ প্রাণের অবস্থা হইবে, তখনই তাঁহাকে লাভ করিবে।" পরমহংসদেব একথা প্রথমেই প্রাণে প্রাণে নিজে জানিয়াছিলেন এবং সেইরূপ সাধনাও করিয়াছিলেন। প্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনেও অবিকল ঐ প্রকার ভাব লক্ষিত হইয়াছে। তিনি বিরহে কেশোৎপাটন ও মুখঘর্ষণ করিতেন। তাঁহার সমাধিকালীন প্রাণের এইরূপ অবস্থার কথা স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে! এই সকল কারণে যীশুর মতও মহাকারণে এক বলিয়া মিলাইয়া লইলেন।

পরমহংসদেব বহু আড়ম্বর ভালবাসিতেন না। এক কথায় তাঁহার কার্য্য মিটাইয়া লইতেন। তিনি বলিতেন, "আপনাকে মারিতে হইলে একটী আল্‌পিন্ কিম্বা একটী বেলকাঁটা লইলেই যথেষ্ট হইবে; কিন্তু অপরকে সংহার করিতে হইলে বড় অস্ত্রের প্রয়োজন। সেইরূপ তত্ত্বকথা নিজের জানিতে ইচ্ছা হইলে এক কথায় জানা যায়। অধিক আড়ম্বর নিষ্প্রয়োজন; কিন্তু অপরকে বুঝাইতে হইলে বহু শাস্ত্রীয় যুক্তির আবশ্যক।" তিনি সেইজন্য আরও বলিতেন, "একজ্ঞান জ্ঞান, বহুজ্ঞান অজ্ঞান।" পরমহংসদেবের এবম্প্রকার জ্ঞান আপনি

হৃদয়ে সমুদিত হইয়াছিল এবং ইহার পোষকার্থ তিনি একটী দৃষ্টান্তও পাইয়াছিলেন। একদা একটী সাধু আসিয়াছিলেন। ঠাকুর কিম্বা অন্য কোনও বস্তু তাঁহার ছিল না। পূজাকালীন তাঁহার ঝুলির ভিতর হইতে একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ বাহির করিয়া পূজা করিতেন। পরমহংসদেব ঐ গ্রন্থখানি দেখিয়া নাম জিজ্ঞাসা করায় সাধু উহা রামায়ণ বলিয়া পরিচয় দিলেন। পরমহংসদেবের মনে বিশ্বাস হইল না। তিনি জোর করিয়া গ্রন্থখানি খুলিয়া দেখিলেন যে, উহার প্রথম পাতে বৃহৎ অক্ষরে 'রাম' শব্দটী লেখা আছে। তিনি তৎক্ষণাৎ ভাব বুঝিলেন এবং মহাভাবে নিমগ্ন হইয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন।

যীশুর সাধনান্তে তাঁহার সকল সাধনই একপ্রকার শেষ হইয়া আসিল। তিনি বৌদ্ধমতে সাধন করিয়াছিলেন কি না, তাহা আমরা শ্রবণ করি নাই, তাঁহার গৃহে প্রস্তরের একটী বুদ্ধ মূর্ত্তি দেখিয়াছি। ইতিপূর্ব্বে পূজা তর্পণাদি সমুদয় বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। তিনি সময়ে সময়ে সমস্ত দিন পুষ্প চয়ন করিয়া কালীর পূজা করিতেন। একদিন দেখিলেন যে, যাঁহার জন্য পুষ্প সংগ্রহ করা হয়, তাঁহারই শরীর এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। বৃক্ষ সকল ফলফুলে তাঁহার অঙ্গের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। তিনি এই দেখিয়া আপনি হাসিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, "প্রসাদি ফুলে কি ক'রে, পূজা করিব।" তদবধি তাঁহার পূজা করা বন্ধ হইয়া গেল।

পরমহংসদেব সাধন কার্য্য হইতে অবসর পাইয়া যখন যেমন অবস্থায় পতিত হইতেন, তখন তিনি সেই ভাবে আনন্দ করিতেন। তিনি কখন সাধুদিগের সহিত সদালাপে সময়াতিবাহিত করিতেন এবং কখন বা হরিনামামৃত পান করিয়া তাহাতেই বিহ্বল হইতেন এবং হুঙ্কার প্রদানপূর্ব্বক নৃত্য করিতে করিতে মহাভাবে নিমগ্ন হইয়া যাইতেন। কখন বা দেবীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া চামরব্যজন এবং করতালি দিয়া শক্তিবিষয়ক গান করিতেন। কখন বা রাধাকৃষ্ণের সম্মুখে গমন পূর্ব্বক তাঁহাদের যুগল রসের রসিক হইয়া রস পান করিতেন। কখন বা 'জয় শিব!' 'জয় শিব!' বলিয়া সমাধিস্থ হইয়া বসিয়া থাকিতেন। কখন বা 'কোথায় রাম রঘুবীর!' বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতেন এবং কখন বা স্বর গ্রামের আরোহণ এবং অবরোহণ হিসাবে 'রাম রাম রাম' বলিয়া মাতিয়া উঠিতেন এবং সময়ান্তরে হনুমানের দাস্যভাবের আশ্রয় লইয়া ভাবোন্মত্ত হইয়া পড়িতেন। কখন বা বৃন্দাবনের নন্দকিশোর ও রাইকিশোরীর কৈশোরিক ভাবালোকন পূর্ব্বক প্রেমানন্দে ভাসিয়া যাইতেন। কখন বা বেদান্ত-সূত্রের

সূত্র ধরিয়া নিরাকার অদ্বিতীয় ব্রহ্মে মিলিত হইয়া জড় সমাধি প্রাপ্ত হইতেন। কখন বা ঘোষপাড়া, বাউল, নবরসিক ও পঞ্চনামী প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক উপাসকদিগের সহিত আলেখ, সহজ ও রূপসাগর সম্বন্ধীয় গীত গান করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতেন। কখন বা 'ব্রহ্মময় জগৎ' জ্ঞানে বড় ছোট, ভদ্র অভদ্র, ধনী নির্ধনী, বালক বৃদ্ধ, স্ত্রী পুরুষ সকলকেই প্রণাম করিতেন। কখন বা পিপীলিকাদিগকে চিনি প্রদান করিয়া বেড়াইতেন, কখন বা দুর্ব্বাদলোপরি পাদনিক্ষেপ করিয়া আপনাকে আপনি তিরস্কার করিতেন এবং উহারা পদদলিত হইয়া অশেষ ক্লেশ পাইয়াছে, হয় ত কাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চূর্ণ হইয়া গিয়াছে মনে করিয়া রোদন করিতেন এবং অপরাধের নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন। কখন বা উদ্ভিদগণের মধ্যে চৈতন্য বিরাজিত আছেন বলিয়া এত প্রবল ভাবোদয় হইত যে, তিনি একটী পুষ্প কিম্বা পাতা ছিঁড়িতে পারিতেন না এবং কাহাকেও তাহা করিতে দেখিলে, তিনি অতিশয় কাতর হইতেন। তিনি সর্ব্বদা পণ্ডিতদিগের সহিত সহবাস করিতেন এবং তাঁহাদের নিকট শাস্ত্রাদি শ্রবণ করিয়া দিন যাপন করিতেন। তিনি কখন যাত্রা, কখন চণ্ডীর গীত এবং কখন বা কীর্ত্তন শ্রবণ করিতেন। এই গীতাদি শ্রবণ করিবার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় হইত, মথুর বাবু সে সকল আনন্দের সহিত বহন করিতেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, পরমহংসদেবের বিবাহের পর আর তাঁহার স্ত্রীর মুখাবলোকন করিতে অবসর প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহার স্ত্রী যখন ষোড়শ বর্ষে উপনীত হন, সেই সময় তাঁহার শ্বশুরালয়ে গমন করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। তাঁহার মনের প্রকৃত ভাব মথুর বাবুকে জানাইয়াছিলেন। তিনি সে সকল কথা শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্য হইয়া পড়েন। তন্ত্রমতে নাকি ষোড়শী পূজার বিধি আছে। তিনি তাঁহার স্ত্রীতে সেই কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। মথুর বাবু চেলীর শাড়ী, শঙ্খ এবং অলঙ্কারাদি পূজার ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাকে দেশে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। পরমহংসদেব তাঁহার নিজ বাটীতে না যাইয়া

একেবারে শ্বশুরালয়ে গমন করেন। তথায় পৌঁছিয়া তিনি বাটীর বহির্ভাগে অবস্থিতি না করিয়া অন্তঃপুরের প্রাঙ্গণে যাইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার স্ত্রী তখন ঐ স্থানে কোন কার্য্যে নিযুক্তা ছিলেন। সহসা একজন অপরিচিত ব্যক্তি উন্মাদের ন্যায় একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি জননীকে ডাকিয়া বলিলেন, "মা! দেখ দেখ কে একজন পাগল এসেছে।" তাঁহার জননী গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। প্রথমে তাঁহার চক্ষু আগন্তুক ব্যক্তিকে চিনিতে পারিল না, কিন্তু প্রাণ হুহু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। যেন বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া পাগলকে ক্রোড়ে লইতে মন ধাবিত হইল এবং তাঁহাকে সহস্র চুম্বন করিয়াও যেন প্রাণে তৃপ্তি মানিল না। তাঁহার সহসা চিত্তবিকার ও প্রাণ উচাটন হওয়ায় তিনি ভাবিলেন, এ পাগল কে? কাহার পাগল? অমনি তিনি চিনিলেন, অমনি বৎসহারা গাভীর ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া "বাবা রে! এই কি আমার অদৃষ্টে ছিল" বলিয়া, পরমহংসদেবের সম্মুখে আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেলেন। তাঁহার তনয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। তখন কে যে পাগল, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না।

পরমহংসদেবের স্ত্রী এতক্ষণে তাঁহার অমূল্য রত্ন চিনিলেন। তখন লজ্জা-দেবী তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া পূর্ণরূপে সেই বদনকান্তি নিরীক্ষণ করিতে দিল না। তিনি অবগুণ্ঠিতভাবে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

অতঃপর পরমহংসদেব তাঁহার অভিমত পূজাদি যথানিয়মে সম্পন্ন করিবার সমুদায় আয়োজন করিয়া লইলেন। পূজার সময় তাঁহার স্ত্রীকে আলূপনা দেওয়া পীঁড়ার উপরিভাগে দণ্ডায়মান হইতে বলিলেন। তিনি দ্বিরুক্তি করিলেন না। পরমহংসদেব তাঁহার চরণদ্বয়ে ফুল বিল্বপত্রাদি সহ পূজা করিলেন এবং জপ করিবার যে মালা ছিল, তাহাও চিরদিনের মত অঞ্জলি প্রদান করিলেন। তদবধি তাঁহার জপ তপ ফুরাইয়া গিয়াছিল।

পরমহংসদেবের অভিপ্রায় কেহই বুঝিতে পারিল না। তাঁহার শাশুড়ী ইহাতে ক্রোধান্বিতা হইয়া তাঁহাকে কত কি কটুকাটব্য বলিয়াছিলেন। তাঁহার অপরাধ কি? মায়িক সম্বন্ধ অতি বিভীষিকাপ্রদ, তাহা অন্যথা হইবার নহে। তিনি না জানাইলে কি প্রকারে জানিবেন যে, সাক্ষাৎ শিব তাঁহার জামাতা? তাঁহার সৌভাগ্য এত উচ্চ, তাহা কেমন করিয়া তিনি বিশ্বাস করিবেন? যাহা মনুষ্যের ভাগ্যে যুগযুগান্তরেও কখন কেহ সংঘটিত হইতে দেখে নাই, তাহা তত্ত্বজ্ঞানবিরহিত মায়িক ভাবপ্রধান স্ত্রীলোকের হৃদয়ে

কেমন করিয়া স্থান পাইবে? বিবাহের পর যদিও তিনি সর্ব্বদা শুনিতেন যে, তাঁহার রামকৃষ্ণ বাতুলপ্রায় হইয়া কখন্ কি করেন, কখন্ কি বলেন, কখন ঠাকুর পূজা করেন এবং কখন আপনি ঠাকুর হইয়া বসেন। যদিও তিনি জানিতেন যে, রামকৃষ্ণের আর পূর্ব্ববৎ জ্ঞান কিছুই নাই, তিনি আপন পর বিচার করিয়া কার্য্য করেন না, স্বদেশের কিম্বা স্ব-সম্পর্কীয় কাহার সহিত সম্বন্ধ রাখেন না এবং কেহ নিকটে যাইলে শিষ্টাচারের অনুরোধ রক্ষাও করেন না। যদিও তিনি বিলক্ষণরূপে অবগত ছিলেন যে, যে বস্তু লইয়া জগৎ সংসার, যাহার ছায়া অবলম্বনপূর্ব্বক ব্যক্তিগণ দেশ বিদেশ গমন করিয়া মস্তকের ঘর্ম্ম ভূমিতে নিক্ষেপণ দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করে, যাহার ভ্রুকুটিভঙ্গের আতঙ্কে কষ্ট সঞ্চিত অর্থের সাহায্যে তাহারা তাহার প্রিয়কর দ্রব্য যথাসাধ্য সংগ্রহ করিয়া থাকে, যাহার অন্ততঃ দুটা মৌখিক সুধামাখা কথা শ্রবণ করিয়া শ্রবণবিবর ধন্য করিবার জন্য তাহারা তদুপযুক্ত প্রস্তুত হইয়া থাকে, যাহার দীর্ঘ প্রবাস জনিত হতাশ হুতাশনে তাহাদের হৃদয় ক্ষণে ক্ষণে প্রজ্বলিত হইলে তাহারা আশারূপ ভস্মাচ্ছাদন দ্বারা সদাই সন্তপ্ত করিয়া রাখে, সেই উত্তাপ নিবারণের নিমিত্ত তাহারা জলাধিপতির শরণাপন্ন হইয়া অবিরল নেত্রজল বরিষণ করিয়া থাকে; তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, যদি কখন তিনি দেশে আসেন ও এবম্বিধা স্ত্রীর মুখাবলোকন করেন, তাহা হইলে তাঁহার আশা মিটিবে। কিন্তু বিধির বিধি বিপরিত হইয়া গেল। স্ত্রীকে স্ত্রী বলিয়া ত তিনি স্বীকার করিলেন না! তাঁহাকে মাতৃস্থানে উপবেশন করাইয়া পূজা করিয়া ফেলিলেন! কন্যার এরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া মার প্রাণ কি দিয়া প্রবোধ মানিবে? তিনি তনয়ার সর্ব্বনাশ দেখিয়া দশদিক্ শূন্যময় দেখিলেন। জামাতার সম্মুখে কন্যা উপবিষ্টা রহিয়াছে, জামাতার সহিত কন্যার বাক্যালাপ হইতেছে, তথাপি জামাতা-কন্যায় সম্বন্ধ নাই, একথা কে বুঝিবে এবং কেই বা বুঝাইয়া দিবে? সুতরাং তাঁহার দুঃখ সঙ্গের সঙ্গিনী হইয়া রহিল। পরমহংসদেব দ্বিরুক্তি করিলেন না।

পরমহংসদেবের স্ত্রীর মনের ভাব বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। তিনি ষোড়শবর্ষে পতিত হইলে কি হইবে, তাঁহার তখনও পর্য্যন্ত কুমারীভাব ছিল। পতি কাহাকে বলে, তাহা তাঁহার সে পর্য্যন্ত জ্ঞান হয় নাই, তন্নিমিত্ত এ ক্ষেত্রে তিনি ভালমন্দ কিছুই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তিনি ত সামান্যা স্ত্রী নহেন! যাঁহার পতি সহস্র সহস্র অনাথ অনাথিনীর পতি, যাঁহার পতি অশেষ পাতকের পতিতপাবনস্বরূপ, যাঁহার পতি ব্রহ্মাণ্ডপতির হৃদয়মণি,

তাঁহার পত্নী কি সাধারণ ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র পশুপ্রকৃতিবিশিষ্ট হইতে পারেন? শাস্ত্রে বলে, পুত্রের জন্য স্ত্রী পুরুষের প্রয়োজন। মা গো! তুমি যে সহস্র সহস্র পুত্র কন্যার জননী! তোমাকে কি মা কুক্কুর শৃগালের অবস্থায় পতিত হইয়া মা হইতে হইবে? তখন মাতা হয় ত তাহা বুঝিতে না পারিয়া থাকিবেন; কিন্তু তাঁহার মনে কিম্বা প্রাণে পতির আভাস জনিত কিছুমাত্র ভাবান্তর হয় নাই। তদনন্তর পরমহংসদেব পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

সাধন ভজন একপ্রকার সমাপন করিয়া পরমহংসদেব (তাঁহার এ নামটী আর পরিবর্ত্তিত হয় নাই) কিছুদিন মথুর বাবুর সহিত আনন্দে দিন যাপন করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই ঈশ্বরের শক্তি ও তাঁহার অলৌকিক কার্য্য সম্বন্ধে নানাপ্রকার উপদেশ দিতেন। একদিন কথায় কথায় মথুর বাবু কহিলেন যে, "বাবা! ঈশ্বরের সকলই অলৌকিক, তাঁহার বিরুদ্ধে কে কথা কহিতে পারে? কিন্তু তিনি যাহা একবার করিয়াছেন, তাহা আর পরিবর্ত্তন করিতে পারেন না। যেমন মনুষ্য সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত সে নিয়মের আর পরিবর্ত্তন হইল না। এই দেখুন জবা ফুল। যে গাছে লাল ফুল হয়, তাহাতে লাল ব্যতীত সাদা ফুল কখনই হইতে পারে না।" পরমহংসদেব বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তোমাদের এমন স্থূল বুদ্ধি না হইলেই বা এত দুর্দ্দশা ঘটিবে কেন? যে ঈশ্বরের অপার মহিমা, অনন্ত শক্তি, যাঁহার কার্য্যের গভীরতা স্থির করিতে মনুষ্যবুদ্ধি একেবারে অপারক হইয়া গিয়াছে, তাঁহার শক্তি লইয়া বিচার করিতে যাওয়া যারপরনাই নির্ব্বোধের কর্ম্ম। বল দেখি, সমুদ্রে কত জল ও তাহার ভিতরে কি আছে এবং কি নাই?" এই প্রকার বিচারে মথুর বাবুর বিশেষ কোন দোষ হয় নাই। যদিও তখন থেকেই এ প্রদেশে ঊনবিংশ শতাব্দির ঢেউ লাগিতে আরম্ভ হইয়াছিল, যদিও তখন থেকেই পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক শিক্ষার ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছিল, তথাপি তখনও এ প্রদেশে প্রাচীন কুসংস্কার ঈশ্বরে বিশ্বাস করা, একেবারে বিলুপ্ত

হইয়া যায় নাই'। যদিও তখন থেকেই লোকেরা জড়বিজ্ঞানের আলোক পাইয়া স্থূলের স্থূল-কার্য্য-কলাপ অবলোকন করিয়া চমৎকৃত হইয়াছিল, তথাপি তেত্রিশ কোটী দেবদেবীর প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি সমূহরূপে ছিল; সেই জন্য মথুর বাবু পরমহংসদেবের কথায় আর প্রত্যুত্তর দিতে পারিলেন না। পরমহংসদেব যে কথা মথুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যুত্তর দেওয়া মথুরের বিদ্যা বুদ্ধিতে তখন সংকুলান হয় নাই বটে, কিন্তু ঐ প্রশ্ন যদ্যপি অন্য একজন প্রকৃত ইংরাজীবিজ্ঞানবিদ্ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা যায়, তিনিও মাথা চুলকাইয়া একজন মূর্খের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিবেন, তাহার সন্দেহ নাই।

পরদিন প্রাতঃকালে পরমহংসদেব গঙ্গাতীরে পাদচারণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন যে, একটী লাল জবা ফুলের গাছে এক বোঁটায় একটী লাল আর একটী সাদা ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ মথুর বাবুকে ডাকাইয়া দেখাইলেন এবং বলিলেন, "ঈশ্বর যাহা মনে করেন, তাহাই করিতে পারেন, এই জন্যই তিনি ঈশ্বর। মনুষ্যেরা আপনার ওজনে ঈশ্বরকে দেখিতে চায়, আপনার শক্তির দৌড় হিসাব করিয়া ঈশ্বরের শক্তির ইতর বিশেষ করিয়া থাকে। তুমি কখন তাঁহার শক্তির প্রতি তিলার্দ্ধ সন্দেহ করিও না, বা কার্য্য দেখিয়া কারণ নিরূপণ করিতে অগ্রসর হইও না।" মথুর বাবু অবাক্ হইয়া রহিলেন। কিন্তু ধন্য পাশ্চাত্য শিক্ষা! ধন্য ইংরাজ বাহাদুর! ধন্য তোমাদের ইংরাজী শিক্ষার ফল! চক্ষে দেখিলে, কর্ণে শুনিলে, হস্তে স্পর্শ করিলে, যে বস্তু তোমরা দেখ নাই, তাহা আমাদের ধর্ম্মসম্বলিত বা সাধু মহাত্মা কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হইলে, কোন মতে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে নাই বলিয়া যে গুরুমন্ত্র প্রদান করিয়াছ, তাহার অধিকার অতিক্রম করিয়া যাইবে কে? মথুর বাবু কিয়ৎকাল চুপ করিয়া রহিলেন। পরে তাঁহার মনে হইল, হয়ত পরমহংসদেব দুইটী ফুল এক বোঁটায় কোন কৌশলে সংলগ্ন করিয়া দিয়া একটা বুজরুকী দেখাইতেছেন। তিনি এই কথা মনে করিয়া তন্ন তন্ন পূর্ব্বক উহা পরীক্ষা করিয়া লইলেন। তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি পরাজিত হইল। তখন কোনদিকে পলাইতে না পারিয়া বলিলেন, "বাবা! ঈশ্বরের মহিমা কি এ তোমারই মহিমা!" *

একদিন জানবাজারের বাটীতে পরমহংসদেব, মথুর বাবু এবং তাঁহার

* মথুর বাবুর এ কথা বলিবার বিশেষ ভাব ছিল। তিনি নাকি ইতিপূর্ব্বে পরমহংস-দেবকে তাঁহার ইষ্টমূর্ত্তিরূপে দর্শন করিয়াছিলেন।

স্ত্রী একত্রে উপবেশন করিয়া আছেন, এমন সময়ে তীর্থাদি সম্বন্ধে কথোপকথন আরম্ভ হইল। নানাবিধ মতামতের দ্বারা তীর্থযাত্রা ভাল কিম্বা মন্দ বিচার হইবার পর মথুর বাবুর স্ত্রী কাশী বৃন্দাবনাদি ভ্রমণ করিবার জন্য মনের সাধ ব্যক্ত করিলেন। মথুর বাবু তাহাতে অসম্মত হইয়া বলিলেন যে, "অনর্থক অর্থ ব্যয় এবং শারীরিক ক্লেশ ইচ্ছা করিয়া ডাকিয়া আনিবার প্রয়োজন কি? ঠাকুর সম্মুখে রহিয়াছেন, আবার ঠাকুর দেখিবে কি?" পরমহংসদেব এ কথার প্রতিবাদ করিয়া পূর্ব্বপ্রচলিত প্রথা কাহারও রহিত করিবার অধিকার নাই বলিয়া মথুর বাবুর স্ত্রীর মত সমর্থন করিলেন। মথুর বাবুর স্ত্রীর আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি তীর্থে গমন করিবেন বলিয়া তখনি সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিলেন। মথুর বাবু কহিলেন, "যদ্যপি বাবা গমন করেন, তাহা হইলে আমি যাইব, নতুবা তোমাকে একাকী যাইতে হইবে।" পরমহংসদেব তাহা স্বীকার করিলেন।

অতঃপর শুভদিনে শুভক্ষণে মথুর বাবু সস্ত্রীক পরমহংসদেবের সহিত অতি সমারোহে তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইলেন। তিনি পরমহংসদেবের সেবার নিমিত্ত পূর্ব্বোল্লিখিত হৃদয়কে সমভিব্যাহারে রাখিয়াছিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

কাশীধামে উপস্থিত হইয়া পরমহংসদেব কাশীনাথ ও অন্নপূর্ণা দর্শন করিলেন। দর্শন কথাটী প্রয়োগ হইল বটে, কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে দেবদেবী দর্শন করা প্রায় ঘটিয়া উঠিত না। কখন ঠাকুরের নাম শ্রবণ করিয়াই তাঁহার ভাবাবেশ হইয়া যাইত, তখন ধরাধরি করিয়া তাঁহার জড়বৎ দেহটীকে লইয়া গিয়া ঠাকুরের সমক্ষে সংস্থাপিত করা হইত। কখন বা মন্দিরের নিকট পৌঁছিবামাত্র আপনাকে আপনি হারাইয়া ফেলিতেন এবং কখন বা ঠাকুরের নিকট পর্য্যন্ত যাইতে পারিতেন। ফলে, সাধারণ লোকেরা যে প্রকারে প্রাণ ভরিয়া ঠাকুর দর্শন করে, সে প্রকার দর্শন পরমহংসদেবের কখনই ভাল করিয়া ঘটে নাই। তথাপি ঠাকুর দর্শন করিবার আড়ম্বর পূর্ণ মাত্রায় হইত। তিনি কি দেখিতেন, কি বুঝিতেন এবং তাঁহার প্রাণেই বা কি হইত, অথবা বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া অন্তর্দৃষ্টিতে কি

দেখিতেন, তাহা আমরা স্থূলদ্রষ্টা কি করিয়া অনুমান করিতে পারিব? কাশীর লোকেরাও আশ্চর্য্য মানিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ক্ষণে ক্ষণে মানুষটী অচেতন হইতেছেন এবং ক্ষণে ক্ষণে আবার বীরভাবে আনন্দ-সূচক গান করিতেছেন, সাধুর ন্যায় পরিচ্ছদাদি * নাই, কোন সাম্প্রদায়িক লক্ষণ দ্বারাও লক্ষিত নহেন এবং সঙ্গে একজন বিশেষ ধনী ব্যক্তি, এমন ব্যক্তি কে? ইত্যাকার নানাবিধ লোকে নানাবিধ তর্ক বিতর্ক করিত। তাহারা কাশীবাসী, বিশ্বেশ্বরের রাজ্যে বাস করে বটে, কিন্তু সেকাল আর নাই। কালপ্রভাবে কাশীর লোকেরাও সাধু চিনিল না। চিনিবে কি? স্থূল দৃষ্টি হ'লো কালধর্ম্ম। কাশীতে দেখে কেবল দণ্ডী আর মাথা ন্যাড়া পরমহংস। শোনে কেবল দর্শন শাস্ত্রের বাক্‌বিতণ্ডা, আত্মগরিমা এবং কর্ম্মকাণ্ডের মোটা মোটা কথাগুলি। তাহাদের অন্তর্দৃষ্টি নাই—চিনিবে কিরূপে? পাণ্ডারাও তদ্রূপ। তাঁহাদের কথা গণনার বহির্ভূত। বিশ্বনাথ যাঁহাদের ব্যবসা, তাঁহাদের কথা কাহার সহিত তুলনা হইতে পারে না। পরমহংস-দেবের কাশী যাত্রায় কোন ব্যক্তির তত্ত্বপক্ষের কোনরূপ সুবিধা হয় নাই, কিন্তু তাঁহার দ্বারা অর্থঘটিত বিশেষ উপকার অনেকেরই হইয়াছিল। মথুর বাবু, যেমন ধনী লোকের নিয়ম, তথাকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে কিছু দান করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে পর, তাহা কিরূপে প্রদান করিতে হইবে, পরমহংসদেব ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। প্রত্যেক পরিবারের বালক বালিকা, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, যুবক যুবতী, যতগুলি পরিজন ছিল, গণনা করিয়া প্রত্যেককে এক টাকার হিসাবে প্রদান করিতে বলিয়াছিলেন। মথুর বাবু তাহাতে দ্বিরুক্তি করেন নাই। তদনন্তর তিনি ত্রৈলঙ্গস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিশেষ সুখী হইয়া কাশী হইতে বৃন্দাবনে গমন করেন। এ স্থানে পৌঁছিয়া তিনি দেবাদি দর্শন করণান্তর স্থানবিশেষে বিশেষপ্রকার পূজাদি দেওয়াইয়া বন-পরিক্রম সমাধা করেন। এই স্থানে তিনি গুপ্তভাবে বৈষ্ণবমতে ভেক ধারণ করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনে যাইয়াও তিনি কাশীর ন্যায় বিফল

* পরমহংসদেবকে কখন সাধুর বেশভূষায় লোকসমাজে অথবা তাঁহার বাসস্থানে দেখিতে পাওয়া যাইত না। যখন তিনি যে যে সাধন করিয়াছিলেন, তখন সেই সেই পন্থানুরূপ বেশ-ভূষা করিতেন, তাহার পর আর সে সকল পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেন না। তিনি অধিক দিন একখানি মোটা চাদর গায়ে দিয়াই কাটাইয়াছিলেন, পরে বস্ত্র পরিধান করিতেন মাত্র। সর্ব্বশেষে ভক্তদিগের কথায় পিরাণাদিও ব্যবহার করিয়াছিলেন।

মনোরথ হইয়াছিলেন। তথায় প্রকৃত ঈশরানুরাগী একটী ব্যক্তিরও সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হন নাই। পরমহংসদেব একদিন আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "বৃন্দাবনে আসিয়া কি করিলাম? সেখানে (দক্ষিণেশ্বরে) যেমন তেঁতুল গাছটী, এখানকার তেঁতুল গাছও তেমন, সেখানকার পক্ষীগুলি যেমন, এখানকার পক্ষীরাও তেমন, সেখানকার রাধাকৃষ্ণ যেমন, এখানকার রাধাকৃষ্ণও তেমন, সেখানকার মানুষগুলো যেমন, এখানকার মানুষগুলোও তেমন। তবে কি জন্য এত দূর আসিলাম?"

পরমহংসদেব বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন যে, বৃন্দাবনে যাইয়া শাস্ত্রোক্ত বৃন্দাবন দেখিবেন, সেই গোপগোপীর নিষ্কাম প্রেমতরঙ্গের রঙ্গ দেখিবেন; এখন যে, সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় চিনেবাজারের দোকানদার হইয়া পড়িয়াছে, তাহা তিনি যেন জানিয়াও জানেন নাই। যে বৃন্দাবনে নিষ্কাম ধর্ম্মের খেলা, আজ সেই বৃন্দাবনে সকাম ব্রতের জীবন্তস্রোত প্রবাহিত হইতেছে! মুখে রাধাকৃষ্ণ, হৃদয় কপটতায় পরিপূর্ণ! শ্রীবৃন্দাবনের এইরূপ দশা দেখিয়াই পরমহংসদেব আক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে কেহই চিনিতে পারিল না। কিন্তু বৃন্দাবন বাস্তবিক শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়াস্থল, প্রেমময়ী রাধা যে স্থানের অধীশ্বরী, তথায় যে প্রেমিক প্রেমিকা একেবারে পরিশূন্য হইবে, তাহা কদাপি হইবার নহে। যেমন এক ত্রৈলঙ্গস্বামী কাশীর মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন, তেমনি বৃন্দাবনেও পরমহংসদেবের সহিত অচিরাৎ এক অপূর্ব্ব সম্মিলন হইয়াছিল। বৃন্দাবন প্রকৃতিগত প্রকৃতিবিশেষ,সে স্থানে পুরুষ কি প্রকারে প্রকৃতিভাব লাভ করিবে? ওষ্ঠলোম ফেলিয়া বামারূপ ধরিলেই কি প্রকৃতি হইতে পারে? এই নিমিত্ত প্রকৃতিবেশধারী প্রকৃতিবিশিষ্ট বৃন্দাবনবাসীদিগের সহবাসে পরমহংসদেব সুখী হইতে পারেন নাই। অতঃপর তিনি একদিন নিধুবনে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন, তথায় গঙ্গামাতা নাম্নী এক অতি প্রাচীনার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়; পরমহংসদেবকে দর্শন করিবামাত্র গঙ্গামাতার আনন্দসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। তিনি "আরে! দুলালী! * দুলালী!" বলিয়া প্রেমালিঙ্গন করিলেন।

পরমহংসদেব তখন বাহ্যচৈতন্য হারাইয়াছিলেন। গঙ্গামাতার অপূর্ব্ব ভাবাবেশ দর্শন পূর্ব্বক আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন। তাঁহার নয়নযুগল হইতে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল এবং মধ্যে মধ্যে দুলালী বলিয়া উঠিতে

* শ্রীমতির নামবিশেষ।

লাগিলেন। বোধ হইল যেন কি বলিবেন, কিন্তু অপরিমিত আনন্দ হইলে যেমন বাক্‌রোধ হইয়া যায়, তাঁহার তদবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি কেবল একদৃষ্টিতে পরমহংসদেবের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। এইরূপে কিয়ং-কাল অতিবাহিত হইলে পর পরমহংসদেব পূর্ব্ব প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং উভয়ে ঠারে ঠোরে নানাপ্রকার কথা কহিলেন। সে সকল কথার ভাব কেহই বুঝিতে পারে নাই।

গঙ্গামাতা স্বহস্তে আহারাদি প্রস্তুত করিয়া পরমহংসদেবকে ভোজন করাইতেন এবং সর্ব্বদাই তত্ত্বপ্রসঙ্গে দিন যাপন করিতেন।

বৃন্দাবন হইতে যখন পরমহংসদেব প্রত্যাগমন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, গঙ্গামাতা বিষাদিত হইয়া নানাবিধ প্রতিবন্ধক জন্মাইতে লাগিলেন। তিনি রোদন করিয়া বলিলেন, "আরে দুলালী! বৃন্দাবন যে তোর্ থাকিবার স্থান। ব্রজবালাদিগেরও বৃন্দাবন ব্যতীত আর স্থান নাই। আমি বৃন্দাবনে বাস করিয়া রহিয়াছি, কেন রহিয়াছি, তাকি তুই জানিস্‌নে? যদি দাসী ব'লে মনে হ'য়েছে, যদি দয়া ক'রে দেখা দিলি, তবে আর কেন আমায় বিরহানলে দগ্ধ কর্‌বি? হ্যাঁরে! আশায় কত দিন প্রাণ বাঁচে? বরং আশা থাকিলে তাহাতে প্রাণ বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে। কিন্তু মিলনের পর বিরহ যে কি অসহ্য দুঃখ, দুলালী! তা কি তুই জানিস্‌নে? আমি এতদিন কেবল ভাবে প্রাণ ধারণ ক'রেছি। মনে করিতাম, এই বৃন্দাবনে একদিন আমার কমলিনী কদম্ব-মূলে—কোন্ কদম্বটী তা জানি না—কানাইয়ার সহিত বিহার করিয়া গিয়াছেন, কদম্ব বৃক্ষ চারিদিকে দেখিতে পাই; কিন্তু কোথাও আমার নন্দকিশোর-রাই-কিশোরীকে দেখিতে পাই নাই! আমাদের সেই যুগলরূপ কৈ? যখন বিপিন প্রান্তে, প্রান্তরে নবদূর্ব্বাদল ঘনীভূত হইয়া রহিয়াছে দেখিতে পাই, তখন মনে হয় কোথায় সে গোপাল! সে গোপালগণ কোথায়! কোথায় সে গোপাল বৎসগণ! আবার যখন ঐ মাঠে গো পাল বিচরণ করিয়া বেড়ায়, তাহাদের দেখিয়া আমার পূর্ব্বকথা স্মরণ হইয়া নয়নে জলধারা বহিয়া যায়। মনে হয়, সখি! আমাদের গোপাল এক সময়ে ঐ রূপে গোপাল লইয়া বেড়া-ইত। তখন মা যশোদার সাজানবেশ মনে উদিত হইয়া আমায় আপনহারা করিত! গোপালের মাথায় চূড়া, নাসায় তিলক, ললাটে ও কপোলদেশে অলকাবিন্দু সকল যেমন শরদাকাশের নিশার তারকারাজি সদৃশ দেখাইত! তাহার ওষ্ঠাধরে গজমতি। আহা! কি সুমধুর মৃদু হাস্য! হাস্যচ্ছটায় মনপ্রাণ

বিমোহিত হইয়া যাইত! মরি! মরি! কিবা ভ্রুভঙ্গী, সে আড়নয়নের চাউনি মনে হ'লে কোন্ কুলবালা কুলশীলে জলাঞ্জলি না দিয়া স্থির থাকিতে পারে? যে ভাল তার কি সকলই ভাল—ভাল কিসে? অমন নিষ্ঠুর কি আর আছে? কুলের কুল-বধূর কুল ভাঙ্গিয়া তাহাদের পথের ভিখারিণী করিয়া শেষে দুকুল নষ্ট করিবার অমন গুরুমহাশয় আর কি দ্বিতীয় আছে? সখি! ঐ দেখ সেই যমুনা, যে যমুনাকূলে ব্রজ-কুলবালা কুলশীল ভুলিয়া গোকুলচন্দ্রের বদনবিনিঃসৃত সুমধুর বংশীধ্বনি-স্বরূপ অমৃতধারা শ্রবণপথে ঢালিবার জন্য একত্রিত হইত; যে যমুনাতীরে একদিন নন্দদুলাল গোপাঙ্গনাদিগের বস্ত্রহরণ করিয়া বৃক্ষশাখায় লুক্কায়িত ছিল; সে বৃক্ষ আছে, সে যমুনাতট আছে, কিন্তু সে চোর কৈ? তাকে কেন দেখিতে পাই না? যে যমুনাপুলিনে আমাদের কমলিনী কনক-লতিকা শ্যাম-কদম্ব ভ্রষ্ট হইয়া যে দিন ধূলায় ধূসরিত হইলে, সখীদিগের রোদন স্বরের সহিত 'হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ!' স্বর সমস্বরে ধ্বনিত হইয়াছিল, সে সখীরাই বা কোথায়? আর সেই ব্রজেশ্বরীই বা কোথায়? সে কুঞ্জবন আর নাই! এখন সকলই নিবিড় বন! বৃন্দাবনে বাস করি, কিন্তু মনের সাধে কথা কহিবার কেহই নাই। তাই বলি, আরে দুলালী! তুই কোথায় আমায় ফেলিয়া পলায়ন কর্বি?" এই বলিয়া গঙ্গামাতা পরমহংসদেবের হস্ত ধারণ করিলেন। পরমহংসদেব এতক্ষণ ভাবাবেশে ছিলেন। গঙ্গামাতা যে সকল কথা কহিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছিল কি না বলা যায় না। পরমহংসদেবের ভাবাবেশ সাম্য হইলে, তিনি গমনোদ্যত হইলেন। গঙ্গামাতা কোন মতে হস্ত ছাড়িলেন না। হৃদয় নিকটে দণ্ডায়মান ছিলেন। গঙ্গামাতার আগ্রহ দেখিয়া তিনিও পরমহংসদেবের আর একটী হস্ত ধারণ করিয়া তথা হইতে চলিয়া আসিবার জন্য বার বার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। একদিকে গঙ্গামাতা, অপরদিকে হৃদয় পরমহংসদেবের হস্ত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন। পরমহংসদেব তখন রোদন আরম্ভ করিলেন। তাঁহাকে দুঃখিত হইতে দেখিয়া গঙ্গামাতা লজ্জিতা হইয়া ছাড়িয়া দিলেন এবং কৃতাঞ্জলি-পুটে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন। পরমহংসদেব অভয় দিয়া তথা হইতে কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। গঙ্গামাতা তৎপরে বৃন্দাবনের নিকট বর্ষণ নামক স্থানে বাস করিয়া কয়েক বৎসর হইল দেহত্যাগ করিয়াছেন।

পথিমধ্যে কোনস্থানে কতকগুলি পার্ব্বতীয় অসভ্য নরনারী একটী প্রান্তরে বাস করিতেছিল। তাহাদের পরিধেয় বিশেষ কোন প্রকার বস্ত্র ছিল না,

থাকিবার আবাসস্থান বৃক্ষতল, আহার বোধ হয়, কখন হয় এবং কখন অনাহারেই থাকিতে হয়। তাহাদের মলিন বেশ, মলিন অবস্থা দেখিয়া পরমহংসদেব রোদন করিয়া বলিলেন, “মা! তোমার সংসারে এমন দুঃখীও আছে? তুমি না দয়াময়ী, দুঃখবারিণী? তোমার এমন ভেদাভেদ কেন মা? কেহ তোমার কৃপায় অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া রহিয়াছে। আবার কেহ কি জন্য দারিদ্র্যের চরমদশায় পতিত হইয়া রোদন করিয়া দিন যাপন করিতেছে? মা! এ কি তোমার লীলা? কেহ মা তোমার প্রসাদে হিরণ্ময় চাকচিক্য প্রাসাদে বাস করিয়া দেহের স্বচ্ছন্দতা লাভ করিতেছে এবং কাহাকে একখানি তালবৃন্তনির্ম্মিত কুটীরাভাবে বৃক্ষতলে শয়ন করিতে হইতেছে? কেহ মা তোমার সংসারে অমৃতবৎ পদার্থ আহার করিতে না পারিয়া কুক্কুর বিড়ালকে দিতেছে; এবং কেহ মা আহার বিহনে অনাহারে দিন যাপন করিতেছে! কেহ গাড়ী ঘোড়ায় গমনাগমন করিতেও ক্লেশানুভব করিয়া থাকে এবং কেহ মধ্যাহ্নের তপন তাপে, বৃষ্টিধারায় ভিজিয়া ও বাতাঘাতে আহত হইয়া, পদব্রজে মস্তকে মোট লইয়া গমন করিতেছে! মা! তোমার খেলা তোমাকেই সাজে। রামপ্রসাদ ঠিক বলিয়াছে। কাহার দুধে চিনি এবং কাহার শাকে বালি। মা! সে কি তোমার পাকা ধানে মৈ দিয়াছে?” পরমহংসদেবকে রোদন করিতে দেখিয়া মথুর বাবু নানাপ্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই শুনিলেন না। তদনন্তর তিনি কহিতে লাগিলেন, “দেখ মথুর! এই অনাথা, আশ্রয়বিহীন দীন দরিদ্রদিগকে উত্তমরূপে অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করাইয়া ভোজন করাও এবং প্রত্যেককে একখানি বস্ত্র প্রদান কর।” মথুর বাবু এই কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, “বাবা তোমার দয়ার্দ্র হৃদয়, সকলকেই সমজ্ঞান কর; দুঃখী দেখিলে তোমার প্রাণ ব্যাকুলিত হইয়া উঠে, সেই জন্য হীনাবস্থার ব্যক্তি দেখিলে তুমি কাতর হইয়া থাক। কিন্তু বাবা! অর্থ কাহাকে বলে তোমার জ্ঞান নাই। আমার এমন কি সঙ্গতি আছে যে, সকল দুঃখীর দুঃখ বিমোচন করিতে পারি?” ইহাকেই বিষয়ের আসক্তি বলে। পরমহংসদেবই তন্নিমিত্ত বার বার কাঞ্চন অর্থাৎ বিষয়কে অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করিবার নিমিত্ত ভূরি ভূরি উপদেশ দিয়াছিলেন। মথুর বাবু বিপুল সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াও বিষয়ের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

সে যাহা হউক, তিনি অবশেষে পরমহংসদেবের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিতে

বাধ্য হইয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে বস্ত্র আনাইয়া ঐ দরিদ্রদিগকে এক এক খণ্ড করিয়া বস্ত্র দান করা হইয়াছিল এবং এক সপ্তাহকাল অতি আড়ম্বরের সহিত উহাদিগকে চাতুর্ব্বিধান্নে ভোজনাদি করান হইয়াছিল। তথা হইতে আসিবার সময় পরমহংসদেবের আজ্ঞায় পুনরায় উহাদের প্রত্যেককে একটী করিয়া সিকি দেওয়া হইয়াছিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

পরমহংসদেব দক্ষিণেশ্বরে আবদ্ধ থাকিতেন না, তিনি সময়ে সময়ে নানা-স্থানে গমন করিতেন। একদা আদি ব্রাহ্মসমাজের উপদেশপদ্ধতি দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। সেই সময়ে বাবু কেশবচন্দ্র সেন ঐ সমাজভুক্ত ছিলেন। পরমহংসদেব তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, সকলেই উপাসনায় নিযুক্ত রহিয়াছেন, তিনিও ধীরভাবে উপবেশন করিয়া উপাসনায় যোগ দিয়া-ছিলেন। উপাসনান্তে পরমহংসদেব মথুর বাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "কেবলঐ তরুণ যুবকটীর ফাত্না * নড়িতেছে, অবশিষ্ট ব্যক্তিদিগের এখনও পর্য্যন্ত কিছুই হয় নাই। উহারা কপট ধ্যান করিতেছে।" কলিকাতার অন্তঃ-পাতী কলুটোলা নামক স্থানে চৈতন্য-সভা নামক একটী সভা ছিল। তথাকার সভ্যেরা চৈতন্যদেবের আসন মধ্যস্থানে স্থাপন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতেন। পরমহংসদেব সেই সভায় গমন পূর্ব্বক ভাবাবেশে চৈতন্য-আসনে উপবেশন করিয়াছিলেন। কেহ কেহ এই ব্যাপার দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন, কেহ বা তাঁহাকে প্রবঞ্চক, কপটী, চৈতন্যদেবের ভাব অনুকরণ পূর্ব্বক আপনাকে অবতাররূপে প্রকটিত করিতেছেন বলিয়া, অভিযোগ করিতে লাগিলেন। যাঁহারা মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহারা ক্রমে ক্রমে মহাভাবের লক্ষণ পরম্পরা দর্শন করিয়া জীবন এবং নয়নের সার্থকতা বোধ করিতে লাগিলেন। এই ঘটনায় বৈষ্ণবমণ্ডলীর মধ্যে একটা বিশেষ গোল-যোগ উপস্থিত হইয়াছিল।

---

* মনের সহিত ফাত্নার তুলনা দেওয়া হইয়াছে। এস্থানে প্রাণরূপ কাঁটায়, নামরূপ টোপে, ভক্তিরূপ চার দ্বারা ঈশ্বররূপ মীন টোপ ধরিলে মন ফাত্না নড়িয়া থাকে।

সেই সময়ে কাল্‌নায় বৈষ্ণবকুলগৌরব পরম ভাগরত শ্রীমৎ ভগবান্‌ দাস বাবাজীর নিবাস ছিল। তাঁহার ইতিবৃত্ত শ্রবণ করিলে, কেবল আশ্চর্য্য নহে, নির্ব্বাক্‌ ও বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া যাইতে হয়। তাঁহার বৃত্তান্ত তদন্ত করিলে, তাঁহাকে শান্ত, দান্ত, মহান্ত বলিলেও তাঁহার গুণের অন্ত করা হয় না। কারণ, সকলের প্রমুখাৎ খ্যাত আছে যে, তাঁহার বয়ঃক্রম নিরূপণ হওয়া কাহার সামর্থ্যে সংকুলান হয় নাই। যাহার মনে যেমন হইত, সে তাঁহার বয়ঃক্রম সম্বন্ধে তদ্রূপ বলিত। তাঁহার উঠিবার শক্তি ছিল না, কিন্তু সঙ্কীর্ত্তনাদিতে মত্ত-মাতঙ্গের ন্যায় নৃত্য করিতে পারিতেন। তাঁহার বিশেষ কি ভাব ছিল, তাহা জ্ঞাত হওয়া যায় না, কিন্তু একজন প্রেমিক ভক্ত ছিলেন বলিয়া বিখ্যাত আছেন। পরমহংসদেব কর্ত্তৃক চৈতন্য-আসন গৃহীত হইয়াছে শুনিয়া ভগবান্‌ দাস বাবাজী যারপরনাই কুপিত হইয়া যথোচিত তিরস্কার করিয়াছিলেন। কিয়দ্দিবস পরে পরমহংসদেব মথুর বাবুর সহিত নৌকাপথে ভ্রমন করিতে করিতে কাল্‌নায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় গমন করিয়া পরমহংসদেব হৃদয়ের সহিত উক্ত বাবাজীর আশ্রমে সমাগত হইলেন। বাবাজীর বয়োবৃদ্ধিবিধায় দৃষ্টিহানি হইয়াছিল, তন্নিমিত্ত কাহাকেও সহসা চিনিতে পারিতেন না। তিনি নয়নে দেখিতে পাইতেন না বটে, কিন্তু সাধনপ্রভাবে সকলই বুঝিতে পারিতেন। পরমহংসদেব তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইবামাত্র বাবাজী বলিয়া উঠিলেন, "কোন্‌ মহাপুরুষ দীনের প্রতি দয়া করিয়া কুটীরে চরণ-ধূলি প্রদান করিলেন?" এই কথা বলিতেছেন, এমন সময়ে পরমহংসদেব তাঁহার সম্মুখে যাইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। বাবাজী অমনই চরণ ধারণ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "আজ আমি কৃতার্থ হইলাম! প্রভু! আমায় হীন শক্তিবিহীন কাঙ্গাল জানিয়া দয়াপরবশে নিজ উদারতা গুণে দর্শন দিয়া চির আশা সম্পূর্ণ করিলেন। আমি অতি অপবিত্র, নরাধম, মহাপাপী। কেন না আমি আপনি তীর্থ পর্য্যটন কিম্বা সাধু দর্শন করিতে অশক্ত হইয়া একস্থানে পিণ্ডাকারে পতিত রহিয়াছি। কিন্তু দয়ার সাগর ভগবান্‌, ভগবান্‌ দাসের প্রতি বুঝিলাম এতদিন পরে সুপ্রসন্ন হইয়াছেন! আজ সাধুপদধূলিতে আমি পবিত্র, আশ্রম পবিত্র এবং দেশও পবিত্র হইল। এমন সুদুর্লভ পদার্থ সর্ব্বত্রে অপ্রাপ্ত। যাঁহাদের মধ্যে ব্রহ্মতেজ বিরাজ করিতেছেন, যাঁহাদের হৃদয়ে জগতের আনন্দ-বিধাতা শ্রীকৃষ্ণ বিহার করিতেছেন, যাঁহারা হৃদি-বৃন্দাবনে নিত্য রাসলীলা দর্শন করিয়া রসিকশেখরের চরম প্রেম আস্বাদন করিতেছেন,

যাঁহারা সৃজিত হইয়া সৃষ্টিকর্ত্তাকে আপন হৃদয়পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছেন, তাঁহারাই সকলের পূজ্য এবং সকলের প্রণম্য।” বাবাজী পরমহংসদেবের মহাভাবের অবস্থা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। মহাভাব কথার কথা নহে, সহজে সাধনসাপেক্ষ নহে। যাহা জীবে কদাচ প্রকাশিত হইবার নহে, যাহার দৃষ্টান্ত এক মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ দেখে নাই, তাহা কেমন করিয়া মনুষ্যবুদ্ধি অনায়াসে অনুমান করিতে পারিবে? বাবাজী পণ্ডিত না হইলেও সাধক ছিলেন, বিশেষতঃ বৈষ্ণব শ্রেণী-ভুক্ত, তাঁহার মহাভাব অবশ্যই জানা ছিল। তিনি পর্য্যায়ক্রমে তাহা দেখিতে পাইলেন এবং শাস্ত্রের সহিত তদ্‌সমুদায় লক্ষণ মিলাইয়া পাইয়া হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে জয়ধ্বনি দিয়া উঠিলেন। তদনন্তর তিনি জানিতে পারিলেন যে, এই মহাত্মা কলুটোলার চৈতন্য-আসন অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব অপরাধ স্মরণ হইল এবং আপনাকে অশেষ প্রকার ধিক্কার দিয়া অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

পরমহংসদেব কয়েকবার তাঁহার স্বদেশেও গমন করিয়াছিলেন। তথাকার লোকেরা তাঁহাকে লইয়া মহা আনন্দ করিত। তিনি যে স্থানে বাসা করিতেন, সর্ব্বদা লোকের সমাগমে সেই স্থানটী উৎসবক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইত। হৃদয়ের বাটীতে অনেক সময় থাকিতেন। একদা শ্যামবাজার নামক স্থানে গমন করিয়াছিলেন। তথায় সপ্তাহকাল নিরবচ্ছিন্ন সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। দেশ দেশান্তর হইতে দলে দলে লোক আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। এরূপ জনতা প্রায় পল্লীগ্রামে মেলা হইলেও হয় না। প্রত্যেক লোকের মুখে এই কথা যে, এক অদ্ভুত ব্যক্তি আসিয়াছেন, তিনি ক্ষণে ক্ষণে মৃতপ্রায় হইতেছেন, আবার হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের উচ্চ রোলে তিনি পুনর্জ্জীবিত হইয়া সিংহের ন্যায় নৃত্য করিতেছেন। এমন নৃত্য কেহ কখন দেখে নাই, এমন কীর্ত্তনও কেহ কখনও শুনে নাই। মাঠে, গৃহস্থের গৃহের চালে, প্রাচীরে, বৃক্ষে, অবশেষে তাল বৃক্ষের উপর পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়া লোকে এই অপূর্ব্ব ভাব দর্শন করিয়াছিল। এই জনতা হওয়ায় পরমহংসদেব দুই দণ্ড সুস্থির হইয়া বিশ্রাম অথবা তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার করিতে পারেন নাই। এই জনরব যতই বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ক্রমে লোক সমাগমের আর পরিসীমা থাকিল না। তিনি তদনন্তর কোন উপায় না দেখিয়া বহির্দ্দেশে গমনচ্ছলে তথা হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন। তদবধি জনতা ভয়ে আর আপনাকে ভাল করিয়া কাহার

নিকট পরিচয় দিতেন না। অধিকাংশ সময়েই ছদ্মবেশে এবং ছদ্মভাবে থাকিতেন।

পরমহংসদেব প্রতি বৎসর পানিহাটীর মহোৎসবে যাইয়া সঙ্কীর্ত্তনাদি করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সময় যখন নিত্যানন্দ ঠাকুর প্রচার কার্য্যে বহির্গত হইয়া নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া পানিহাটীতে আগমন করেন, তখন তিনি কাহার বাটীতে অবস্থিতি না করিয়া একটী বটবৃক্ষমূলে রজনী যাপন করিয়াছিলেন। পরদিবস প্রাতঃকালে তথায় জলযোগ করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবেরা অদ্যাপি সেই বৃক্ষতলে প্রতি বৎসর মহোৎ-সব করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবদিগের সঙ্কীর্ত্তনে পরমহংসদেবের যোগ দেওয়ায় অতি অপূর্ব্বভাব ধারণ কবিত। আমরা সৌভাগ্যক্রমে সেইরূপ সঙ্কীর্ত্তন কয়েকবার শ্রবণ করিয়াছি, তাহা লেখনী দ্বারা অংশরূপেও প্রকাশ করা আমা-দের পক্ষে সাধ্যাতীত। আমরা অনেক সঙ্কীর্ত্তন ও প্রেমিক ভক্ত দেখিয়াছি, অনেক জ্ঞানী সাধকও দেখিয়াছি, অনেক সুপণ্ডিত ও সঙ্গীতশাস্ত্রবিশারদ গায়ক দেখিয়াছি, অনেক লয় মান সংযুক্ত নৃত্যও দেখিয়াছি, কিন্তু পরমহংসদেবের নৃত্য ও সঙ্কীর্ত্তনের ভাব এক চৈতন্যদেব ব্যতীত আর কাহার সহিত তুলিত হইতে পারে না। যাঁহারা তাঁহার হরিনাম শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানিতে পারিয়াছেন। হরিভক্ত যাঁহারা, তাঁহারা সেই সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া প্রেমাবেশে পুলকিত হইতেন, একথা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু যাঁহারা তমোগুণের আকর, ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানিতেন না, ভক্তি প্রীতি যে প্রদেশে লেশমাত্র ছিল না, যাঁহাদের হৃদয় শূন্য লৌহময় বলিলেও বলা যাইত, যাঁহারা পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুরোধে রাজপথে সাধারণ স্থানে ও সাধারণ ব্যক্তিদিগের সমক্ষে নৃত্যাদি করা অসভ্যতার লক্ষণ জ্ঞান করিতেন, যাঁহারা ভাব ও প্রেমকে মস্তি-ষ্কের ও মনের বিকার বলিয়া আস্ফালন করিতেন, তাঁহারাও প্রেমে বিহ্বল হইয় হৃদয়ের চিরসঞ্চিত সভ্যতার মস্তকে পদাঘাত করিয়া সঙ্কীর্ত্তনে নৃত্য করিয়াছেন।

পরমহংসদেব যখন সঙ্কীর্ত্তনে মাতিয়া উঠিতেন, তখন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান একেবারে থাকিত না। তিনি কখন হুঙ্কার দিয়া নৃত্য করিতেন এবং কখন স্থির হইয়া ঢলিয়া পড়িতেন। এই নিমিত্ত ভক্তেরা সর্ব্বদাই তাঁহার নিকটে নিকটে থাকিতেন। পরমহংসদেব বেলঘরিয়ায় দুইবার গমন করিয়াছিলেন। প্রথমে ইং ১৮৭২ সালে, ফাল্গুন কিম্বা চৈত্র মাসে, বেলা ৮।৯ টার সময় জয়গোপাল সেনের উদ্যানে কেশবচন্দ্র সেনকে দেখিতে গিয়াছিলেন। কেশব বাবু ও

তাঁহার পারিষদ্‌বর্গ সেই সময়ে স্নান করিবার আয়োজন করিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া কেহ সমাদর কিম্বা হতাদর করেন নাই। পরমহংসদেব কাহার প্রতি কটাক্ষ না করিয়া কেশব বাবুর সম্মুখে যাইয়া বলিয়াছিলেন, "তোমার ল্যাজ্‌ খসিয়াছে।" ভাবের কথায় কে প্রবেশ করিবে? কেহ অবাক্‌ হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল এবং কেহ হাসিয়া উঠিল। কেশব বাবু তাহাতে বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিয়া কহিয়াছিলেন, "উনি কি বলেন, শ্রবণ কর।" পরমহংসদেব বলিতে লাগিলেন, "যে পর্য্যন্ত ব্যাঙাচির ল্যাজ্‌ থাকে, তাহারা জলে বাস করে, ল্যাজ্‌ খসিলে মাটীতে লাফাইয়া পড়ে।" ইহার ভাব এই যে, সাংসারিক জীবগণ ব্যাঙাচি সদৃশ, কারণ তাহারা সংসারেই ঘুরিয়া বেড়ায়। যে জীব চৈতন্যরাজ্যে পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহার অবস্থা সাধারণ জীবের ন্যায় নহে। পরমহংসদেবের প্রত্যেক কথা ভাবে পরিপূর্ণ। একটী ভাবে তিনি যেন কোন কথাই কহিতেন না। এই ব্যাঙাচির দৃষ্টান্তে আরও কতদূর তিনি লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন, তাহা বলিয়া উঠা যায় না। দৃষ্টান্তটী যে ভাবে কথিত হইল, তাহা দ্বারা যে কেশব বাবুর উচ্চাবস্থা নিরূপিত হইতেছে, তাহা নহে। ব্যাঙের ল্যাজ্‌ খসিলেই যে সে পরিত্রাণ পাইল না, তাহা সকলেই জানেন, তবে ব্যাঙাচি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উন্নত বলিতে হইবে। কারণ, কাল-ভুজঙ্গের গ্রাস হইতে যে পর্য্যন্ত অব্যাহতি না পায়, সে পর্য্যন্ত ব্যাঙের কোন আশা ভরসা নাই; কেশব বাবু তখন সে অবস্থা অতিক্রম করিতে পারেন নাই। সেইজন্য উপরোক্ত দৃষ্টান্ত দিয়াছিলেন। কেশব বাবুর সহিত কথা-কহিয়া পরমহংসদেব আনন্দিত হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় বারে, গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে যাইয়া নানাবিধ উপদেশ ও সংকীর্ত্তনাদি করিয়াছিলেন।

পরমহংসদেব কলিকাতায় এবং ইহার সন্নিহিত প্রায় অধিকাংশ স্থানেই গতিবিধি করিতেন, কিন্তু বাগবাজারে ৺বলরাম বসুর বাটীতেই তাঁহার প্রধান আরামের স্থল ছিল। পরমহংসদেব দক্ষিণেশ্বর গমনাবধি রাসমণির জানবাজারের বাটী ব্যতীত অন্য স্থানে কখন রজনী যাপন করেন নাই। বল-রাম বাবুর বাটীতে কেবল সে নিয়ম ছিল না। বলরাম বাবুই ধন্য! তাঁহার ন্যায় সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি অতি অল্পই দেখা যায়।

কোন্নগরে তিনি কয়েকবার যাতায়াত করিয়াছিলেন। একবার তথাকার পণ্ডিতবর দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন পরমহংসদেবকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন।

তিনি উপস্থিত হইবামাত্র পরমহংসদেব তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। কিন্তু দীনবন্ধু তাহা না করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি আমার প্রণম্য?" পরমহংসদেব অতি দীনভাবে দীনবন্ধুকে কহিলেন, "আমি সকলের দাস, আমার প্রণম্য সকলেই। আমার কাছে নিম্ন নাই, সকলের নিম্ন আমি।" দীনবন্ধু তথাপি কহিতে লাগিলেন, "আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহার উত্তর দিতে হইবে। আপনি আমার নমস্য কি না?" পরমহংসদেব কাতর হইয়া বলিলেন, "তাহা কেমন করিয়া বলিব? আমি নিশ্চয় জানি যে, আমা অপেক্ষা বিশ্ব-সংসারের সকল বস্তুই শ্রেষ্ঠ, আমি সকলের দাসানুদাস।" দীনবন্ধু তখন কহিতে লাগিলেন, "আপনি কি আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারেন নাই? আপনার যজ্ঞোপবীত নাই, সেজন্য আপনি ব্রাহ্মণের নমস্য নহেন। তবে যদ্যপি সন্ন্যাসাশ্রমী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাদের অবশ্য নমস্য হইতে পারেন।" দীনবন্ধু পণ্ডিত, বিশেষতঃ নৈয়ায়িক, তিনি ভক্তিতন্ত্রের গূঢ় মর্ম্ম কেমন করিয়া বুঝিবেন? ভক্তের লক্ষণ, সাধুর শিষ্টাচার, বা দীনভাবের অর্থ দাম্ভিক পণ্ডিতেরা কি অনুধাবন করিতে পারেন? দীনবন্ধু হয় ত মনে করিয়াছিলেন যে, আমি বিলক্ষণ ন্যায়ের ফাঁকি বাহির করিয়াছি। পরমহংস আর কোন দিকে পলাইতে পারিবে না; কিন্তু স্থূলদর্শী নৈয়ায়িক মহাশয় সে দিন নিরহঙ্কারী সাক্ষাৎ শুকদেবসদৃশ অমানুষভাবাপন্ন রামকৃষ্ণের ফাঁকি ধরিয়া ফাঁকে পড়িয়া গিয়াছেন। তিনি বুঝিলেন না যে, আমি সন্ন্যাসী হইয়াছিলাম, এ কথা যে ব্যক্তি স্বীকার করিতেছেন না, তাঁহার কত উচ্চ ভাব, তিনি কতদুর অহঙ্কার বিবর্জ্জিত! কর্ণে শুনিতেছেন যে ব্যক্তি পরমহংস, তাঁহাকে কি আবার সন্ন্যাসী কি না, এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে হয়? তাঁহার একটী আপত্তি থাকিতে পারে। অন্যান্য পরমহংসের ন্যায় তাঁহার গৈরিক বসন ছিল না। এই যদি তাঁহার আপত্তি হয়, তাহা হইলে সে কথা কোন ভক্তকে জিজ্ঞাসা করিলেই হইত। গৈরিক পরিধান করা ত অহঙ্কারের পরিচয়। কারণ, মুখে না বলিয়া, পরিচ্ছদ দ্বারা নিজ অবস্থা সর্ব্বসাধারণকে বিজ্ঞাপন করা যারপরনাই রজোগুণের পরিচয়বিশেষ। ন্যায়রত্ন মহাশয় তথাপি ছাড়িলেন না। অতঃপর তিনি মৃদুস্বরে তাহা স্বীকার করিয়াছিলেন। পরমহংসদেব কখন কখন হরিসভায় ও ব্রাহ্মমন্দিরে যাইতেন। কিন্তু কুত্রাপি বিশিষ্টরূপে আনন্দলাভ করিতে পারিতেন না।

বিংশ পরিচ্ছেদ

যৎকালে পরমহংসদেব এইরূপে নানা স্থানে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তাঁহার জীবন্ত উপদেশের দ্বারা অনেকেরই ঈশ্বর বিষয়ে বিশুদ্ধ জ্ঞান সঞ্চার হইতেছিল। সুতরাং অনেকের নিকটেই তিনি প্রকাশিত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, সর্ব্বপ্রথমে মথুর বাবু তাঁহাকে চিনিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি আপনভাব কাহারও সমক্ষে প্রকাশ করেন নাই। কলিকাতার আর একটী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শম্ভু চরণ মল্লিকের প্রতি পরমহংসদেবের সমধিক কৃপা ছিল। তিনি সদাসর্ব্বদা তাঁহার বাটীতে যাইতেন। শম্ভু মল্লিক এক-জন প্রকৃত ঈশ্বরানুরাগী ভক্ত ছিলেন। তাঁহার দানশক্তির বিশেষ সুখ্যাতি আছে। এ সকল গুণ তিনি পরমহংসদেবের আশীর্ব্বাদে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ভারতবর্ষের যে স্থানে যে রকম সাধু সন্ন্যাসী ছিলেন, প্রায় তাঁহারা সকলেই পরমহংসদেবকে জানিতেন। তাঁহারা জগন্নাথদেব দর্শন কিম্বা গঙ্গাসাগর উপলক্ষে কলিকাতায় আসিলে পরমহংসদেবের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া যাইতেন না।

ক্রমে পরমহংসদেব সর্ব্বজনসমক্ষে প্রকটিত হইতে আরম্ভ হইলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, তিনি গোলযোগ ভালবাসিতেন না। দুইটী তিনটীর অধিক লোক যাতায়াত করিলে কিঞ্চিৎ বিরত হইতেন। কিন্তু মুখে কাহাকেও কটু কথা কহিতে পারিতেন না। ক্রমে লোক সমাগম কিছু অধিক আরম্ভ হইল। সে সময়ে খোট্টা মাড়োয়ারীরাও দলে দলে যাইতেন। এই মাড়োয়ারী-দিগের মধ্যে লক্ষ্মীনারায়ণ নামক এক ব্যক্তির গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থাদিতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। লোকের স্বভাবই এই যে, কেহ কিছু জানুক আর নাই জানুক, একটী কথা উত্থাপন হইলে তদ্বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে কেহই পশ্চাৎদৃষ্টি করে না। তাহাতে যদি কিছু কাহারও জানা থাকে, তাহা হইলে আর কোন মতে নিস্তার নাই। লক্ষ্মীনারায়ণের কিছু ধর্ম্মশাস্ত্র জানা ছিল। তিনি সেই জন্য পরমহংসদেবের সহিত নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক করিয়া যখন পরাস্ত হইলেন, তখন অগত্যা তাঁহাকে সাধু বলিয়া স্বীকার করিলেন। তিনি তদনন্তর মধ্যে মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন এবং

পরমহংসদেবের সহিত নানাপ্রকার তত্ত্ব-আলাপন করিয়া আনন্দে দিন যাপন করিয়া যাইতেন।

একদা পরমহংসদেবের বিছানার চাদরখানি ছিঁড়িয়া গিয়াছে দেখিয়া, লক্ষ্মীনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার বিছানার চাদরখানি ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, কি জন্য পরিবর্ত্তন করা হয় নাই?" তাহাতে পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন যে, "উহা এখনও ব্যবহারোপযোগী আছে। যখন নিতান্ত প্রয়োজন হইবে, তখন এই মন্দিরস্বামী প্রদান করিবেন।" এই কথা শ্রবণান্তর লক্ষ্মীনারায়ণ কহিতে লাগিলেন, "এ প্রকার নিয়ম অন্যায়। বস্ত্র ছিন্ন হইয়া যাইলে, তাহা চাহিবার পূর্ব্বেই প্রদান করা কর্ত্তব্য। এ দেশের ধনীরা এ সম্বন্ধে নিতান্ত অজ্ঞান, সাধুর মর্য্যাদা তাহারা বুঝিতে পারে না। যাহা হউক, আমাদের দেশে এরূপ প্রথা আছে যে, সাধু মহান্তদিগের ব্যয় সংকুলানের নিমিত্ত ধনী ব্যক্তিরা কিছু অর্থ দিয়া থাকেন। সাধুকে আর কাহারও নিকটে ভিক্ষা করিতে হয় না। সাধুকে যদ্যপি নিজ খরচের সংস্থানের নিমিত্ত সমস্ত দিন চিন্তা করিতে হয় এবং দ্বারে দ্বারে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের সাধন সম্বন্ধে বিশেষ বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। সাধনের জন্য বিষয় পরিত্যাগ করা। যদ্যপি সেই বিষয়েই আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইল, তাহা হইলে সংসার তাঁহাদের অপরাধ করিয়াছিল কি? মহাশয়ের পক্ষে ঠিক্ তাহা নহে। তথাপি অপরে না দিলে অভাব বিমোচন হইতেছে না। কাহার মনের ভাব কখন কিরূপ হয়, কিছুই বলা যায় না। এক ব্যক্তি অদ্য সাধুসেবায় ব্রতী রহিয়াছে, কাল আবার সেই ব্যক্তিকেই সাধুর পরম শত্রুরূপে দেখা যাইতেছে। তাহাদের ভক্তির উপর সাধুর ভাল মন্দ নির্ভর করিতেছে। আমার বাসনা এই যে, আমি মহাশয়ের নামে দশ সহস্র মুদ্রার কোম্পানীর কাগজ ক্রয় করিয়া দিই। তাহার মাসিক সুদ ন্যূন সংখ্যায় চল্লিশ টাকা হইবে। এই টাকায় আপনার সমুদয় অভাব সম্পূর্ণ হইয়া যাইবে।" লক্ষ্মী নারায়ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া পরমহংসদেব নিতান্ত বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "কেন আমায় অর্থের প্রলোভন দেখাইয়া অনর্থের কূপে নিক্ষেপ করিবে! অর্থ পরমার্থ-পথের কণ্টকস্বরূপ এবং তৎস্থান হইতে পরিভ্রষ্ট করিয়া থাকে। তুমি আমায় বলিতে পার, অর্থের দ্বারা সচ্চিদানন্দ লাভ হয় কি না? কখন হয় না, এবং হইবার নহে, আমি তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অর্থ জড় পদার্থ, তাহার দ্বারা যাহা হয়, তাহাও জড় পদার্থ। জড় পদার্থের আবশ্যক আছে,

তাহা আমি স্বীকার করি। দেহের জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়, কেবল প্রয়োজন কেন? বিশেষ প্রয়োজন হয় বটে; কিন্তু আমার এক প্রকার কালীর ইচ্ছায় স্বচ্ছন্দে চলিতেছে, সে স্থলে অর্থ সঞ্চিত করিয়া রাখিবার কোন হেতু আমি দেখিতেছি না। তুমি কি বিশ্বাস কর যে, এই রাসমণির দেবালয়ে অবস্থিতি করিতেছি বলিয়া, রাসমণি আমায় আহার দিতেছে? তাহা অজ্ঞানীরা অবশ্যই বলিবে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা কি সত্য? রাসমণিকে কে অর্থ দিল? জন্মকালে সে অর্থ আনে নাই এবং মরিবার সময়ও কিছুই লইয়া যায় নাই। তবে বাহ্যিক একটা উপলক্ষ মাত্র। উপলক্ষকে অবশ্য নমস্কার করি। কিন্তু যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, সকলের কর্ত্তা, তিনিই আদি কারণ।

"জড় জগতের পদার্থ জড় পদার্থের সহকারী, চৈতন্যের সহিত আধার আধেয় সম্বন্ধ মাত্র। দেহ জড় পদার্থ দ্বারা গঠিত, অর্থ তাহারই পুষ্টি-সাধন পক্ষে সহায়তা করে। চৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহার কোন সংস্রব দেখা যাইতেছে না। তবে কি বলিয়া জড় পদার্থের সহিত চৈতন্যের সম্বন্ধ স্থাপন করিব এবং তুমি তাহার পক্ষ সমর্থন করিতেছ? অতএব যে পদার্থ দ্বারা সারাৎসার বস্তু হইতে বিচ্যুত হওয়া যায়, তাহা নিতান্ত অসার এবং সর্ব্বতোভাবে তাহা হইতে সাবধানে থাকা সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

"দ্বিতীয় কথা এই, অহংনাশ না হইলে, আত্মজ্ঞান লাভ হয় না। কারণ অহঙ্কার সে পথের আবরণবিশেষ। এই অহংবৃক্ষের মূলোৎপাটনের জন্য সাধন ও ভজনের প্রয়োজন হইয়া থাকে। কিন্তু এই 'অহং' যাহাতে পরিবৃদ্ধি পাইবে, তুমি ভাগবতের পণ্ডিত হইয়া তাহার পথ পরিষ্কার করিয়া দিতেছ। বেদে কথিত আছে যে, ঈশ্বর মনুষ্যের মন এবং বুদ্ধির অগোচর। ইহা যথার্থ কথা। কিন্তু ইহার স্বতন্ত্র-ভাব আছে। বিষয়াত্মক মন বুদ্ধির অতীত তিনি এবং বিষয়বিরহিত অর্থাৎ শুদ্ধ মন বুদ্ধির গোচর তিনি; এই জন্য বলি, আমি অনেক ক্লেশ পাইতেছি, অহংনাশের জন্য আমি কত কি করিয়াছি, কিন্তু আজও আমার অহংনাশ হয় নাই, আজও তুমি আমি জ্ঞান রহিয়াছে, আজও অর্থের কথায় কথা কহিতেছি, আজও অর্থ লইয়া আন্দোলন করিতেছি, আজও আমার মন বিষয়বিরহিত হইতে পারে নাই; এ অবস্থায় আর আমার সর্ব্বনাশ করিও না। আমায় কেন অর্থ দিবে? আমি সাধু নহি, মহান্ত নহি, আমি সিদ্ধপুরুষ নহি, আমি কিছুই নহি। আমি পণ্ডিত নহি, আমি ধনবানের পুত্র নহি, আমি সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভব নহি, আমি এখন ব্রাহ্মণও নহি। কতবার

উপবীত ধারণ করিলাম, কি জানি কোথায় হারাইয়া যায়। আমায় অর্থ দিলে কি হইবে? অর্থ দিবার অনেক সুপাত্র আছে, তুমি তাহাদের সাহায্য কর, বিশেষ ফল পাইবে।”

লক্ষ্মীনারায়ণ কহিলেন, “আপনার এই কথায় আমি অনুমোদন করিতে পারিলাম না। আপনার সম্বন্ধে তাহা খাটিতে পারে না। আপনি কি, তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি এবং সেই জন্যই অদ্য এই প্রস্তাব করিয়াছি। আমি জানি যে, আপনার মন বিষয় হইতে একেবারে স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছে। তৈল যেমন জলের উপরে ভাসে, সেইরূপ আপনার মন বিষয়ের উপরে ভাসিবে। অহং-ভাবের কথা যাহা বলিলেন, তাহা এ প্রকার মনে কখনও স্থান পায় না।” পরমহংসদেব কহিলেন, “তৈল এবং জল একত্রে মিশ্রিত না হউক, কিন্তু তখনই জলে তৈলের গন্ধটী বাহির হইয়া দিনকতক পরে তৈল এবং জলের সংযোগ স্থানটী পচিয়া যায়। সেই প্রকার বিষয়ের সহিত মনের সংযোগ হইলে, মনটীতে প্রথমে বিষয়ের দুর্গন্ধ বাহির হইবে এবং পরে মন বিকৃত হইয়া যাইবে।”

লক্ষ্মীনারায়ণ কহিতে লাগিলেন, “ভাল, ইহাতে যদি এতই আপত্তি থাকে, আপনার কোন আত্মীয়ের নামে হউক।” পরমহংসদেব তথাপি অসম্মত হইলেন এবং বলিলেন, “তাহাতেও আমার মনে ছায়া পড়িবে। আমি জানিব যে, অর্থ আমার, বেনামী করিয়া রাখিয়াছি; ইহা আরও দোষ।” লক্ষ্মীনারায়ণ পুনরায় অতিশয় আগ্রহ পূর্ব্বক কহিলেন, “আপনাকে এই টাকা অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। আমি যখন একবার আপনাকে দান করিয়াছি, তাহা কোন মতে আর গ্রহণ করিতে পারিব না। আপনার যাহা ইচ্ছা হয়, করিবেন।”

লক্ষ্মীনারায়ণের মুখ হইতে এই কথা বাহির হইতে না হইতে, পরমহংসদেব একেবারে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া বলিয়া উঠিলেন—“মা! এমন লোককে কেন আন মা! যাহারা তোমার নিকট হইতে আমাকে বিচ্যুত করিতে চায়, তাহারা যে আমার পরম শত্রু মা!” এই বলিতে বলিতে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ যারপরনাই অপ্রতিভ হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। পরমহংসদেব তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মিষ্ট কথায় লক্ষ্মীনারায়ণকে পূর্ব্ব প্রকৃতিস্থ করিয়া দিয়াছিলেন।*

* মথুর বাবু এক সময়ে পরমহংসদেবের নামে ৫০,০০০৲ টাকার কাগজ করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, পরমহংসদেবও সে সময়ে মথুরকে তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, পরমহংসদেবের সহিত কেশবচন্দ্র সেনের পরিচয় হইয়াছিল। কেশব বাবু পরমহংসদেবের প্রকৃত ভাব জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত দুই তিন জন ব্যক্তিকে দক্ষিণেশ্বরে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মেরা মন্দিরবাটীতে দুই তিন দিবস অবস্থিতি পূর্ব্বক পরমহংসদেবের অবস্থা তাঁহাদের বিদ্যা বুদ্ধির পরিমাণানুসারে স্থিরীকৃত করিয়া পরমহংসদেবকে উপদেশচ্ছলে বলিয়াছিলেন, "মহাশয়! আপনাকে একজন ভক্ত বলিয়া আমাদের বিবেচনা হইতেছে। কিন্তু আপনি কখন হরি হরি বলেন, আবার কখন কালী কালী বলিয়া নৃত্য করেন। এ প্রকার অন্ধভাবে না থাকিয়া কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আচার্য্যপ্রবর শ্রীমৎ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের শরণাপন্ন হউন, আপনার পরিত্রাণ হইবে এবং আপনি মুক্তিলাভ করিবেন। তাঁহার নিকট চতুর্ব্বর্গের ফল পাওয়া যায়।" পরমহংসদেব কোন ফলাকাঙ্ক্ষী নহেন বলিয়া কথাগুলির প্রতি কিছুই আস্থা স্থাপন না করায়, ব্রাহ্মেরা বিরক্ত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করেন।

কেশব বাবু প্রেরিত অনুচরবর্গ দক্ষিণেশ্বর হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক পরমহংসদেব সম্বন্ধীয় কথাগুলি আচার্য্যকে নিবেদন করিলে, তিনি সশিষ্যে অনতিবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। কেশব বাবুকে দেখিবামাত্র পরমহংসদেব তাঁহার মনের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন। তিনি তন্নিমিত্ত প্রথমেই ব্রহ্মশক্তি লইয়া বিচার করিতে প্রবৃত্ত হন। কেশব বাবুর বিশেষ গুণ ছিল যে, কুতার্কিক বা অবিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি তৎকালে নিরাকার ঈশ্বরই মানিতেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে, ঈশ্বর অরূপ, কখনই আকারবিশিষ্ট হইতে পারেন না। পরমহংসদেব বলিলেন যে, "শক্তি স্বীকার না করিলে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইতে পারে না।" কেশব বাবু শক্তি মানিতেন না এবং ব্রহ্মোপাসনায় উহা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া নিজ সরল বিশ্বাস যাহা, তাহাই কহিলেন। পরমহংসদেব অতঃপর বলিলেন, "তোমার এরূপ সংস্কার সম্পূর্ণ ভুল। ব্রহ্মের লক্ষণ কি? পঞ্চতত্ত্ব যথা পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু এবং আকাশ ও

পঞ্চতন্মাত্র যথা—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ইত্যাদির অতীত যে বস্তু, তাঁহাকে ব্রহ্ম কহে। কিম্বা, তিনি অদ্বিতীয়, নিরাকার, নির্ব্বিকার ও চিন্ময় স্বরূপ। তাঁহাকে জানিতে হইলে, তাঁহার সৃষ্টি বিশ্লিষ্ট করিতে হয়। সৃষ্টি তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং তিনিই করিয়াছেন। এই নিমিত্ত তিনিই উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। তাঁহার দ্বারা ও তাঁহা হইতে যগুপি সৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহা হইলে শক্তি স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, কেহ তাঁহাকে নির্গুণ বলে, গুণময় পদার্থ তাঁহার শক্তি হইতে উৎপন্ন হয়। বলিতে গেলে যদিও ব্রহ্ম ও শক্তি দুইটী কথা আসিয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। ব্রহ্ম বলিলে যাঁহাকে বুঝায়, শক্তি বলিলেও তাঁহাকেই নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। ব্রহ্ম শক্তিতে বিরাজিত অথবা শক্তি ব্রহ্মে নিহিত আছেন। এক পক্ষে, ব্রহ্মের অনন্ত শক্তি স্বীকার করা যায়, এবং অপর পক্ষে অনন্ত শক্তির সমষ্টিকে ব্রহ্ম কহা যায়। ব্রহ্মের একটী নাম সচ্চিদানন্দ। সৎ—সত্য বা নিত্য, চিৎ—জ্ঞান এবং আনন্দ—আহ্লাদ, অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য বা নিত্য স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ ও আনন্দ স্বরূপ। অতএব এই ত্রিবিধ ভাবের সমষ্টিই ব্রহ্ম। ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম শক্তি অভেদ। যেমন অগ্নি। অগ্নি বলিলে আমরা ইহার শক্তির ভাব অগ্রে উপলব্ধি করিয়া থাকি, যথা—উত্তাপ বর্ণঃ এবং দাহিকা শক্তি, অথবা এই শক্তিত্রয়ের সমষ্টিকে অগ্নি বলে। যগুপি ইহার শক্তিগুলি স্বতন্ত্র করা যায়, তাহা হইলে অগ্নি থাকিবে না। এস্থলে অগ্নি ও অগ্নির শক্তিবিশেষ যদিও দ্বৈত ভাবের পরিচায়ক হইতেছে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে, উহা একেরই অবস্থাবিশেষ। যেমন দুগ্ধ ও তাহার ধবলত্ব। দুগ্ধ যে বস্তু, ধবলত্ব তাহারই, তাহা দুগ্ধ ছাড়া নহে। যগুপি ব্রহ্ম শক্তি অভেদ হয়, তাহা হইলে ব্রহ্ম এবং শক্তি দুইটী স্বতন্ত্র শব্দে উল্লেখ করিবার হেতু কি? যেমন, এক ব্যক্তি লিখিতে পারে, পড়িতে পারে, নাচিতে পারে, গাইতে পারে, বাজাইতে পারে এবং চিত্র করিতে পারে। এ স্থানে ব্যক্তি এক, শক্তি নানাপ্রকার। সেইরূপ, যে সময়ে ব্রহ্মের অনন্ত শক্তির স্বতন্ত্রভাব প্রকাশিত হইতে দেখা যায়, তখনই ঐ শক্তিদিগের কোন প্রকার অবলম্বন স্বীকার করিতে হইবে। অবলম্বন না থাকিলে, শক্তি সকল কি প্রকারে অবস্থিতি করিয়া থাকে? এই নিমিত্ত সচ্চিদানন্দ শব্দের দ্বারা ব্রহ্মের অবস্থাটী সুন্দররূপে পরিজ্ঞাত হইয়া যাইতেছে। সৎ—নিত্য, এইটী ব্রহ্মপদবাচ্য। এ অবস্থাটী বাক্য মনের অতীত। নিত্য—এই শব্দটীর কি ভাব এবং আমরা বুঝিই বা কি? অনিত্য বস্তু দেখিয়া

আমরা যে ভাব লাভ করিয়া থাকি, তাহার বিপরীত ভাবকে নিত্য কহে, ইহা অনুমান করিবার বস্তুও নহে। চিৎ অর্থে জ্ঞান। এই চিৎ-শক্তি দ্বারা জগৎ উৎপত্তি হইয়াছে। জ্ঞান-শক্তিই সর্ব্ব প্রধান সৃষ্টির নিদান স্বরূপ। সাধারণ দৃষ্টান্তস্থলে একটী কাঠের পুতুল গৃহীত হউক। পুতুলটী কাঠের দ্বারা গঠিত। গঠন করিল কে? সেই ব্যক্তি, বা তাহার হস্ত, কিম্বা কোন যন্ত্রবিশেষ? বাটালি কিম্বা করাঁতকে কারণ বলা যায় না। অথবা কাঠকেও ঔৎপত্তিক কারণ বলিলে ভুল হয়। এস্থলে সেই ব্যক্তির জ্ঞানশক্তিকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। মিস্ত্রী, তাহার জ্ঞানশক্তির সাহায্যে একজাতীয় কাঠের নানা প্রকার গঠন করিতে পারে। গঠনের উপাদান কারণ কাঠ, সমবায় কারণ যন্ত্রাদি এবং নিমিত্ত কারণ মিস্ত্রীকে কহা যায়। এই চিৎশক্তি হইতে যাহা কিছু দেখিবার, শুনিবার, বলিবার ও উপলব্ধি করিবার আছে, ছিল বা হইবে, তৎসমুদয় চিৎ শক্তির অন্তর্গত। চিৎশক্তি হইতে সৎ বা নিত্যের প্রকাশ পাইয়া থাকে। যেমন উত্তাপ-শক্তি অগ্নির পরিচায়ক। উত্তপ্ততা না থাকিলে অগ্নি বলিয়া কে জানিতে পারিত? উত্তাপ-শক্তির দ্বারা যে প্রকারে অগ্নির অস্তিত্ব নিরূপিত হইল, চিৎশক্তির দ্বারা সেইরূপভাবে ব্রহ্ম নিরূপিত বা তাঁহাকে উপলব্ধি করা যাইতে পারে। যদিও এস্থলে সৎ বা ব্রহ্ম এবং চিৎ বা শক্তির মধ্যে ভেদ দেখান হইল, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ভেদ নাই, তাহা একেরই অবস্থাবিশেষ।

"ব্রহ্ম শক্তির ভেদাভেদ আরও সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। যেমন জলাশয়ের জল। জল যখন স্থির থাকে, তখন তাহাকে ব্রহ্ম বা সৎ অথবা পুরুষ কহা যায়, কিন্তু তাহাতে ঢেউ উঠিলে, চিৎ বা প্রকৃতির ভাব আসিয়া থাকে। যখন কোন কার্য্য নাই, সৃষ্টি নাই, তখন তিনি ব্রহ্ম বা অচল, অটল, সুমেরুবৎ। কার্য্য আসিলেই শক্তির খেলা বলিতে হইবে।

"ব্রহ্ম পুরুষ এবং শক্তি প্রকৃতি। কারণ, একের আশ্রয়ীভূত আর একটী, এই নিমিত্ত ব্রহ্ম পুরুষ এবং শক্তি প্রকৃতি বলিয়া উল্লিখিত। যেমন, বৃক্ষ পুরুষ ও তদ্বেষ্টিত লতা স্ত্রী শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। নৌকা ক্লীবলিঙ্গ, তন্মধ্যে আরোহী থাকিলে, উহা স্ত্রীলিঙ্গবাচক হইবে। তুমি একখানি চিত্রপট প্রস্তুত করিলে, চিত্রটী তোমার চিত্রকরা শক্তি হইতে তোমার দ্বারা জন্মিল, এই জন্য তুমি পুরুষ, তোমার চিত্রকরা শক্তি তোমার স্ত্রী এবং চিত্রটী সন্তান-বিশেষ। সেই প্রকার ব্রহ্ম পিতা, শক্তি মাতা এবং আমরা সন্তান স্বরূপ। অতএব ব্রহ্মোপাসনার প্রথমে শক্তির উপাসনা করা কর্ত্তব্য। কারণ, ব্রহ্ম

হইতে সৃষ্ট পদার্থ পর্য্যন্ত শক্তির ঐশ্বর্য্য বা অধিকার। যাহা লইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিবে, তৎসমুদায় শক্তির সম্পত্তি জানিবে। ব্রহ্মোপাসনায় উপযুক্ত হওয়া ও সেই অবস্থায় আনয়ন করিবার শক্তি, শক্তি ভিন্ন কাহারও শক্তি নাই। কারণ, যাহা বলিবে অথবা যাহা করিবে, তাহা শক্তির অন্তর্গত। ভক্তি শক্তির সম্পত্তি, ভাব ও প্রেম শক্তির সম্পত্তি, ফলে যে সকল উপকরণাদি লইয়া ব্রহ্ম পূজা করিবে, তাহা শক্তি ভিন্ন আর কাহারও নহে। শক্তি অতিক্রম করিয়া যে কাহারও ব্রহ্মোপাসনা হয় না, তাহার কারণ এই। ব্রহ্মোপাসনার যে সকল প্রণালী প্রচলিত আছে,তাহাতে কোন প্রকার ভাব অবলম্বন ভিন্ন সাধন কার্য্য হইতে পারে না। হয় পিতা পুত্র সম্বন্ধ, না হয় প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ, কোন স্থানে সৃষ্টিকর্ত্তা বা সৃজিত সম্বন্ধ এবং কোন স্থানে রাজা প্রজা সম্বন্ধ, এই সম্বন্ধগুলি সুন্দর বটে, কিন্তু স্থানে স্থানে ভাবের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। পিতা বলিলে মাতা চাই, সৃষ্টিকর্ত্তা বলিলে কর্ত্রী চাই, কারণ, কেবল কর্ত্তা একাকী সৃষ্টি করিতে পারেন না। কথায় বলে, মাকে দিয়ে বাপকে চেনা। মা নাই, বাপকে স্বীকার করিতেছি, ইহা যারপরনাই অস্বাভাবিক। এখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, উপরোক্ত ভাবে মাতৃ বা ঔৎপত্তিক স্থানটী ব্যবধান রহিয়াছে। অতএব ঐ মাতৃ স্থানটীই সকলের উৎপত্তির স্থল, উহাকে মা বলা যায়। ঐ মা বা চিৎশক্তি কেবল সৃষ্টিস্থিত বস্তু কেন, অবতার বল, রূপ বল, জ্যোতিঃ বল, সকলই প্রসব করিয়া থাকেন। এই জন্য

'অনন্ত রাধার মায়া কহনে না যায়,
কোটি কৃষ্ণ, কোটি রাম, হয় যায় রয়।'

বলিয়া উল্লেখ করা হয়। মুখে শক্তি অস্বীকার করিলে চলিবে না,শক্তি ব্যতীত কোন কার্য্যই হইতেছে না। দেখ জড় জগৎ, উহা কিরূপে চলিতেছে? শক্তিতে। দেখ সৌরজগৎ, উহাও শক্তিতে চলিতেছে। মনুষ্যগণ দেখিতেছে দর্শন শক্তিতে,আহার পরিপাক হইতেছে পাক শক্তিতে, কথা কহিতেছে বাক্ শক্তিতে এবং অনুভব করিতেছে স্পর্শ শক্তিতে। যে দিকে দেখ, কি বাহিরে, কি অভ্যন্তরে, কি ঊর্দ্ধে, কি অধোদেশে, শক্তির কার্য্য নাই, এমন স্থানই কুত্রাপি দেখা যাইবে না। মনোনিবেশ পূর্ব্বক চিন্তা করিয়া দেখ, অনায়াসে বুঝিতে পারিবে।

"যে শক্তিতে জগৎ সৃষ্ট হয়, কথিত হইয়াছে, তাহাকে চিৎশক্তি বা মায়া কহে। এই মায়া কার্য্যবিশেষে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। একটীকে

বিদ্যা-মায়া এবং অপরটীকে অবিদ্যা-মায়া কহে। বিদ্যা-মায়ার অন্তর্গত বিবেক এবং বৈরাগ্য ; কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য অবিদ্যা-মায়ার অন্তর্গত বলিয়া উল্লিখিত। জীবগণ যখন অবিদ্যা-মায়ায় অভিভূত থাকে, তখন তাহারা ঈশ্বর হইতে অনেক দূরে পতিত হইয়া যায়। তাহারা ষড়রিপুর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে এমনি বিমুগ্ধ ও পরাজিত হইয়া পড়ে যে, তাহারা আপনাদের বিস্মৃত হইয়া রিপুদিগের আয়ত্বাধীনে এককালে উৎসর্গীকৃত হইয়া যায়। মহাশক্তির উপাসনা করিলে রিপুগণ ক্রমে বিদূরিত হইয়া যায়, তখন মনোরাজ্যে বিবেক ও বৈরাগ্য আসিয়া অধিকার বিস্তার করে। তখন মন ভাবরূপ রাজপথ প্রাপ্ত হইয়া মহাভাবময়ী মহাশক্তির শক্তিতে ব্রহ্মে মিলিত হইয়া যায়। ব্রহ্ম ব্রহ্ম করিয়া ত দেখিয়াছ, কিছুই প্রাপ্ত হও নাই। একবার মা কিম্বা সচ্চিদানন্দময়ী অথবা ব্রহ্মময়ী বলিয়া ডাক দেখি, এখনি তাহার ধনে ধনী হইয়া যাইবে! যে ঈশ্বর-দর্শন এখন অদর্শন হইয়া রহিয়াছে, তাহা দর্শন করিবে, ভাবে নহে, প্রত্যক্ষ করিবে। যে ঈশ্বরকে অজ্ঞেয় বলিয়া বোধ করিতেছ, এ বোধ মায়িক মনে হইতেছে ; তাঁহার সহিত বাস্তবিক বিহার করিবে। যে ঈশ্বরকে জ্ঞানে নিরাকার বলিয়া সাব্যস্থ হইয়াছে, তাঁহাকে সাকার রূপে নিকটে পাইবে, স্পর্শ করিবে ; ভাবিতেছ, হয় কি না হয়? করিয়া দেখ। একবার অকপট চিত্তে বালকবৎ বুদ্ধিতে মা মা বলিয়া কাঁদিয়া দেখ। বল, কোথায় আনন্দময়ী! মা আনন্দঘনমূর্ত্তি দর্শন দিয়া আনন্দধামে লইয়া যাইবেন। তাঁহাকে চায় কে? পাছে তিনি আইসেন, পাছে তাঁহার দর্শনলাভ হয়, এই জন্য একেবারে তাঁহার রূপ উড়াইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিলে কি দেখা যাইবে? ঈশ্বর দর্শনের জন্য কাহার আকাঙ্ক্ষা আছে? কে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে বলিয়া সাধন ভজন করিয়া থাকে? ধন হইল না বলিয়া এক ঘটি কাঁদিবে, পুত্র হইল না বলিয়া দশ ঘটি কাঁদিবে, মান্য হউক বলিয়া কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিবে। কিন্তু ঈশ্বর লাভের জন্য বল দেখি এক ফোঁটা চক্ষের জল কেহ কখন কি ফেলিয়াছ? যে কাঁদিয়াছে, যে প্রাণ ভরিয়া ডাকিয়াছে, তাহার নিকটে তিনি প্রকাশিত হইয়া আছেন। সে প্রাণে প্রাণে তাঁহার রসাস্বাদন করিতেছে। যদ্যপি দেখা দাও বলিয়া বারো ক্ষণ, বারো দিন, বারো মাস, অথবা বারো বৎসর (এতদ্দ্বারা অনুরাগের তারতম্য দেখাইয়াছেন) কাঁদ, অবশ্যই দেখা পাইবে, তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

"শক্তির কোন বিশেষ একটী নাম নাই। কেহ কালী বলে, কেহ রাধা

বলে, কেহ বা মা বলিয়া ডাকে। শক্তি এক, তাঁহার নাম অনন্ত। যে কথায়, যে বর্ণে বা যে ভাবে তাঁহাকে ডাকা হয়, তাহা একেরই জানিবে। শাস্ত্রে তাঁহাকে পঞ্চাশদ্বর্ণ-রূপিণী বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, জগতে যত প্রকার বর্ণ আছে, যদ্দ্বারা আমাদের মনোভাব ব্যক্ত করিয়া থাকি, তৎ-সমুদায় বর্ণ দ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই মহাশক্তিকে যে কোন নামে বা যে কোন ভাবে মনঃসংযোগ করিয়া ডাক, অন্তর্যামিনী সেই মুহূর্ত্তে মনোভীষ্ট পূর্ণ করিয়া দিবেন।" পরমহংসদেব এইরূপ নানাবিধ উপদেশ দ্বারা কেশব বাবুকে শক্তি স্বীকার করাইয়া লইয়াছিলেন।

ব্রহ্মোপাসনায় কি জন্য শক্তি-সাধন আবশ্যক, তাহা পরমহংসদেব এই রূপ কহিয়াছেন। মনুষ্যগণ যাহা দেখিতে পায়, অথবা যাহা অনুভব করিতে পারে, তদ্দ্বারা সেই বস্তু বা ভাব যে প্রকার হৃদয়ঙ্গম হইবার সম্ভাবনা, কেবল উদ্দেশ্যে সেরূপ হয় না। ভাব চাই, ভাব ব্যতীত সকল বস্তুই শূন্য ও অন্ধকার-ময়। আমরা বাল্যকালাবধি শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর, এই পঞ্চ ভাব পরিবার মধ্যে শিক্ষা করিয়া থাকি। এইরূপ ভাবশিক্ষা মনুষ্য-স্বভাবসিদ্ধ। শান্ত, দাস্য ও সখ্যভাব প্রায় মনুষ্যমাত্রেরই আছে। বাৎসল্য ও মধুর কাহার নাও থাকিতে পারে। শান্ত ও দাস্যভাব পিতা মাতার ও অন্যান্য গুরুজনের নিকট শিক্ষা করা যায় অথবা তাঁহাদের প্রতি মনুষ্যের স্বাভাবিক যে শ্রদ্ধা ভক্তির ভাব প্রদর্শিত হয়, তাহাকে শান্ত ও দাস্যভাব কহে। বয়স্য ও ভ্রাতা ভগিনীর সহিত সখ্যভাব, বাৎসল্য ভাব সন্তান সন্ততির প্রতি এবং মধুরভাব স্বামী ও স্ত্রীতে লক্ষিত হইয়া থাকে।

কথিত হইল যে,পিতা এবং মাতার প্রতি সন্তানের শান্ত ও দাস্যভাব বিক-শিত হইয়া থাকে; কিন্তু পিতা সন্তানের মঙ্গল কামনায় কিঞ্চিৎ কর্কশ ব্যব-হার করিয়া থাকেন এবং জননীর অপেক্ষা তাঁহার স্নেহ অল্প, তাহার সন্দেহ নাই। জননীর ভাব সেরূপ নহে। সন্তান যতই দোষের দোষী হউক, তাঁহার চক্ষে নির্দ্দোষী বলিয়া পরিগণিত। মাকে একবার মা বলিয়া ডাকিলে সন্তানের মনে যেমন শান্তি হয়, মাও তেমনি আনন্দিত হইয়া থাকেন। তথায় ভয়ের লেশমাত্র থাকে না; কিন্তু পিতা বলিলে সে প্রকার ভাব হয় না। মাতার নিকট দোষ স্বীকার করিতে ভয় হয় না, কিন্তু পিতার নিকটে অপরাধী সন্তান অগ্রসর হইতেই অসমর্থ হয়, দোষ স্বীকার করিবে কি? এই নিমিত্ত মাতৃভাবের সাধনই উত্তম। মাতৃভাবের সাধনের আরও হেতু আছে। মনুষ্য-

চিত্ত স্বভাবতঃ দুর্ব্বল। নারীর কথা হইলেই কুৎসিৎ ভাবের উদ্রেক হইয়া মনকে একেবারে নিকৃষ্ট পশুবৎ করিয়া তুলে। সখ্যভাবেও মনের সমতা রক্ষা করা যায় না। কিন্তু মাতৃভাবে সে প্রকার দোষ ঘটিতে পারে না। মাতৃভাবে ঈশ্বর-সাধনা করিলে মন ক্রমে উচ্চগামী হয় এবং পৃথিবীর বিশেষ আকর্ষণী কামিনী হইতে রক্ষা পাইয়া থাকে।

কেশব বাবু মধ্যে মধ্যে অবসর ক্রমে পরমহংসদেবের নিকট গমন করিতে লাগিলেন এবং ভূরি ভূরি জীবন্ত দৃষ্টান্তের দ্বারা ও ব্রহ্মতত্ত্ববিষয়ক নিগূঢ় ভাব সকল হৃদয়ের স্তরে স্তরে স্থাপন করিয়া তদনুরূপ আপনাকে প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কখন তর্ক করিতেন না, অথবা কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেন না, অবাক্ হইয়া শুনিয়া যাইতেন।

কেশব বাবুকে এইরূপে উপদেশ দিয়া তাঁহাকে আর এক ছাঁচে ঢালি-লেন। কেশব ঈশ্বরকে দয়াময় করুণাময় বলিয়া জানিতেন, এক্ষণে মা শব্দ বলিতে শিখিয়া, নিরস, শুষ্ক, নিরাকার ব্রহ্ম হইতে রসাল মাতৃ ভাব পাইলেন। তিনি তদবধি মাতৃ ভাবে উপাসনা করিতেন। তিনি এত দিনে ব্রহ্ম এবং ঈশ্বরের প্রভেদ বুঝিলেন। ব্রহ্ম যে বলিবার কিম্বা ভাবিবার বস্তু নহে, তাহাও তিনি জ্ঞাত হইলেন। তিনি সেই জন্য চিদ্‌ঘন রূপের অনুবর্ত্তী হইয়া ভজনা-নন্দ সম্ভোগ আরম্ভ করিলেন।

পরমহংসদেব যখন দেখিলেন যে, কেশব বাবু শক্তির রসাস্বাদন পাইয়াছেন, তখন তিনি বলিলেন যে, ভগবান্, ভাগবত ও ভক্ত, তিনই এক। অর্থাৎ যিনি ভগবান্, তিনিই ভাগবত ও তিনিই ভক্ত। কেশব বাবু এই কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। অদ্য কেশব বাবুর মহা পরীক্ষার দিন। যাঁহারা ঈশ্বর এবং জীব স্বতন্ত্র বলিয়া স্বতন্ত্র দলের সৃষ্টি করিয়াছেন, যাঁহারা সর্ব্বত্রে ঈশ্বরজ্ঞানকে বহু ঈশ্বরবাদী বলিয়া একেশ্বরবাদের আড়ম্বর করিয়া থাকেন, আজ সেই গর্ব্বিত ধর্ম্মদ্বেষীদিগের সন্ধিকাল উপস্থিত। কেশব বাবু কোন কথা কহিলেন না। পরমহংসদেব কহিতে লাগিলেন, ভগবান্, ভাগবত ও ভক্ত, তিনকে এক বলিবার উদ্দেশ্য এই। ঈশ্বরকে ভগবান্ কহে, তাঁহার গুণানুবাদ যাহাতে বর্ণিত আছে, তাহাকে ভাগবত ও সেই ভাগবতীয় ভাব যাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তাহাকে ভক্ত বলে। ভক্তের অবস্থা সাধকের ন্যায় নহে। কারণ সাধকাবস্থায় কেমন করিয়া লীলা-রসময়কে হৃদয়ে ধারণ করি-বেন, সাধকের এইমাত্র চেষ্টা থাকে। পরে যখন ভগবান্ ভক্তের হৃদয়ে প্রবেশ

করেন, তথায় তিনিই তাঁহার বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া, তখন সেই ভক্তের হৃদয়-মধ্যে কার্য্য করিয়া থাকেন। সুতরাং, ভগবানের স্ব-স্বরূপের অবস্থার সহিত তাঁহার ভক্তহৃদয়বিহারকালীন অবস্থার কোন প্রভেদ থাকে না। যেমন, মূর্খের ভিতর পাণ্ডিত্য শক্তি জন্মিলে তাহাকে পণ্ডিতই বলিতে হইবে। পূর্ব্বে মূর্খাবস্থা ছিল বলিয়া চিরকাল তাহাকে সেই আখ্যায়ে পরিচিত হইতে হয় না।

ভক্তেরা ঈশ্বরকে পরমাত্মীয় জ্ঞান করিয়া থাকেন, এমন কি তাঁহাকে তাঁহাদের জীবনের জীবন স্বরূপ, আত্মার পরমাত্মা স্বরূপ স্থির করিয়া থাকেন। তাঁহার পাদপদ্মে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া, আহারে, বিহারে, শয়নে, স্বপনে, সকল সময়েই তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া তাঁহাতেই বিলীন হইয়া থাকেন। যেমন কোন ব্যক্তি বাতাহত হইয়া সমুদ্রতরঙ্গে নিপতিত হইলে আপনাকে স্রোতের বিপক্ষে পরিচালিত করিতে পারে না। তাহাকে তাহার গত্যনুযায়ী ইতস্ততঃ ভাসিয়া যাইতে হয়; চিদানন্দসাগরে পতিত হইলে ভক্তদিগেরও সেইরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে। ভক্তেরা অগত্যা তাঁহার ইচ্ছার প্রতি নির্ভর করিতে বাধ্য হয়। এ প্রকার আত্মনিবেদিত ভক্তের যাবতীয় কার্য্য স্বয়ং ভগবান্‌কেই সম্পন্ন করিতে হয়। যেমন কোন ব্যক্তিকে কেহ অভিভাবক জ্ঞান করিলে, তাহার সকল কার্য্যেই তিনি উপস্থিত থাকিয়া আশ্রিত ব্যক্তিকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। কিন্তু যদ্যপি সেই আশ্রিত ব্যক্তি মৌখিক অভিভাবক স্বীকার করে এবং আপন ইচ্ছাক্রমে কার্য্য সমাধা করিয়া লয়, তাহা হইলে অভিভাবক সে আশ্রিতের কোন কার্য্যেই হস্তনিক্ষেপ করিতে চাহেন না। কপট ভক্তদিগের এই প্রকার দুর্দ্দশা হইয়া থাকে।

যেমন, কোন রাজসরকারের একটী ভৃত্য আছে। ভৃত্যটী রাজার বিশেষ অনুগত, বিশ্বাসী এবং প্রিয়। কিছু দিন পরে সেই ভৃত্যের বাটীতে কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে, রাজাকে লইয়া যাইবার জন্য তাহার মনে মনে বিশেষ আগ্রহ জন্মিল। স্বল্পবেতনভোগী ভৃত্য, বাটীতে উত্তম স্থান না থাকায় অথবা কোন উপায় না দেখিয়া ইতস্ততঃ চিন্তা করিয়া রাজার কোন প্রিয়তম কর্ম্মচারীর নিকট আপন মনোভাব অতি দীনভাবে প্রকাশ করিল। সেই কর্ম্মচারী ভৃত্যের দীনতা দেখিয়া নিতান্ত প্রীতি লাভ করিলেন এবং যাহাতে এই কথা মহারাজের কর্ণগোচর করিতে পারেন, এরূপ সুবিধা অন্বেষণ করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে তিনি তাহাতে কৃতকার্য্যও হইলেন। ভৃত্যের বিনয়ে

রাজা পূর্ব্ব হইতেই সন্তুষ্ট ছিলেন। এ প্রস্তাব হইবামাত্র তিনি দ্বিরুক্তি করিলেন না। ভৃত্যের অবস্থা রাজার অবিদিত ছিল না। তাঁহার গমনের নিমিত্ত যে সকল দ্রব্যাদির প্রয়োজন হইবে, তাহা রাজসরকার হইতে আয়োজন হইবার জন্য আজ্ঞা দিলেন। রাজার এই আজ্ঞা প্রকটিত হইবামাত্র, সেই ভৃত্যের বাটীতে লোক প্রেরিত হইল। তাহারা প্রথমে অরণ্য পরিস্কার, তদনন্তর শিবির সংস্থাপন, রাজাসন সুসজ্জিত ও ভোজনের আয়োজন করিতে লাগিল। পরে নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাজা স্বজন সমভিব্যাহারে ভৃত্যের বাটীতে আসিয়া উপবেশন করিলেন। ভক্ত সম্বন্ধেও তদ্রূপ। ভৃত্যরূপ উপাসক সেই রাজাধিরাজ মহাপ্রভুর রাজসরকারে বিশ্বাসী, বিনয়ী এবং অভিমানশূন্য হইলে সাধুভক্তরূপ প্রিয় কর্ম্মচারীদিগের অনুরাগভাজন হইবেন। সাধুদিগের কৃপা হইলে ভগবানের কৃপা হইয়া থাকে। তখন তাঁহার নিকট যাহা অনুরোধ করা হয়, তাহা তিনি রক্ষা করেন। উপাসকের হৃদয়ের কথা এই যে, হৃদয়েশ্বরকে হৃদয়মাঝে বসাইয়া হৃদয় ভরিয়া তাঁহাকে দেখিয়া লইবেন। রাজরাজেশ্বরের নিকট উপাসকের মনোভাব পৌঁছিবামাত্র, অন্তরারণ্য পরিষ্কার হইবার ব্যবস্থা হইতে আরম্ভ হয়। তখন কাম, ক্রোধ প্রভৃতি কণ্টক বৃক্ষ সকল উৎপাটিত হইয়া রত্নবেদী স্থাপিত হয়। প্রেম ভক্তিরূপ ভোজ্য পদার্থ সকল রাজভাণ্ডার হইতে প্রেরিত হইতে থাকে। কালক্রমে রাজাধিরাজ ভৃত্যের হৃদয়-কুটীরে আগমন পূর্ব্বক হৃদয়-মন্দিরস্থ রত্নবেদীর উপরে উপবেশন করেন এবং সকল কার্য্যই আপনি সম্পন্ন করিয়া থাকেন। অতএব ভক্ত ও ভগবানের এইরূপ তাৎপর্য্য হইলে, এতদুভয়ের কোন প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। এক্ষণে ভগবানের সহিত ভাগবতের কোন প্রার্থক্য আছে কি না, দেখিতে হইবে।

জীবগণ সচরাচর ত্রিবিধ অবস্থায় অবস্থিতি করিয়া থাকে। যখন তাহারা মন সংযম করিয়া ধ্যানে নিমগ্ন হয়, তখন তাহাদিগকে ঈশ্বরান্তর্গত কহা যায়। কেন না, সে সময়ে তাহাদের অহঙ্কার, মন এবং বুদ্ধির কোন প্রকার কার্য্য থাকে না। ধ্যান ভঙ্গ হইলে, মন রক্ষার দ্বিতীয় উপায় ভাগবত অর্থাৎ যাহাতে ঈশ্বরের মহিমা এবং গুণকীর্ত্তনাদি বর্ণিত আছে। এ অবস্থায় মন বুদ্ধি এবং অহঙ্কার ভগবানের লীলারস পানে বিভোর হইয়া পড়ে। সুতরাং অন্যদিকে তাহারা ধাবিত হইতে পারে না। ধ্যানকালীন মনের অবস্থা যে প্রকার, ভাগবত বৃত্তান্ত তদন্ত সময়েও মনের অবস্থা সেই প্রকার হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত এতদুভয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই বলিয়া ব্যক্ত করা

যায়। ভক্ত-স্বভাব স্বতন্ত্র প্রকার। তাঁহারা একাকী নির্জ্জন স্থানে সদা সর্ব্বদা বাস করিতে পারেন না অথবা চাহেন না। তজ্জন্য সময়ে সময়ে ভক্তসমাজে আসিয়া মিলিত হইয়া থাকেন। ভক্তদিগকে দেখিলে ভগবান্‌কে স্মরণ হয়, তাঁহার ভাব সকল ক্রমান্বয়ে মনোমধ্যে উদ্দীপিত হইয়া যায়। যেমন শোলার আতা দেখিলে সত্যের আতা মনে হয়, উকীলদের দেখিলে আদালতের কথা স্মরণ হয়, তেমনি ভক্ত দেখিলে ঈশ্বরের ভাবই আসিয়া থাকে। এই রূপে শরীরের অবস্থান্তর সংঘটিত হইলেও মনের এক অবস্থা অনায়াসে সংরক্ষিত হইতে পারে; অর্থাৎ ধ্যানে ভগবান্, ভাগবত-রূপে ভগবান্ এবং ভক্তরূপেও ভগবান্, মনের অবস্থা বিচারে একাবস্থা নিরূপিত হইতেছে। এইজন্য ভগবান্, ভাগবত ও ভক্ত এক বলা যায়।

একদা গোকুলকুলরাজ্ঞী যশোদা গোকুলবিহারী গোপালের কোন সংবাদ না পাইয়া প্রেমময়ী রাধার নিকট গমন পূর্ব্বক জিজ্ঞসা করিলেন, "মা গো! তুমি আমার গোপালের কোন সংবাদ জান কি?" মহাভাবময়ী তখন ভাবে নিমগ্ন ছিলেন। যশোদার কথা তাঁহার কর্ণগোচর হইল বটে, কিন্তু মনের নিকট অগ্রসর হইতে পারিল না। যখন যোগমাতার যোগ ভঙ্গ হইল, তিনি সম্মুখে নন্দরাণীকে দণ্ডায়মান দেখিয়া তৎক্ষণাৎ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণিপাত করিলেন এবং সহসা কি জন্য আগমন করিয়াছেন, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। যশোদা তদ্বিবরণ নিবেদন করিলে পর, শ্রীমতি তাঁহাকে নয়ন মুদ্রিত করিয়া গোপালের রূপ চিন্তা করিতে কহিলেন। যশোদা নয়ন মুদ্রিত করিবামাত্র মহাভাবময়ী তাঁহাকে মহাভাবে অভিভূত করিয়া ফেলিলেন। তিনি ভাবাবেশে গোপালকে দেখিতে লাগিলেন। গোপালরূপ দর্শন করিয়া যখন ভাবভ্রষ্ট হইলেন, তখন শ্রীমতির নিকটে এই বর প্রার্থনা করিলেন, "মা! আমি যেন নয়ন মুদ্রিত করিলেই গোপালকে দেখিতে পাই। একাকিনী থাকিলে যেন আমার জিহ্বা গোপাল নাম জপ করিতে পারে এবং লোকালয়ে যাইলে যেন গোপালেরই স্ব-গণকে দেখিতে পাই।"

পরমহংসদেব এইরূপ নানাবিধ দৃষ্টান্ত প্রদান পূর্ব্বক কেশবচন্দ্রকে ভগবান্, ভাগবত ও ভক্ত বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি যখন কোন উপদেশ প্রদান করিতেন, তাহার সহিত আর একটী পদার্থ মিশ্রিত থাকিত। সেই পদার্থের মোহিনী শক্তির দ্বারা সকলেই বিমোহিত হইয়া যাইতেন। সেই শক্তি কেবল তাঁহারই ছিল। উপদেশ অনেকেই দিয়া থাকেন, কিন্তু তাহার সাময়িক

কার্য্যও কদাচিৎ হইতে দেখা যায়। এই মোহিনী শক্তিতে কেশব বাবু পরাজিত হইয়া ভগবান্, ভাগবত ও ভক্ত স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। পরমহংসদেব তদনন্তর কৃষ্ণ, গুরু এবং বৈষ্ণব, তিনই এক, এই কথা স্বীকার করিতে বলেন, তাহাতে কেশব বাবু বিনীত ভা বে বলিয়াছিলেন, এক্ষণে উহা পারিব না।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

ভগবান্‌কে ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু বলিয়া ভক্তেরা উল্লেখ করেন, সে কথাটী তাঁহাদের প্রত্যক্ষ সিদ্ধান্তের ফল। তাঁহার নিকটে যে যাহা চায়, তিনি তাহাকে তাহাই দিয়া থাকেন। মাতা যেমন সন্তানের আব্দার ভাল মন্দ বিচার না করিয়া, স্নেহবশে তৎক্ষণাৎ অভিলষিত দ্রব্য প্রদান করিয়া তাহার আনন্দ বর্দ্ধন করেন, ভক্ত-বৎসল ভগবান্‌ও তাহাই করিয়া থাকেন। কেশব বাবু ঈশ্বরতত্ত্ব লাভের জন্য বাস্তবিক জাতি, কুল, মর্য্যাদা ও নিজ সামাজিক উন্নতি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি যথার্থই ঈশ্বর-প্রেমরস পান করিবার জন্য আপনাকে উৎসর্গীকৃত করিয়াছিলেন। তিনি প্রাণের আবেগে, মনের উচ্ছ্বাসে যে তত্ত্বকথামৃত লাভেচ্ছায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেন, তাহার কিছুমাত্র সংশয় নাই। কার্য্য দেখিলেই কারণ বুঝা যায়। তাঁহার হৃদয় মরুভূমিপ্রায় ছিল, তাঁহার মন নিরাকার ভাবিয়া একেবারে অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়াছিল এবং এক পথে যাইতে বিপরীত পথে যাইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি যদিও ক কে খ বলিয়াছেন এবং আমকে আমড়া বলিয়াছেন, কিন্তু সকল কথায় তাঁহার সরল ও সহজ ভাবের আভাস পাওয়া যাইত। এই গুণে ব্রাহ্মসমাজনেতা পরমহংসদেবের কৃপা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার সরল প্রকৃতি ও সত্যানুসন্ধিৎসু চিত্ত ছিল বলিয়া "পরমহংসের জীবন হইতেই ঈশ্বরের মাতৃভাব *

* পরমহংসদেবের তিরোভাবের পর নববিধানসংক্রান্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ১৮৮৬ সালের সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবরের ইণ্টারপ্রিটার নামক ইংরাজী মাসিক পত্রিকার ৮৭ পৃষ্ঠায় তাঁহার সম্বন্ধে এক অদ্ভুত প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন। এই প্রকার অস্বাভাবিক মত পরিবর্ত্তনের হেতু কি, তাহা আমরা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। তিনি লিখিয়াছেন— "He did not bring the idea (God as our mother) into the church, it was

ব্রাহ্মসমাজে সঞ্চারিত হয়। সরল শিশুর ন্যায় ঈশ্বরকে সুমধুর মা নামে সম্বোধন এবং তাঁহার নিকট শিশুর মত প্রার্থনা ও আব্দার করা, এই অবস্থাটী পরমহংস হইতেই আচার্য্যদেব বিশেষরূপে প্রাপ্ত হন। পূর্ব্বে ব্রাহ্মধর্ম্ম শুষ্ক তর্ক ও জ্ঞানের ধর্ম্ম ছিল। পরমহংসের জীবনের ছায়া পড়িয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে

there before the minister's aquaintance with him." নববিধানের "মাতৃভাব পরমহংসদেব হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, তাঁহার সহিত আচার্য্যের পরিচয় হইবার পূর্ব্বে তাহা বর্ত্তমান ছিল।" But he by his childlike Bhakti, by his strong conception of an ever ready motherhood, helped to unfold it in our minds wonderfully." "কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁহার প্রগাঢ় মাতৃভাব এবং বালকবৎ ভক্তির পরাক্রমে আমাদের মাতৃভাব আশ্চর্য্য রূপে বিকশিত হইতে সাহায্য হইয়াছিল।" "His mother was realized as an imaginary Hindu Deity, our mother was purely spiritual." হিন্দুদিগের কাল্পনিক ঈশ্বরকে তিনি মাতৃভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের মাতৃজ্ঞান বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক ছিল।" "But he undoubtedly intensified and vivified our conception, we as undoubtedly spiritualized his," "কিন্তু তাঁহার দ্বারা আমাদের মাতৃভাবের ধারণা নিশ্চিৎ জীবিত এবং প্রগাঢ় হইয়াছিল। আমরা তাঁহার মাতৃভাবকে আধ্যাত্মিক ভাবে পরিণত করিয়াছিলাম।" "His conceptions were all mythological, our conceptions were purely monotheistic" "তাঁহার সমুদয় ধারণা কাল্পনিক দেবদেবীর ভাবে পরিপূর্ণ ছিল; আমাদের ধারণা বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ।" "By associating with him we learnt better Divine attributes as scattered over the 330 millions of Deities of mythological India. the God of the Purans. By associating with us he learnt to realize better the undivided Deity, the God of the Upanishad, the Akhanda Sachchidananda," "তাঁহার সংসর্গে পৌরাণিক ভারতের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ঈশ্বরের প্রকৃতি, যাহা তেত্রিশ কোটি দেবদেবী বলিয়া উল্লিখিত, তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে ধারণা করিতে শিক্ষা করিয়াছি; আমাদের সহবাসে তিনি উপনিষদের অখণ্ড সচ্চিদানন্দের ভাব উপলব্ধি করিতে শিক্ষা করিয়াছেন।" তত্ত্বমঞ্জরী ১৮০৮ শক, ২য়ভাগ, ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা ৭১পৃষ্ঠা। কিন্তু এই মহাত্মা কর্ত্তৃক ১৮৭৯ সালের থিষ্টিক কোয়াটার্‌লী রিভিউ নামক পত্রিকার ৩০ পৃষ্ঠায় যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহা উদ্ধৃত করা যাইতেছে। "What is his religion ? It is Hinduism but Hinduism of a strange type. Ramkrishna Paramhansa, for that is the saint's name, is the worshipper of no particular Hindu God. He is not a Shivite, he is not a Shakta, he is not a Vaishnava, he is not a Vedandist. Yet he is all these. He worships Shiva, he worships Kali, he worships Rama, he worships Krishna and is a confirmed advocate of Vedantist

সরস করিয়া ফেলে।" ধর্ম্মতত্ত্ব ১৮০৯ শক, ১লা আশ্বিন, ১৯৫ পৃষ্ঠা ৮ লাইন। কেশব বাবুর ভিতর স্বচ্ছ ও পরিষ্কার না থাকিলে, পরমহংসদেবের ছায়া কখনই পতিত হইতে পারিত না। এক দিকে কেশব বাবু এবং তাঁহার সম্প্রদায় পরমহংসদেব হইতে যেরূপে তাঁহাদের অবস্থানুরূপ ধর্ম্ম গঠন করিতে হয়, তাহার বিশেষ সুবিধা পাইলেন। পরমহংসদেবও কেশবের ন্যায় বুদ্ধিমান্,

doctrines. He is an idolator and is yet a faithful and most devoted meditator of the perfections of the one formless, infinite Deity, whom he terms, Akhanda Sachchidananda." "তাঁহার ধর্ম্ম কি? হিন্দুধর্ম্ম, কিন্তু ইহা এক আশ্চর্য্য প্রকার হিন্দুধর্ম্ম। সাধু রামকৃষ্ণ পরমহংস কোন বিশেষ হিন্দু দেবতার উপাসক নহেন। তিনি শৈবও নহেন, শাক্তও নহেন, বৈষ্ণবও নহেন এবং বৈদান্তিকও নহেন। কিন্তু এ সকলই তিনি। তিনি শিবের উপাসনা করেন, কালীর উপাসনা করেন, রামের উপাসনা করেন, কৃষ্ণের উপাসনা করেন, এবং বেদান্ত মতের দৃঢ় সমর্থনকারী। তিনি একজন পৌত্তলিকও বটেন, কিন্তু অদ্বিতীয় নিরাকার এবং অনন্ত ঈশ্বরের পূর্ণত্বের একান্ত উৎসর্গীকৃত অনুরক্ত ধ্যাতা, যাঁহাকে তিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বলিয়া অভিহিত করেন।" "To him each of these deities is a force, an incarnated principle tending to reveal the supreme relation of the soul to that eternal and formless Being who is unchangable in his blessedness and light of wisdom." "তাঁহার নিকট এই প্রত্যেক দেবতাই সেই সনাতন চিদানন্দ এবং নিরাকার সত্বার সহিত মানবাত্মার মহোচ্চ সম্বন্ধ আবিষ্কারক একটী শক্তি এবং আকারে পরিণত তত্ত্ব।" "These incarnations, he says, are but the forces (Shakti) and dispensations (Leela) of the eternally wise and blessed (Akhanda Sachchidananda) who never can be changed, nor formulated, who is one endless and everlasting ocean of light, truth and joy." "তিনি বলেন যে, এই সকল অবতার সেই অনন্ত জ্ঞানময় এবং করুণানিদান অখণ্ড সচ্চিদানন্দের লীলা এবং শক্তি. যিনি পরিবর্ত্তন এবং নিরাকরণহীন, যিনি অদ্বিতীয়, অসীম এবং অখণ্ড সৎ চিৎ এবং আনন্দের সমুদ্র।" "He would sometimes say, the incarnations forsook him, his mother the Vidyashakti Kali stood at a distance. Krishna could not be realized by him, either as Gopal the child. or swami, the lord of the heart and neither Rama nor Mahadev would offer him much help. The *nirakar* Brahma would swallow everything and he would be lost in speechless devotion and rapture." "তিনি কখন কখন বলেন যে, রূপাদি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতেছে। তাঁহার মাতা বিদ্যাশক্তি কালী দূরে আছেন, কৃষ্ণকে বাৎসল্য ভাবে গোপালরূপে অথবা মধুরভাবে স্বামীরূপে অনুভব করিতে পারিতেছেন না। রাম কিম্বা মহাদেবও তাঁহাকে সাহায্য করেন না। নিরাকার

বিচক্ষণ, ভক্তিপরায়ন লোক সে পর্য্যন্ত আর দ্বিতীয় প্রাপ্ত হন নাই। তিনি যাহা বলিতেন, যে ভাবে কথা কহিতেন, তাহা কেশব বাবু সমুদায় বুঝিতে পারিতেন কি না, জানি না; কিন্তু আপন ভাবেই হউক, অথবা অন্য কোন ভাবে গঠিত করিয়াই হউক, তাহা আয়ত্ব করিয়া লইতেন; বাক্ বিতণ্ডা করিয়া নিজ মত কখন প্রবল করিতে চেষ্টা করিতেন না, কিম্বা ইহা কখন মনেও স্থান দিতেন না। যখন কোনও মতে বুঝিতে না পারিতেন, তখন পরমহংসদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়া লইতেন। এই নিমিত্ত পরমহংসদেব কেশবের সহিত বাক্যালাপ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইতেন। ফলে, কেশব বাবু হইতেই পরমহংসদেব এক প্রকার প্রচার কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন।

পরমহংসদেব কখন কখন ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া উপাসনাদি শ্রবণ করিয়া যাইতেন। একদা উপাসনান্তে পরমহংসদেব কেশব বাবুকে ডাকিয়া কহিয়াছিলেন, "কেশব! তুমি বলিলে যে, ভক্তি-নদীতে প্রীতি কমল প্রস্ফুটিত হইলে—ভাল জিজ্ঞাসা করি, নদীতে কি কখন পদ্ম ফুটিতে দেখিয়াছ? পুষ্করিণীতে কিম্বা আবদ্ধ জলাশয়ে পদ্ম জন্মে। কোন্ নদীতে পদ্ম দেখিয়াছ? অতএব এ উপমাটী অসংলগ্ন হইয়াছে। আর এক কথা তুমি বলিয়াছ যে, ভক্তি-নদীতে ডুব দিয়া চিদানন্দ সাগরে চলিয়া যাও। ইহা তোমার কি ভাব? নদী সকল সাগরের সহিত মিলিত হইয়া আছে, কিন্তু তুমি নদীতে ডুব দিয়া সাগরে যাইবে কিরূপে? একবার ডুবিয়া দেখ দেখি, যাইতে পার কি না? পশ্চাতে যে পায়ে দড়ি বাঁধিয়া পুত্র

ব্রহ্ম সমুদায় গ্রাস করিয়া ফেলে এবং তিনি নির্ব্বাক আনন্দ এবং ভক্তিরসে নিমগ্ন হইয়া যান।" "But so long as he is spared to us, gladly shall we sit at his feet to learn from him the sublime precepts of purity, unworldliness, spirituality and inebriation in the love of God." "কিন্তু যতদিন তিনি আমাদের নিকট জীবিত আছেন, আমরা আনন্দের সহিত তাঁহার চরণতলে উপবেশন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে পবিত্রতা, বৈরাগ্য, চিরবাসনাশূন্য আধ্যাত্মিকতা এবং ভগবৎপ্রেমোন্মত্ততা সম্বন্ধীয় অত্যুচ্চ উপদেশ শিক্ষা করিব।" তত্ত্বমঞ্জরী ১৮০৮ শক, ২য় ভাগ, ষষ্ঠ ও সপ্তম সংখ্যা, ১১৬ পৃষ্ঠা। প্রতাপ বাবু পরমহংসদেবের জীবদ্দশায় তাঁহাতে ধর্ম্মের সকল ভাবই দেখিয়াছিলেন, কিন্তু পরলোক যাত্রার পর তাঁহাকে একটী কিম্ভুত কিমাকার ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। এ প্রকার সত্য অপলাপ করিবার হেতু কি? তাঁহার ভাব হইতে নববিধান গ্রহণ করা হইয়াছে, এ কথা পাছে প্রকাশ হইয়া পড়ে, সেই জন্য আপনাদের সুবিধা মত তাঁহাকে বর্ণনা করা হইয়াছে, এ কথা ভিন্ন আর কি বলা যাইবে?

পরিবার দাঁড়াইয়া আছে, তাহা ভুলিয়া গিয়াছ? যদি বল যে, নদীতে আসিয়া শরীর স্নিগ্ধ হইয়াছে, এখন গাত্রদাহ নিবারণ হওয়ায় বল পাইয়াছি, ডুব দিয়া দড়ি কাটিয়া পলাইয়া যাইব, কিন্তু তাহা পারিবে না। যাহাদের সঙ্গে করিয়া আনিয়াছ, (তথাকার উপস্থিত মহিলাদিগকে দেখাইয়া) ওঁদের দশা কি হইবে? সংসারে থাকিয়া যত দিন ঈশ্বর-সাধন করিবে, ততদিন একেবারে ডুব দিয়া সাগরে না যাইয়া এক একবার নদীর কিনারায় উঠিও।"

পরমহংসদেবের উপদেশ সকল নিতান্ত কঠোর ও রসহীন নহে। তিনি নিজে রসিকচূড়ামণি ছিলেন, সেইজন্য তাঁহার এক একটী উপদেশ রসে ঢল ঢল করিতে থাকে। একদিন কেশব বাবুকে দক্ষিণেশ্বরে রজনী যাপন করিবার জন্য পরমহংসদেব আজ্ঞা করিয়াছিলেন। কেশব বাবু নানাবিধ কারণ দেখাইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই চলিয়া আসিতে মনস্থ করিলেন। পরমহংসদেব তচ্ছ্রবণে কহিয়াছিলেন, "বাস্তবিক আমার এরূপ অনুরোধ করা ভাল হয় নাই। আঁস্‌চুব্‌ড়ী না হইলে কি তোমাদের ঘুম হয়? আমার একটী গল্প মনে হইতেছে। কোন গ্রামে দুই জন ধীবর কার্য্যানুরোধে গ্রামান্তরে গমন করিয়াছিল। প্রত্যাগমনের সময় পথিমধ্যে সন্ধ্যা হইল। পথটী নিতান্ত দুর্গম, দুই পার্শ্বে বন, রাত্রে দিগ্বিদিক্ কিছুই দেখা যায় না। কোথায় যাইবে, বিবেচনা করিয়া নিকটস্থ এক উদ্যানে প্রবেশ পূর্ব্বক মালির গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিল। একে পুষ্পোদ্যান, তাহাতে রাত্রিকাল, নানা জাতীয় ফুলের সৌরভে বাগানটী আমোদিত করিয়া রাখিয়াছে। ধীবরদিগের স্থান পরিবর্ত্তন বিধায় এবং পুষ্প-সৌরভ তাহাদের চির অভ্যস্থ শুষ্ক মৎস্যের দুর্গন্ধ-ভোগের নাসারন্ধ্রে অসহ্য হওয়ায় কিছুতেই নিদ্রাকর্ষণ হইল না। যত মন্দ মন্দ সমীরণ পুষ্পের সুগন্ধকণা তাহাদের নিকট সঞ্চালিত করিতে লাগিল, ততই তাহাদের ক্লেশের পরিসীমা রহিল না। অবশেষে তাহারা উঠিয়া বসিল এবং কত ক্ষণে রজনী শেষ হইবে, এই ভাবিয়া ছট্ ফট্ করিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইয়া আসিল, এমন সময়ে কয়েকজন ধীবর-কন্যা মস্তকে মৎস্যের ঝুড়ি লইয়া মৎস্য ক্রয় করিতে যাইতেছিল। তাহাদের দেখিয়া ধীবরেরা ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া গিয়া তাহাদের নিকট হইতে মৎস্যের ঝুড়ি লইয়া তন্মধ্যে মস্তক প্রবিষ্ট করিয়া দিল এবং আঘ্রাণ লইয়া এতক্ষণে বাঁচিলাম বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। তাই ত, কেশব! ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের নেতা হইয়া আজও রেড়ীর কলটী বন্ধ করিতে পারিলে না?

ইহা নিতান্ত কুলক্ষণ জানিবে।" কেশব বাবু কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া এই বাক্যগুলি শিরোধার্য্য জ্ঞান করিয়া লইয়াছিলেন।

পরমহংসদেবের উপদেশে কেশব বাবু নিতান্ত আত্মহারা হন নাই। তাঁহার নিজভাব বিসর্জ্জন দিয়া পরমহংসদেবের ভাবগুলি লইয়া একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যান নাই। যদিও সেই উপদেশগুলি রত্নভাণ্ডারে সংস্থাপন করিয়া রাখিয়াছিলেন, যদিও তাহার কিয়দংশ "পরমহংসের উক্তি" বলিয়া ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে ছাপাইয়াছিলেন, কিন্তু অধিকাংশ ভাব নিজের মতে পুনরায় গঠন করিতে যাইয়া বিকৃত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন যে, এক ঈশ্বর, তাঁহার অনন্ত শক্তি, প্রত্যেক শক্তির স্বতন্ত্র ভাব এবং স্বতন্ত্র রূপ। মনুষ্যগণ এক জাতি পদার্থ দ্বারা সংগঠিত হইয়াও আকৃতি ও প্রকৃতিতে প্রত্যেককে স্বতন্ত্র বলিয়া দেখা যায়। কোন ব্যক্তির মুখ কাহার সহিত সমান নহে। কিম্বা যেমন জল এক পদার্থ। কেহ তাহাকে পাণি, কেহ বারি, কেহ নীর, কেহ ওয়াটার (water) এবং কেহ একোয়া (aqua) বলে। এস্থলে ভাষার সম্পূর্ণ প্রভেদ রহিয়াছে। ওয়াটার কিম্বা একোয়া বলিলে ইংরাজী কিম্বা ল্যাটীন বিদ্যানভিজ্ঞ ব্যক্তি কিছুই বুঝিতে পারিবে না বলিয়া, ইংরাজের কি ভাবান্তর হইয়াছে বলিতে হইবে? কখনই নহে। সেই প্রকার এক ঈশ্বরকে, যে যে ভাবেই উপাসনা করুক, তাহাতে কোন দোষ হয় না। কেশব বাবু একটী নূতন কথা শুনিলেন। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের জন্য পৃথিবী বিখ্যাত। সকল দেশের ধর্ম্ম সম্প্রদায়ে এই ভাব জাজ্বল্যমান্ রহিয়াছে। ভারতবর্ষ ধর্ম্মের জন্য চির-প্রসিদ্ধ, তাই এ দেশে ঘরে ঘরে সম্প্রদায়। খৃষ্টমতাবলম্বীরা ধর্ম্ম প্রচার করিতে সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া আসিয়াছেন। সাম্প্রদায়িকতার আর অন্য দৃষ্টান্তের প্রয়োজন কি? সকলেই মনে করেন, তাঁহার ধর্ম্মটী শ্রেষ্ঠ; কিন্তু পরমহংসদেব সকলরে মান রাখিয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্ম-জগতের এই আভ্যন্তরিক বিবাদ ভঞ্জন করিবার জন্য স্বয়ং সাধক হইয়াছিলেন, তাই তিনি জোর করিয়া বলিতে পারিতেন, সকলের ধর্ম্মই সত্য, সকলেই এক জনের উপাসনা করিয়া থাকে। কেশব বাবু এই ভাব বিকৃত করিলেন। বর্ত্তমান শতাব্দীতে ইংরাজ কর্ত্তৃক হিন্দু শাস্ত্র ভাষান্তর হইলে, উহা আমাদের পাঠোপযোগী হইয়া থাকে। সেই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা হিন্দু ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া থাকি। ইহা আমাদের নিতান্ত পৌরুষের কথা নহে। এই জন্যই হিন্দুদের দুরবস্থার একশেষ হই-

য়াছে। এই অবস্থায় আমরা আমাদের ধর্ম্মের মর্ম্ম যে প্রকার বুঝিয়া থাকি, তাহা আর পরিচয়ের প্রয়োজন নাই। কেশব বাবু তাহা প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছিলেন। তিনি একটী যে নূতন ভাব লাভ করিয়াছেন বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ভ্রম হয় নাই। কিন্তু কালের কি প্রতাপ! পৃথিবীর কি আশ্চর্য্য কাণ্ড! কেশব বাবু সে ভাব আর এক প্রকারে দাঁড় করাইলেন। এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের অনন্ত ভাব। অনন্ত ভাবের পরিচয় অনন্ত ব্যক্তি, যে ব্যক্তির যে ভাব, সেই ব্যক্তি সেই ভাবের পরিচায়ক। তাহা না বলিয়া, তিনি সকল ভাবের সমষ্টি করিয়া এক স্থানে দেখাইতে চেষ্টা করিলেন। তাহার নাম "নববিধান" দেওয়া হইল। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ও বৌদ্ধ প্রভৃতি সকল ধর্ম্মের সারভাগ মন্থন করিয়া এই নূতন বিধানের সৃষ্টি হইল। ইহা তাঁহার নিতান্ত বুঝিবার দোষ হইয়াছিল। তিনি ভাবরাজ্যে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই স্বভাব হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। স্বকপোলকল্পিত ভাব কি ধর্ম্মজগতে এক মুহূর্ত্ত থাকিতে পারে? এ ত আকাশকুসুম নহে যে, যাহা বলিলাম, কেহ ধরিতে পারিবে না? ধর্ম্ম প্রাণের আরাম, ঈশ্বর প্রত্যক্ষ বস্তু, যে কেহ খুঁজিবে, সেই পাইবে, সেই বুঝিবে, তাহাতে গোঁজা মিলন চলিতে পারে না। সত্যের জয় চিরকাল। কেশব বাবু পরমহংসদেবকে চাপা দিয়া যাইলেন। নববিধানের ঢোল বাজিয়া উঠিল—বিধানপতাকা পৎ পৎ করিয়া গগনমার্গে উড্ডীয়মান হইল। কিন্তু তাহা আর নাই। সে নিশান ছিন্ন ভিন্ন, সে ঢোল ফাঁসিয়া গিয়াছে। সত্য প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে *।

---

* কেশব বাবু কখন কোন প্রকাশ্য স্থানে অথবা কোন পুস্তকে কিম্বা সংবাদপত্রে পরমহংসদেব সম্বন্ধে তাঁহার নিজের ভাব কিছু প্রকাশ করিয়াছেন কি না, তাহা আমরা অবগত নহি। আমাদের যতদূর জানা আছে, তাহাতে তিনি কিছু বলেন নাই, এই বিশ্বাস। কারণ "নববিধান" নামক গ্রন্থের পঞ্চম পৃষ্ঠায় কেশব বাবু যাহা নববিধানের নূতন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা পরমহংসদেবের কথা, ভিন্ন অর্থে স্বনামে প্রকাশিত হইয়াছে—যথা ঈশ্বর দর্শন ও তাঁহাকে স্পর্শন করা যায়, প্রত্যক্ষে নহে—ভাবে। নিরাকার ঈশ্বরকে নিরাকারে স্পর্শন করা যায়। এই সকল বিষয়ের ভাবচ্যুতি হইয়াছে। সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের ভিতরেও বিশেষ গোলযোগ রহিয়াছে। তিনি জ্ঞানী, কর্ম্মী, ভক্ত, খৃষ্ট প্রভৃতির নামোল্লেখ করিয়া তাহাদের যথাস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ যে ধর্ম্মের যেটী সার, তিনি তাহা একস্থানে সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহাই নবভাব, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, ভাববিশেষ লাভ করিতে হইলে, তাহার সাধন চাই। বিনা সাধনে কি সাধ্য বস্তু লাভ হইতে পারে? বৈষ্ণবদিগের প্রেম উত্তম, তাহা তিনি লইয়াছেন, কিরূপে লইলেন? বৈষ্ণবমতে কি তিনি

কেশব বাবু একজন পণ্ডিত এবং পরমহংসদেব সে সম্বন্ধে নিরক্ষর ছিলেন। কেশব বাবু কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তির পুত্র, পরমহংসদেব সাত টাকা বেতনের দেবালয়ের কর্ম্মচারী; এমন ব্যক্তির পদে মস্তকাবনত করা সামান্য কথা নহে। আমরা দেখিয়াছি, কেশব বাবু পরমহংসদেবকে যে প্রকার শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন এবং পরমহংসদেবও কেশব বাবুকে যে প্রকার ভালবাসিতেন, তেমন আমরা আর দেখি নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কেশব বাবু যখন পরমহংসদেবের নিকট গমন করিতেন, তিনি হিন্দুদিগের দেবদর্শনে যাইবার পদ্ধতি অবলম্বন পূর্ব্বক পুষ্প কিম্বা একটী ফল লইয়া যাইতেন। উহা তিনি গুপ্তভাবে প্রদান করিতেন এবং আসিবার সময় চরণ-স্পর্শিত কোন একটী দ্রব্য লইয়া আসিতেন। কেশব বাবু পরমহংসদেবকে তাঁহা হইতে কত উচ্চ জ্ঞান করিতেন, তাহা একটী দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝা যাইবে। একদিন পরমহংসদেব কেশব বাবুকে কিছু উপদেশ দিতে বলিয়াছিলেন। কেশব বাবু হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "কামারের দোকানে কি সূচিকা বিক্রয় করা সাজে?"

কেশব বাবু নববিধান রচনা করিয়া, পরিশেষে আপনি তাহার বিষময় ফল অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মকে এক করিয়াছিলেন, কিন্তু গোটাকতক স্বজাতীয় লোককে এক মতে রাখিতে পারেন নাই।

কেশব বাবু শেষাবস্থায় পরমহংসদেবকে চৈতন্যের অবতার বলিয়া কোন কোন ব্যক্তিকে বলিয়াছেন। একদিন ভূতপূর্ব্ব বাঙ্গালা দপ্তরের সহকারী সম্পাদক বাবু রাজেন্দ্রনাথ মিত্র কেশব বাবুকে পরমহংসদেবের ঈশ্বর-পরায়ণতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। কেশব বাবু তাহাতে বলিয়াছিলেন যে, শাস্ত্র হইতে প্রেমভাব মহাভাব প্রভৃতি যে সকল লক্ষণ জানা যায়, তাহা সকল সাধকে পরিলক্ষিত হয় না। মহাভাবের লক্ষণ এ প্রদেশে চৈতন্যের ছিল,

পরমহংসদেবের মত সাধন করিয়াছিলেন? শাক্ত না হইলে শক্তির ভাব বুঝিবে কে? মুসলমান হইয়া সাধক না হইলে মহম্মদীয় ভাব আয়ত্ত হইবে কিরূপে? খৃষ্টান ধর্ম্ম আলোচনা না করিলে কি খৃষ্টকে জানা যায়? মুখের কথা এবং বুদ্ধির বিচারে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। এই সকল কারণে কেশব বাবু নিতান্ত ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন এবং পরমহংসদেবের প্রকৃত ভাব বুঝিয়াই হউক, কিম্বা না বুঝিয়াই হউক, তিনি যে ভিন্ন ভাবে প্রকটিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; তাহা প্রত্যেক নিরপেক্ষ ব্যক্তি স্বীকার করিবেন।

এবং বিজাতীয়দিগের মধ্যে ঈশার মহাভাব হইত; এই বলিয়া তাঁহার গৃহের একখানি ছবি দেখাইয়া দিলেন। পরমহংসদেবের এই ভাব হয়, তজ্জন্য অনেকে তাঁহাকে চৈতন্যাবতার বলিয়া মনে করেন।

কেশব বাবু যখন পীড়িতাবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন, তখন পরমহংসদেব তাঁহাকে দেখিতে আসিয়া বলিয়াছিলেন, বাগানে ফুল ফুটিলে উদ্যান-স্বামী উহা ছিঁড়িয়া লয় অর্থাৎ তোমার মনরূপ ভক্তি-পুষ্প এখন ফুটিয়াছে, উহা মাতার চরণপ্রান্তে যাইয়া চিরদিনের মত পতিত হউক। কেশব বাবুর পরলোক যাত্রায় পরমহংসদেব বিশেষ বিষাদিত হইয়াছিলেন। কেশব বাবু আর কিছু দিন জীবিত থাকিলে কি হইত, বলা যায় না। বিজয় বাবুকে * দেখিয়া এখন নানাবিধ ভাব মনে আসিয়া থাকে।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, ভারতবর্ষের প্রায় সকল সাধুরই সহিত পরমহংসদেবের পরিচয় ছিল, কিন্তু অপর সাধারণ লোকে এমন কি, দক্ষিণেশ্বর-নিবাসী ভদ্রলোকেরা তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিত না। দক্ষিণেশ্বরের যে সকল লোকের সহিত তাঁহার আলাপ ছিল, তাহারা তাঁহাকে পাগল বলিয়া স্থির নিশ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল। অদ্যাপি তথাকার অনেকেরই এই ধারণা আছে। কেশব বাবুর গতিবিধি হওয়ায় লোকের কিঞ্চিৎ চমক্ হইয়াছিল এবং ভক্ত সাধু বলিয়া তিনি কাগজে লিখিতেন ও অনেকের নিকটে গল্পও করিতেন, ইহা দ্বারা অপর সাধারণে তাঁহাকে জানিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু পরমহংসদেব যে একজন অতি মহান্ ব্যক্তি, এ প্রকার ধারণা করিয়া দিবার জন্য কেহই চেষ্টা করেন নাই। †

* বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী—কয়েক বৎসর হইল দেহত্যাগ করিয়াছেন।

† চেষ্টা করা দূরে থাক, আমরা যখন তাঁহার নিকট গতিবিধি করিতাম, কেশব বাবুর কোন শিষ্য আমাদের তথা হইতে ভাঙ্গাইয়া স্বদলভুক্ত করিবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কেশব বাবু নাকি কহিয়াছিলেন যে, পরমহংস মহাশয় কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগী, তাঁহার নিকটে গৃহীর পোষাইবে না। তিনি একদিন কুটুস্ করিয়া কামড়াইয়া ধরিবেন। সে দিন উহাদের (আমাদের) কি হইবে? আমাদের মধ্যে সকল ভাবই আছে।" কেশব বাবুর উক্ত শিষ্য মহাশয়ের সহিত একদিন গুরুতত্ত্ব লইয়া আমাদের অনেক কথা হয়।

লোকের স্বার্থপরতাদোষবশতঃই হউক, কিম্বা পরমহংসদেব জনতা হওয়া ভালবাসিতেন না বলিয়াই হউক,সাধারণের মনে উক্ত ধারণা করিয়া দিতে কি জন্য কাহার সাহস হয় নাই, তাহা বলিতে পারা দুঃসাধ্য। ফলে সর্ব্বসাধারণের তদ্দ্বারা বিলক্ষণ ক্ষতি হইয়াছে। আজ কাল ধর্ম্মশাস্ত্রের সারমর্ম্মোদ্ধার করা অতিশয় সুকঠিন। বিশেষতঃ, বর্ত্তমান বিজাতীয় ভাব-সঙ্কর কালে পরমহংস-দেবের ন্যায় আচার্য্যের বিশেষ প্রয়োজন এবং সেই নিমিত্তই তাঁহার শুভাগমন হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। সে যাহা হউক, পরমহংসদেব আর রাস-মণির কালীবাটীর কেবল এক জন বাতুল বলিয়া বিষয়বাতুলদিগের নিকট পরিচিত রহিলেন না। তাঁহার নিকটে দলে দলে পণ্ডিত, জ্ঞানী এবং ধর্ম্ম-পিপাসু ব্যক্তিদিগের সমাগম হইতে আরম্ভ হইল। যিনি একদিন গিয়াছেন, তিনি আর তাঁহাকে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই।

পরমহংসদেব ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগকে দেখিতে পারিতেন না এবং তাঁহারা তাঁহার কাছে যাইলে, এমন ভাবে কথা কহিতেন যে, তাঁহারা আর প্রাণান্তেও তথায় যাইতেন না। *

একদা কৃষ্ণদাস পাল, মহারাজা ও রাজা বাহাদুর প্রভৃতি সুসভ্যমণ্ডলীতে তাঁহাকে আহ্বান করা হইয়াছিল। কৃষ্ণদাস বাবু সে সময়ে সভ্যদিগের মুখপাত ছিলেন। এস্থানেও তিনি অগ্রভাগে গিয়া পরমহংসদেবকে কহিয়া-ছিলেন, "বৈরাগ্য শাস্ত্র এদেশের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। সকল বস্তু এ দেশে অসার বলিয়া শিক্ষা দেওয়া সেকালের কথা। এইরূপ শিক্ষার দোষে আজ ভারতবর্ষ পরাধীন। যাহাতে আপনার এবং দেশের হিতসাধন হয়, এমন উপদেশ দিবেন।" পরমহংসদেব মৃদু হাস্যে বলিয়াছিলেন, "তোমার মত রাঁড়িপুত বুদ্ধির লোক আর দেখা যায় না। তুমি কি বলিতেছ? জীবের

সেই সকল কথা কেশব বাবুকে বলায়, তিনি কহিয়াছিলেন যে, উহাদের আর ঘেঁটাইয়া কাজ নাই।

* অনেকে মনে করেন যে, ধনী ব্যক্তিদিগকে পরমহংসদেব বিশেষ ভালবাসিতেন, কিন্তু একথা মনে করা সম্পূর্ণ ভুল। কোন্ ধনী ব্যক্তি তাঁহার নিকট একবারের অধিক গিয়াছে? এবং শিষ্যদিগের মধ্যেই বা ধনী কে? তিনি ধনীর মনরাখা সাধু হইলে, কোন্ কালে মোহন্ত হইয়া বসিয়া থাকিতেন।

† স্বামীবিহীনা স্ত্রীলোকেরা গৃহস্থের বাটীতে পরিচারিকা বৃত্তিদ্বারা যে সন্তানকে লেখা পড়া শিখাইয়া মানুষ করে, সে পরে দশ টাকা উপার্জ্জনক্ষম হইলেও প্রায় নীচপ্রকৃতিবিশিষ্ট হইয়া থাকে। তাহার হৃদয় ও মন কখন প্রশস্ত হইতে পারে না।

হিতসাধন করিবে? কি হিত করিবে, আমায় বুঝাইয়া দিতে পার? তোমরা যাহাকে হিত বল, তাহা আমি জানি। পাঁচজনকে অন্ন দেওয়া এবং ব্যাধি হইলে চিকিৎসা করা, একটা রাস্তা করা কিম্বা একটা পুষ্করিণী বুজাইয়া দেওয়া রহিত করা; একে ত বল হিতসাধন? হিত—কিয়ৎপরিমাণে বটে। কিন্তু বল দেখি, মানুষের শক্তিতে এই হিত কতদূর সাধিত হইতে পারে? অন্নকষ্ট নিবারণ করিবে? এ কষ্ট হইল কেন? কারণ, ঈশ্বর প্রচুর ধান্যাদি দেন নাই। তোমরা নানাস্থান হইতে চাউল লইয়া দুর্ভিক্ষ নিবারণের চেষ্টা পাইলে, কিন্তু তাহাতে কি ফল হইল? কত লোককে বাঁচাইলে? সত্য বল, উড়িষ্যা ও মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষে কত লক্ষ নরনারী অনাহারে মরিয়া গিয়াছে? তোমাদের চেষ্টার ত ক্রটী হয় নাই, অর্থের অনাটন ছিল না, তবে লোক রক্ষা হইল না কেন? 'মালোয়ারি' জ্বরে এক একটী দেশ জনশূন্য হইয়া গিয়াছে। ঔষধে কি করিল? যাহারা বাঁচিয়াছে, ঔষধ না দিলেও তাহারা বাঁচিত। হিত করিবে বলিয়া মনে অহঙ্কার কর, কিন্তু জগৎখানা কি? কত বিস্তীর্ণ, তাহার কোন জ্ঞান আছে? জীব বলিলে কেবল মনুষ্য বুঝায় না। যত প্রাণী এই জগতে আছে, সকলের আহার যোগায় কে? ইহাদের রক্ষা করে কে? ঈশ্বর বলিয়াছেন, মনুষ্যের আত্মাভিমান দেখিয়া তিনি তিনবার হাসিয়া থাকেন। কোন ব্যক্তির আসন্ন কাল উপস্থিত হইলে, চিকিৎসক যখন জোর করিয়া বলে, ভয় কি, আমি বাঁচাইয়া দিব। এই একবার তিনি হাসিয়া থাকেন। ভাই ভেয়ে বিবাদ করিয়া সূত্র ফেলিয়া যখন জমি ভাগ করে, তখন তাঁহার দ্বিতীয় বার হাসা এবং এক রাজা যখন অপরের রাজ্য কাড়িয়া লয়, তখন তিনি তৃতীয় বার হাসিয়া থাকেন। বাবু! গঙ্গায় কাঁকড়ার বাচ্ছা হয়, দেখেছ? অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে তুমি একটী কাঁকড়ার বাচ্ছাবিশেষ; জীবের হিত করিবে মনে করিলে পাপ হয়!" কৃষ্ণদাস বাবুর আর কথা চলিল না, তিনি অবাক্ হইয়া রহিলেন। জনৈক মহারাজা বাহাদুর আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি কৃষ্ণদাসের রক্ষার্থ সম্মুখীন হইলেন; কিন্তু তেজীয়ান সাধুর নিকটে কি রাজা নবাব কেহ অগ্রসর হইতে পারেন? রাজা উপাধি ধনের জন্য, যাহারা ধনের কাঙ্গাল, তাহারা রাজার সম্মান রক্ষা করে। সাধুরা ধনকে কাকবিষ্ঠাবৎ জ্ঞান করিয়া থাকেন। সেই সাধুর নিকটে কি ধনীর মর্য্যাদা থাকে? যাঁহারা ধনের মর্য্যাদা মৃত্তিকার ন্যায় অকিঞ্চিৎকর বোধ করেন, তাঁহাদের নিকটে ধনীও অকিঞ্চিৎকর, হেয় বস্তু বলিয়া পরিগণিত

হইয়া থাকে। সুতরাং রাজাবাহাদুরকে সেই সভাস্থলে নানা প্রকার কথা শ্রবণ করিতে হইয়াছিল।

আমরা সহরে সময়ে সময়ে নানাবিধ বুজরুক্‌দার সাধু দেখিতে পাই। তাহারা ধনীদিগের বৈঠকখানায় ঠাট্টা, তামাসা ও পাঁচশত খোসামোদ করিয়া নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করিয়া লইবার সুযোগ অন্বেষণ করিয়া থাকে। ধনী-দিগের সেই সংস্কার ছিল। কিন্তু পরমহংসদেব যে সে শ্রেণীর নহেন, তাহা তাঁহারা অনুমান করিতে পারেন নাই। ধনীদিগের মধ্যে পাথুরিয়াঘাটার যদুলাল মল্লিক সর্ব্বদা পরমহংসদেবের সহবাস ভালবাসিতেন। যদু বাবুর কিঞ্চিৎ সাত্বিক ভাব ছিল, সেই জন্য পরমহংসদেবও তাঁহাকে ভালবাসিতেন। আমরা তাঁহার সহিত অনেকবার যদু বাবুর বাগানে গমন করিয়াছি। যদু বাবু পরমহংসদেবের নিকট উপদেশ শুনিতেন। যদু বাবুর মাতা পরমহংসদেবকে বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন এবং প্রায়ই তাঁহাকে বাটীতে লইয়া গিয়া ধর্ম্মো-পদেশ লইতেন।

ধনী ব্যক্তিরা পরমহংসদেবকে লইতেন না এবং তিনিও তাঁহাদের সহিত কথা কহিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেন না। ক্রমে ইহাদের দল কমিয়া আসিল। কলিকাতার মধ্যে কয়েকজন মধ্যবিত্ত লোক তাঁহার নিকট সর্ব্বদা গমনাগমন করিতেন। সিন্দুরিয়াপটীর মনিলাল মল্লিক (ইনি ব্রাহ্ম ঢং এর লোক, কিন্তু ইঁহার একটী বিধবা কন্যা পরমহংসদেবের বিশেষ অনুগৃহীতা পাত্রী ছিলেন) মাথাঘসার গলির জয়গোপাল সেন, ইনিও ব্রাহ্ম; কলি-কাতার ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী কলেক্টার অধরলাল সেন, ইনি শাক্ত ছিলেন। অধর বাবুর বাটীতে একদিন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহিত পরমহংসদেবের সাক্ষাৎ হয়। পরমহংসদেব তাঁহাকে বঙ্কিম (বাঁকা) বলিয়া রহস্য করিয়াছিলেন। নেপাল রাজ্যের প্রতিনিধি বিশ্বনাথ উপাধ্যায় পরমহংসদেবের নিতান্ত অনুগত ভক্ত ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে নানাবিধ জনশ্রুতি আছে। উপাধ্যায় প্রথমে নেপালীদিগের ঘুসুড়ির সালকাষ্ঠের কারখানায় একজন কর্ম্মচারী ছিলেন। একদিন স্বপ্নে দেখিলেন যে, এক ব্যক্তি বিষ্ঠার মধ্যস্থলে বসিয়া তাঁহাকে তত্ত্বজ্ঞান দিবার জন্য ডাকিতেছেন। স্বপ্নান্তে তাঁহার মনে নানাবিধ তর্ক উঠিতে লাগিল। বিষ্ঠার মধ্যস্থলে মনুষ্য বসিয়া আছেন, তিনি তত্ত্ব-কথা বলিবেন কি? ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির নিশ্চয় করিতে পারিলেন না। কিয়দ্দিন পরে তিনি একদা সহসা দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া উপস্থিত হন। তথায়

পরমহংসদেবকে দেখিয়া তাঁহার স্বপ্নের কথা স্মরণ হইল এবং স্বপ্নদৃষ্ট ব্যক্তির ন্যায় তাঁহাকে বোধ হইল। উপাধ্যায় বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। তিনি পরমহংস দেবের সম্মুখে যাইবামাত্র যেন পরিচিতের ন্যায় আলাপ করিতে লাগিলেন। উপাধ্যায়ের মন, সেই দিন হইতে যেন তিনি কাড়িয়া লইলেন। তদবধি উপাধ্যায় প্রতি সপ্তাহে দক্ষিণেশ্বরে গমন করিতেন এবং প্রতিমাসে পরমহংসদেবকে বাটীতে আনিয়া তাঁহার স্ত্রী দ্বারা পাক করাইয়া ভোজন করাইতেন। পরমহংসদেব একটু পরিস্কার স্থানে শৌচক্রিয়াদি সমাধা করিতেন। উপাধ্যায় সেইজন্য বাটীর ছাদের উপর তাম্বু খাটাইয়া তন্মধ্যে পাইখানা নির্ম্মাণ করিয়া রাখিতেন। পরমহংসদেবের ভোজন হইলে, উপাধ্যায় সস্ত্রীক তাঁহার সেবা করিতেন। ধন্য উপাধ্যায়! ধন্য আপনার স্ত্রী! আপনারাই চরিতার্থ হইয়াছেন! আপনারা সাধু সেবা করিতে জানিতেন। আপনাদের ভক্তি আমাদের শিক্ষা করিবার বিষয়।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

এ পর্য্যন্ত যে সকল ব্যক্তি গমনাগমন করিতেছিলেন, তাঁহারা কেহ প্রকাশ্যে পরমহংসদেবের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন নহে। পরহংসদেবের গুরুগিরি ছিল না। তিনি যেন গুরুগিরি চূর্ণ করিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহাকে প্রণাম করিবার অগ্রে তিনি নমস্কার করিয়া ফেলিতেন। তাঁহার চরণধূলি লইবার কাহারও অধিকার ছিল না। তাঁহাকে গুরু বলিলে অত্যন্ত কাতর হইতেন।

১৮৭৯ সালে আমরা তাঁহার নিকট গমন করিয়াছিলাম। সে সময় আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতাম না। স্বভাবে সকলেই হয়, যায়, রয়, এই প্রকার সিদ্ধান্তই ছিল। সুতরাং আমরা এক প্রকার নরাকারে জন্তুবিশেষ ছিলাম। জানিতাম আহার, নিদ্রা এবং মৈথুন। এই কার্য্যত্রয় সাধনা করিতে যে পারিবে, সেই ব্যক্তিই ধন্য। সুতরাং যাহাতে তদ্বিষয় সুনিপুণ হওয়া যায়, তাহার ব্যবস্থাই হইত। আমাদের যে স্বভাব বর্ণনা করিলাম, এই এখনকার বাজার। আমরা সেইজন্য বাজার ছাড়া ছিলাম না। আমরা

বেলা একটার সময় উপস্থিত হইয়াছিলাম। তখন তাঁহার গৃহের দ্বার রুদ্ধ ছিল। কাহাকে ডাকিব, কি বলিয়া ডাকিব, ভাবিতেছি, এমন সময়ে এক ব্যক্তি আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমাদের প্রাণ যেন শীতল হইল; কিন্তু কে তিনি, তখন জানিতে পারিলাম না। গৃহের ভিতরে যাইয়া প্রণামানন্তর উপবেশন করিলাম এবং মনে হইলে যে, ইনিই সেই মহাপুরুষ হইবেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, পরমহংসদেব কখন কোনপ্রকার সাধুর পরিচায়ক বেশভূষা করিতেন না। তন্নিমিত্ত অনেকে তাঁহাকে দেখিয়াও চিনিতে পারে নাই। আমাদের সেইদিন সৌভাগ্য-সূর্য্য উদিত হইল, আমাদের মনের কুসংস্কারের গুদাম সেইদিন পরিস্কৃত হইল। বিলাতী কু-শিক্ষায় যে সকল বিষয়কে কুসংস্কার বলিয়া অতি যত্নে শিক্ষা করিয়াছিলাম, পুনরায় তাহাদের আদর করিয়া লইতে শিক্ষা পাইলাম। পরমহংসদেব যে জন্য আসিয়াছিলেন, যে জন্য তাঁহার জপ,তপ, যে জন্য তাঁহার কার্য্যকলাপ, যে জন্য তাঁহার প্রচার, সেই দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। নাস্তিকের ঠাকুর, পতিতপাবন পরমহংসদেব! আপনি আমাদের জন্যই এতদিন ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন! নির্ধন কাঙ্গালের জন্য ধনীরা মুক্তহস্ত হইয়া থাকেন। মুক্তহস্ত হইলে কি হইবে, ধন গ্রহণ করে কে? যেমন আমরা কাঙ্গাল, যেমন দরিদ্র ছিলাম, যেমন আমাদের সকল স্থানই শূন্য ছিল, তেমনই আমাদের দাতা জুটিল। আমরা আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া তাঁহার রত্নভাণ্ডার লুট করিব মনে করিয়া সপরিবারে, সবান্ধবে, স্বজনবর্গের সহিত কত প্রয়াস পাইলাম, আমাদের সকলের আধার পরিপূর্ণ হইয়া পড়িল; কিন্তু তাঁহার ভাণ্ডার কিছুতেই শূন্য করিতে পারিলাম না—কেহই পারিল না। হায়! হায়! ভাণ্ডারে কত রত্নই ছিল, অগ্রে জানিলে, স্বদেশ বিদেশ হইতে পরিচিত অপরিচিত যে যেখানে আছেন, তাঁহারা না আসিলে অনুনয় করিয়া পায়ে ধরিয়া সকলকে দিয়া রত্ন লুট করাইতাম। ক্ষুদ্র আধার, সীমাবিশিষ্ট বুদ্ধি লইয়া বাস করিতেছি, অসীম ব্যাপার বুঝিব কি? তাহা স্থান পাইবে কোথায়?

পরমহংসদেব বাস্তবিকই জ্ঞান-রত্ন ও ভক্তি-মাণিক্যের আকর ছিলেন। এতগুলা কাঙ্গাল ধনী হইয়া গেল, তথাপি ধন ফুরাইল না, এ কি সামান্য রহস্যের কথা! এখন ক্রমে আমাদের ন্যায় কত চোর, লম্পট, মাতাল, অনাচারী, বিশ্বাসঘাতক, দলে দলে আসিয়া আশ্রয় লইতে লাগিল, অবারিত দ্বার; কাহাকেও বিমুখ করিলেন না! দয়ার অবতার না বলিয়া আর কি

বলিব ? যাহারা লোকালয়ে স্থান পাইত না, যাহাদের ধর্ম্ম ধর্ম্মজগতে ছিল না, যাহাদের গুরু গুরুশ্রেণীরা হন নাই, বাহু প্রসারণ করিয়া পরমহংসদেব তাহাদের ক্রোড়ে লইলেন।

এই ভক্তদিগের মধ্যে প্রত্যেকের ভাব স্বতন্ত্র প্রকার। কাহাকে কালী, কৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ প্রভৃতি সাকার উপাসক ও কাহাকে শঙ্কর প্রভৃতি জ্ঞানপথাবলম্বী সাধকদিগের পদচিহ্নানুক্রমে গমন করিতে দেখা যাইতেছে এবং কাহাকেও বা পরমহংসদেবকে জীবন মরণের একমাত্র অবলম্বন, সহায়, সম্পত্তি, গুরু, ঈশ্বর ও পরিত্রাতা বলিয়া নিশ্চিন্তে, নিরুপদ্রবে, নির্ব্বিঘ্নে. নিরানন্দবিহনে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে দেখা যাইতেছে।

এই ভক্তগণ ব্যতীত তাঁহার আরও ভিন্ন ভিন্ন ভাবের অসংখ্য ভক্ত আছেন। কতকগুলি মুসলমান, (এক জনকে আমরা জানি, তিনি ডাক্তার,) খৃষ্টান, (দুই জনের সহিত আমাদের পরিচয় আছে, একজনের নাম পি, ডি, মিস্রির, ইনি সন্ন্যাসীবিশেষ, মৎস্য মাংসত্যাগী, ইঁহার যোগাদি অভ্যাস আছে, নামেও ভাব হয় ; অপর ব্যক্তির নাম উইলিয়েম, ইনি ভক্তিপ্রধান প্রকৃতির লোক, পরমহংসদেবের নিকটে অভিপ্রেত আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া এক্ষণে পার্ব্বত্যপ্রদেশে যোগাভ্যাস করিতেছেন ;) এবং বাউল, কর্ত্তাভজা, নবরসিক প্রভৃতি অনেক ভক্তই আছেন। তাঁহারা আপন আপন ভাবেই গুপ্ত সাধন করেন।

পরমহংসদেব এইরূপে অনুমান শতাধিক ভক্ত লইয়া কিছুদিন আনন্দের তরঙ্গ ছুটাইয়াছিলেন। কোন দিন বাদ নাই, কোন রাত্র বাদ নাই, ভক্তসঙ্গে সদাই আনন্দিত থাকিতেন। প্রতি সপ্তাহের শনিবারে কোন একজন ভক্তের বাটীতে আসিতেন। তথায় কীর্ত্তন, নৃত্য ও উচ্চ হরিধ্বনিতে সে বাটী ও পল্লী পুলকার্ণবে ভাসাইয়া যাইতেন। তাঁহার হরিনামসঙ্কীর্ত্তনে যে কত পাষণ্ড দলিত হইয়াছে, তাহার সীমা নাই।

পরমহংসদেবের অতিশয় অন্তর্দৃষ্টি ছিল। যাহার যাহা মনে হইত, যে যাহা মনে প্রার্থনা করিত, তিনি তখনই তাহা সম্পূর্ণ করিয়া দিতেন, প্রত্যেক ভক্ত এই বিষয়ে বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। তাঁহার এই শক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য জনৈক বীরাচারী ভক্ত নিজ বাটীতে বসিয়া তাঁহাকে মনে মনে আহ্বান করিবামাত্র, পরমহংসদেব তৎক্ষণাৎ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। সুরেশ বাবু তিন দিন পরীক্ষা করেন। একদিন তাঁহাকে দেখিবার জন্য সুরেশ বাবুর মন বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠে। তিনি আফিসে যাইয়া কর্ম্ম

কাজ করিতে পারিলেন না। সুতরাং তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে যাইতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, পরমহংসদেব একখানি গাড়ী আনাইয়া সুরেশ বাবুর বাটীতে আসিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। সুরেশকে দেখিয়া বলিলেন, তুমি যদি আসিয়াছ, তবে আর কেন যাইব? তোমায় দেখিবার নিমিত্ত বড়ই উতলা হইয়াছিলাম। সুরেশ বাবু তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া নিজ বাটীতে আসিয়াছিলেন। আরও দুই দিন তিনি পরমহংসদেবের সাক্ষাৎকার প্রয়োজন বিবেচনায় কাঁদিয়াছিলেন; তিনি দুই দিবসই আসিয়া প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়াছিলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

পরমহংসদেব এইরূপে শিষ্টের পালন এবং পাষণ্ড দলন করিয়া ভগবৎ গুণানুকীর্ত্তন পূর্ব্বক দিনাতিবাহিত করিতেছিলেন। ঠাকুরবাড়ীর সকল কর্ম্মচারীরাই পরমহংসদেবকে পূর্ব্বের ন্যায় শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। মথুর বাবুর পুত্র ত্রৈলোক্য বাবুও ভক্তির ত্রুটি করিতেন না; কিন্তু তাঁহার পিতার যে প্রকার ভক্তি ছিল, তাহার শতাংশের একাংশও দেখাইতে পারেন নাই। বিষয়ী লোকেরা যেমন সচরাচর হইয়া থাকে, ইনি সেই প্রকার ছিলেন। ঠাকুরবাড়ীর উদ্যানটী তিনি দুইভাবে ব্যবহার করিতেন। তাঁহার সহিত কলিকাতার অনেক রকমের লোকই যাইতেন। তাঁহারা বাগানের আমোদ আহ্লাদেই দিন কাটাইতেন, এবং মধ্যে মধ্যে পরমহংসদেবকেও তথায় ডাকাইয়া পাঠাইতেন। উদারচেতা পরমহংসদেব তাহাতে কখন অভিমান প্রকাশ করেন নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন, যাঁহারা বৈঠকখানায় বসিয়া সাধুকে ডাকিয়া পাঠান, তাঁহাদের উপর কি মান অভিমান সাজে? ডাকিবামাত্র তিনি তথায় চলিয়া যাইতেন, কিন্তু দীর্ঘকাল থাকিতে পারিতেন না।

পূর্ব্বে যে হৃদয়ের কথা উল্লিখিত হইয়াছিল, তিনি এ পর্য্যন্ত ঠাকুরবাড়ীতে সেবাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। হৃদয় পরমহংসদেবের অনেক সেবা করিয়াছিলেন। সেই সেবার ফলে তিনি মধ্যে পরমহংসদেবের অনুগ্রহও লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু অনুগ্রহ হইলে কি হইবে? তাঁহার ছিদ্র কুম্ভ, সমুদায়

কৃপা-বারি বাহির হইয়া গিয়াছিল। পরমহংসদেব হৃদয়কে প্রাণাধিক ভালবাসিতেন। হৃদয় কামিনীকাঞ্চনত্যাগী মহাপুরুষের নিকটে থাকিলেও তাঁহার সেই কামিনীকাঞ্চন-ভাব অতি প্রবলরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সাধারণ লোকেরাই তাঁহার মাথা খাইয়াছিল, তাহার সংশয় নাই। হৃদয়কে সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে, কেহ ইচ্ছাক্রমে কিম্বা প্রাণ ভরিয়া পরমহংসদেবের নিকটে বসিতে অথবা তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতে পারিত না। সুতরাং যাহার যেমন সঙ্গতি, তিনি সেই প্রকারে হৃদয়ের পূজা করিতে বাধ্য হইতেন। ক্রমে তাঁহার লোভ বাড়িয়া গেল। পরমহংসদেব তাহা জানিতে পারিয়া হৃদয়কে নানাপ্রকার উপদেশ দিতেন এবং কেহ কিছু দিতে চাহিলে তিনি নিষেধ করিতেন। হৃদয় তাহাতে বিরক্ত হইতে লাগিলেন এবং সময়ে সময়ে পরমহংসদেবকে কটু-কাটব্যও বলিতে আরম্ভ করিলেন। মরি! মরি! বিষয়ের কি মহিমা! যে ব্যক্তি এক সময়ে অর্থকে গ্রাহ্য করিতেন না, তাঁহার পরিণাম দেখিলে আতঙ্কে সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠে! হৃদয়ের বিশেষ কষ্ট এবং পরমহংসদেবের প্রতি বিরক্তির কারণ, সেই লক্ষ্মীনারায়ণের দশ হাজার টাকা। বাস্তবিক, হৃদয়ের কেন, অনেকের পক্ষে তাহা সামান্য প্রলোভন নহে। ফলে, হৃদয়ের হৃদয় ক্রমে পরমহংসদেবের প্রতি বীতরাগ হইয়া উঠিল। তিনি সময়ে সময়ে এমন মর্ম্মভেদী কথা বলিয়া পরমহংসদেবকে বিরক্ত করিতেন যে, সে কথা শুনিলে আপাদমস্তক ক্রোধে পরিপূর্ণ হইত এবং তাহার সমুচিত দণ্ড হওয়া বিধেয় বলিয়া আপনি মনে মনে ঈশ্বরের কাছে কামনা হইয়া যাইত। এক একদিন পরমহংসদেব বালকের ন্যায় কত কাঁদিতেন, কৃতাঞ্জলি হইয়া হৃদয়কে কত অনুনয় করিতেন, কিন্তু তিনি সে কথায় আরও প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেন।

সাধন অপেক্ষা অনুকরণ করা সহজ। হৃদয় মহাপুরুষের সেবক হইয়া, তাঁহার সদ্‌গুণ লাভ করিবার প্রয়াস না পাইয়া, হাব ভাব অনুকরণ করিতে লাগিলেন এবং সেই প্রকারে লোকের নিকটে নৃত্য গীত করিয়া আপনাকে দ্বিতীয় পরমহংস করিয়া তুলিলেন। হৃদয়ের এতদূর স্পর্দ্ধা ও অবনতি হইয়াছিল যে, সময়ে সময়ে তাঁহার ভক্তদিগের সমক্ষে পরমহংসদেবকে ভ্রূকুটি করিয়া কথা কহিতেন। এক দিন পরমহংসদেব রামপ্রসাদের একটী গান গাহিতেছিলেন। তিনি যেমন এই কয়েকটী চরণ গাহিয়াছেন—"ওমা কাঁদ্‌ছে কে তোর ধন বিহনে, রত্ন আদি ধন দিবি মা, প'ড়ে রবে ঘরের কোণে"—

অমনি হৃদয় ঠাকুর রোষাবেশে, বিদ্রূপচ্ছলে এবং বিকৃত স্বরে বলিলেন, "ও কে কাঁদ্‌চে তোর ধন বিহনে—যদি কাঁদিতেছ না, তবে রাসমণির দেবালয়ে কেন?" এ সকল কথা পাঠ করিয়া পাঠকপাঠিকার বিরক্তি বোধ হইবে, তাঁহাদের প্রাণে নিদারুণ আঘাত লাগিবে এবং আমাদের এই কথাগুলি লিখিতে যে কি ক্লেশ হইতেছে, তাহা আর কি বলিব! মধ্যে মধ্যে আমাদেরও ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়া যাইতেছে, কিন্তু কি করিব, উপায়ান্তর নাই। পরমহংসদেব কি বলিবেন, কিঞ্চিৎ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; আর কিছুই বলিলেন না। হৃদয় ঠাকুর এইরূপে সর্ব্বপ্রকারে বিঘ্নকারী হইয়া দাঁড়াইলেন। হৃদয় ঠাকুর যেমন বলিবেন, তাঁহার যে প্রকার অভিপ্রায় হইবে, পরমহংসদেবকে সেই প্রকারে পরিচালিত হইতে হইবে। কথা রক্ষা না হইলেই ব্রাহ্মণের আর ক্রোধের সীমা থাকিত না।

একদা পরমহংসদেব জ্বরগ্রস্ত হইয়া শয়ন করিয়া আছেন, কোন ভক্ত একটী ফুলকপি লইয়া তাঁহার সম্মুখে সংস্থাপন করিয়া দিল। পরমহংসদেব আহ্লাদে উঠিয়া বসিলেন এবং কপিটীর কতই প্রশংসা করিলেন। অবশেষে বলিলেন যে, "দেখ তোমরা ঐ ঘরের মধ্যে ইহা লুকাইয়া রাখিয়া আইস। হৃদয়কে বলো না যে, আমি ইহা দেখিয়াছি, তাহা হইলে আমায় বড় গালাগালি দিবে।" আজ্ঞামাত্র কপিটী স্থানান্তরিত করা হইল। পরমহংসদেব কহিতে লাগিলেন, "দেখ, হৃদে আমার যে সেবা করিয়াছে, তাহা আমি কখনই ভুলিব না। হয় ত মা কালীর ইচ্ছায় সে না থাকিলে আমার দেহ এতদিন থাকিত না। আমি যখন পঞ্চবটীতে ধ্যান করিতাম, হৃদে আমার পশ্চাৎ যাইয়া ভয় দেখাইবার জন্য ইট মারিত। কিয়ৎকাল পরে আপনি চলিয়া আসিত। একদিন সে সাহসে ভর করিয়া পঞ্চবটীর মধ্যে প্রবেশ করে। সিদ্ধভূমি পঞ্চবটী, তথায় যাইবামাত্র আমি বলিলাম, কেও হৃদে? হৃদে বলিল, 'মামা! তুমি একলা বসিয়া কি করিতেছ?' আমি তাহাকে তথায় বসিয়া ধ্যান করিতে বলিলাম, হৃদে উপবেশন করিবামাত্র 'মামা গো! আমার পিটে কে আগুন ঢালিয়া দিল' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। আমি তাহার পৃষ্ঠে হস্তার্পণ করিয়া ভয় নাই বলায়, সে চুপ করিল। সেই মুহূর্ত্ত হইতে কেমন মা কালীর ইচ্ছা, হৃদয়ের ভাবান্তর হইয়া গেল। যেন পাঁচ বোতল মদের নেশা আসিয়া উপস্থিত হইল ও আনন্দে বিভোর হইয়া পড়িল। পরদিন রাত্রে আমি বহির্দ্দেশে গিয়াছি, হৃদে আমার পশ্চাৎ চলিয়া আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে

চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, 'ওরে রামকৃষ্ণ! তুইও যে, আমিও সে, তোতে আমাতে প্রভেদ কি? চল্, আমরা আর এখানে থাকিব না?' আমি তাড়াতাড়ি উহার নিকটে আসিয়া বলিলাম, 'চুপ্! চুপ্! এখনই সকলে জানিতে পারিবে। আমাদের এখানে থাকা ভার হইবে। ওরে, আমরা কি হইয়াছি? চুপ্ কর।' হৃদে কিছুতেই শুনিল না। উত্তরোত্তর চীৎকার বাড়াইল। আমি তখন উপায় না দেখিয়া তাহাকে বলিলাম, 'এককণা শক্তি ধারণা করিতে পারিলি না, তবে আর কি হইবে, জড়বৎ হইয়া যা।' অমনি হৃদে ভূমিতে পতিত হইয়া বলিল, মামা কি সর্ব্বনাশ করিলে, আমি আর অমন করিব না।" সেই পর্য্যন্ত হৃদয় ঠাকুর বাস্তবিকই জড়বৎ রহিয়াছেন। তিনি কহিতে লাগিলেন, "হৃদে যেমন আমার সেবা করিয়াছে, মা কালী উহার আশাতীত ফলও দিয়াছেন। দেশে বিলক্ষণ জমি-জমা করিয়াছে, লোককে টাকা ধার দেয়, এই মন্দিরে কর্ত্তার ন্যায় হইয়া রহিয়াছে এবং এত লোকে উহাকে সম্মান করিয়া থাকে।" এই কথা বলিতে বলিতে হৃদয় ঠাকুর তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হৃদয় ঠাকুর আসিবামাত্র পরমহংসদেব তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দেখ্, আমি এদের কপি আনিতে বলি নাই, ওরা আপনারা আনিয়াছে, মাইরি বল্‌চি, আমি ওদের কিছুই বলি নাই।" হৃদয় ঠাকুর এই কথা শুনিয়া তিরস্কারের অবধি রাখিলেন না। তাঁহার সেই মূর্ত্তি মনে হইলে এখনও আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়! পরমহংসদেব সরোদনে মা কালীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "মা! তুই আমার সংসারবন্ধন কাটিয়া দিলি, পিতা গেল, মাতা গেল, ভাই গেল, স্ত্রী গেল, জ্ঞাতি গেল—শেষে কি না হৃদের হাতে আমার এই দুর্গতি হইতে লাগিল?" এই কথা বলিয়া তিনি পুনরায় হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন, "ও আমায় বড় ভালবাসে, ভালবাসে বলিয়াই বকে, ছেলে মানুষ, ওর বোধ হয় নাই। ওর কথায় কি রাগ কর্ত্তে হয়, মা?" এইরূপ বলিতে বলিতে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু হৃদয় ঠাকুরের ক্রোধ শান্ত হইল না।

পরমহংসদেব ক্রমেই হৃদয়ের অত্যাচারে নিতান্তই কাতর হইয়া উঠিলেন। হৃদয় ঠাকুর তখন সকলেরই মর্য্যাদা হানি করিতে আরম্ভ করিলেন। ঠাকুর-বাটীর প্রত্যেক কর্ম্মচারী তাঁহার দ্বারা উৎপীড়িত ও মর্ম্মাহত হইয়া পড়িল। পরমহংসদেব বার বার নিষেধ করিলেন। তিনি নিষেধ বাক্য না শুনিয়া গর্ব্বিতভাবে বলিলেন, "রাসমণির অন্ন ব্যতীত তোমার গতি নাই। তুমি

সকলকে ভয় করিবে, আমি কাহাকে গ্রাহ্য করি? না হয় চলিয়া যাইব।" গরিব ব্রাহ্মণ, সাধুর কৃপায় পাঁচ জনের পূজনীয় হইয়া সম্মানের সহিত ছিলেন, তাহা অদৃষ্টবশতঃ জ্ঞান হইল না, তাঁহার আসন্নকাল সন্নিহিত হইয়া আসিল।

কালীমন্দির প্রতিষ্ঠার বাৎসরিক উৎসবের দিন সমাগত হইল। সেই দিনে তথায় অপেক্ষাকৃত কিছু ধুমধাম হইয়া থাকে। তন্নিমিত্ত ত্রৈলোক্য বাবু সপরিবারে তথায় আগমন করিয়াছিলেন। উৎসবের দিন প্রাতঃকালে হৃদয় ঠাকুর পূজা করিতে যাইলেন এবং তথায় ত্রৈলোক্য বাবুর একটী দশমবর্ষীয়া বিবাহিতা কন্যা পট্টবস্ত্রাদি পরিধান করিয়া দণ্ডায়মান ছিল। হৃদয় সেই বালিকাটীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেন। ইতিপূর্ব্বে পরমহংসদেব ঐ প্রকার পূজাদি করিতেন। হৃদয় তাহা অনুকরণ করিতে যাইয়া নিজ কাল আহ্বান করিয়া আনিলেন। কন্যার পায়ে চন্দনের চিহ্ন দেখিয়া তাহার মাতা জিজ্ঞাসা করায় হৃদয় ঠাকুরের কাণ্ডকারখানা প্রকাশ হইয়া পড়িল। ত্রৈলোক্য বাবুর স্ত্রী কন্যার অকল্যাণ হইবে ভাবিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার রোদনে ত্রৈলোক্য বাবু মাতিয়া উঠিলেন এবং মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় আস্ফালন পূর্ব্বক দ্বারবান্ দ্বারা হৃদয়কে উদ্যান হইতে এক বস্ত্রে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন এবং সেই ক্রোধে পরমহংসদেবকেও নাকি চলিয়া যাইবার নিমিত্ত আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। দ্বারবান্ এ সংবাদ আনিয়া পরমহংসদেবের সমীপে উপস্থিত হইল। পরমহংস-দেব হাসিয়া বলিলেন, "তোমার বাবুর আমি কি করিলাম?" এই বলিয়া তিনি তদবস্থায় গৃহ হইতে বাহির হইয়া এক মনে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। পরম-হংসদেব যখন বাবুদিগের বৈঠকখানার সম্মুখ দিয়া যাইতেছিলেন, তখন কে জানে, কি নিমিত্ত ত্রৈলোক্য বাবু, "আপনি কোথায় যাইতেছেন" বলায়, পরমহংসদেব অমনি ফিরিলেন এবং তাঁহাদের নিকটে যাইয়া বসিলেন। ত্রৈলোক্য বাবু হৃদয়ের সম্বন্ধে নানা কথা কহিলেন এবং কন্যাটীর অকল্যাণের আশঙ্কায় ভীত হইলেন। পরমহংসদেব অভয় দিয়া পুনরায় নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

হৃদয় ঠাকুর যদু মল্লিকের উদ্যানে বাস করিতে লাগিলেন। পরমহংসদেব দুই বেলা তাঁহার নিজ অংশ হইতে অন্নব্যঞ্জন ও মিষ্টান্নাদি পাঠাইয়া দিতেন এবং তিনি নিজে তাঁহাকে দেখিয়া আসিতেন। হৃদয় ঠাকুর এই সময়ে পরমহংসদেবকে মন্দির হইতে চলিয়া আসিবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন ও নানাবিধ যুক্তি দিয়া বলিয়াছিলেন যে, কোন স্থানে যাইয়া একটী কালী

মূর্ত্তি স্থাপন পূর্ব্বক উভয়ে সুখে বাস করিবেন। পরমহংসদেব এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "তুই কি আমায় লইয়া দ্বারে দ্বারে ফিরি করিয়া বেড়াইবি ?"

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, পরমহংসদেব কখন কাহার কর্ণে মন্ত্র দিয়া গুরুগিরি করিতেন না ; উপদেশ দিতেন, ঈশ্বর লাভের সুলভ পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন, কিন্তু কাহারও গুরু হইতেন না। এমন কি গুরু শব্দটী তাঁহার সম্মুখে কেহ বলিতে সাহস করিত না। গুরু বলিলে তিনি বলিতেন, "কে কা'র গুরু, এক ঈশ্বরই সকলের গুরু। চাঁদা মামা আমারও মামা, তোমারও মামা।" এই নিমিত্ত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গুরু শিষ্য সম্বন্ধ কাহারও সহিত তাঁহার ছিল না। তাঁহাকে গুরু বলা নিজ নিজ ইচ্ছার কথা। ইহার দ্বারা এই প্রকাশ পাইতেছে, জোর করিয়া কিম্বা বুজরুকী দেখাইয়া দলবদ্ধ করিবার তাঁহার চেষ্টা ছিল না। যাহারা আপন মনের টানে তাঁহার প্রতি পারলৌকিক শুভাশুভ নির্ভর করিত, তাহাদের জন্য তিনি বড়ই ব্যাকুলিত থাকিতেন। বস্তুতঃ গুরুকরণ যাহাকে বলে, তাহাই হইত। এরূপ গুরু-করণে শিষ্যেরই উপকার, গুরুর কিছুই লভ্য নাই। যে ব্যক্তি মন্ত্র দিবার জন্য তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করিত, তিনি তাহাদের কুলগুরুর নিকট সে কার্য্য সাধন করিয়া লইতে বলিতেন। অনেকে গুরুর চরিত্রদোষ ও ধর্ম্মশাস্ত্রে অজ্ঞতা দেখাইয়া, তাহা নিজের রুচিবিরুদ্ধ বলিয়া আপত্তি করিত, কিন্তু তিনি তাহা শুনিতেন না। তিনি বলিতেন—

"যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ী বাড়ী যায়,
তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।"

গুরু যেমনই হউন না কেন, তাহাতে আমাদের ক্ষতি বৃদ্ধি কি ? যে স্থানেই কাঞ্চন পতিত থাকুক না কেন, তাহার ধর্ম্মের কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হয় না। গুরু যে ধন দিয়া থাকেন, তাহা তাঁহার নহে। কিন্তু সেই ধন লইয়া

শিষ্যের কার্য্য, স্থানাস্থান বিচারের প্রয়োজন কিছুই নাই। যেমন কাহার মাতা বেশ্যাই হউক, কিম্বা সতীই হউক, সন্তান কি তাহাকে মাতা বলিবে না? পরমহংসদেব এইরূপ উপদেশ দিয়া যাহার মন পরিবর্ত্তন করিতে পারিতেন, সে চলিয়া যাইত। কিন্তু যে তাহা শুনিত না, যে মনে মনে তাঁহাকে গুরুর স্থানে বসাইয়া লইত, তাহার সহিত অধিক বাক্যব্যয় করিতেন না, 'কালীর ইচ্ছা যাহা, তাহাই হইবে', বলিয়া নিরস্ত হইতেন। যাহারা জপ তপ কিম্বা সাধন ভজন করিতে আপনাদিগকে অসমর্থ জ্ঞানে তাঁহার চরণপ্রান্তে পড়িয়া থাকিত, তাহাদের জন্য তিনি নিজে দায়ী হইতেন। তিনি সেই সকল ব্যক্তিকে আম্‌মোক্তারনামা বা বকল্‌মা দিতে কহিতেন। এই শ্রেণীর মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থায় পরমহংসদেব কর্ত্তৃক মন্ত্র পাইয়াছে। কোন কোন ব্যক্তিকে, 'তোমায় পরিত্রাণ করিলাম,' বলিয়া অভয় দিয়াছেন। মোট কথা, যে যাহা চাহিয়াছে, তাহাকে তাহাই দিয়াছেন। এই নিমিত্ত পরমহংসদেবের ভাব সহজে কেহ অনুভব করিতে সক্ষম নহে। তিনি একজনকে চির-সন্ন্যাসী করিয়াছেন, আর এক জনকে অর্দ্ধেক-সন্ন্যাসী এবং অপরকে গৃহস্থ-সন্ন্যাসী করিয়া রাখিয়াছেন। ইহার মর্ম্ম কাহার মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট হইবে এবং কেমন করিয়া তাহা মীমাংসা করা যাইবে?

পরমহংসদেবকে এক স্থানে আমরা পতিতপাবন দয়াময় বলিয়া ফেলিয়াছি। কথাটী নিতান্ত উপেক্ষার বিষয় নহে। আমরা যে অন্ধ হইয়া সে কথা উল্লেখ করিয়াছি, অথবা তাঁহার মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে অসঙ্গত ও অকর্ত্তব্যকে কর্ত্তব্য জ্ঞান করিয়াছি, তাহা নহে। অলৌকিক কার্য্য দেখিয়া আমরা তাঁহাকে পতিতপাবন বলিতে বাধ্য হইয়াছি। আমরা যখন পরমহংসদেবের নিকট গমন করি, তখন আমাদের মনোভাব বাস্তবিক স্বতন্ত্র প্রকার ছিল। সে সময়ে আমরা সংসারের বিভীষিকায় নিতান্ত আকুলিত হইয়া, কোথায় তত্ত্বজ্ঞান পাইব, কে তত্ত্বকথা শ্রবণ করাইবে এবং কেমন করিয়া শান্তি লাভ করিব, এইরূপ চিন্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। ধার্ম্মিক কিম্বা সাধু হইব, তাহা একেবারেই উদ্দেশ্য ছিল না। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আমরা নিতান্ত নিরীশ্বরবাদী ছিলাম। কামিনীকাঞ্চনের দাসানুদাস তস্য দাস ছিলাম বলিলেও আমাদের প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করা হয় না। কামিনীর দাসত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া কর্ত্তব্য। কামিনীতে এ প্রকার আকৃষ্ট হইয়াছিলাম যে, উহার ভাব উপলব্ধি করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইত না।

চক্ষু এবং কর্ণ উভয়ে সর্ব্বদা প্রস্তুত ও সচকিত থাকিত। পথে ভ্রমণকালেই হউক, শকটারোহণে গমনসময়েই হউক,গঙ্গাস্নানকালেই হউক, কোন তীর্থাদি দর্শন করিতে যাইয়াই হউক, কিম্বা কার্য্যোপলক্ষে পাঁচ বাড়ীর অন্তঃপুর-মহিলাদিগের আপন বাটীতে আনয়ন করিয়াই হউক, কামিনীর রূপ দর্শন এবং মনন না করিয়া যে আমরা ক্ষান্ত হইতাম, তাহা নহে। সর্ব্বদা সকল বিষয়ের সুবিধা হয় না এবং হইবার নহে; সুতরাং মনোভাব কার্য্যে পরিণত করিতে কৃতকার্য্য হওয়া যায় নাই। সেইজন্য লোকের নিকট বাহ্যিক নির্দ্দোষী বলিয়া পরিচিত হইলেও, আমরা তাহা ছিলাম না। বাস্তবিক শপথ করিয়া বলিতে পারি যে,আমরা নর-পিশাচ-শ্রেণীর সভ্য ছিলাম, তাহার সন্দেহ নাই। দয়ার অবতার পরমহংসদেব, আমাদের অবস্থা দেখিয়া ক্রোড়ে করিয়া লইলেন। আমরা জানিতাম যে, আমরা পরীক্ষা দিতে আসি নাই, সে শক্তি আমাদের নাই। আমাদের মনের কথা ও কার্য্যকলাপ প্রকাশ করিতে বলিলে আমারা তাহা পারিব না—সে শক্তি নাই, সেরূপ মানসিক বলও নাই। মনে মনে প্রার্থনা ছিল যে, ঠাকুর আপনি অন্তর্য্যামী, মনের সকল কথাই জানিতে পারেন, তবে কেন আর লোকের নিকটে আমাদের অপদস্থ করিবেন। আপনাকে ভয় নাই, লজ্জা নাই, কিন্তু লোককে ভয় ও লজ্জা করি। তিনি দয়াপরবশে সে প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন। কিন্তু তথাপি মনের আসক্তি একেবারে দূর হইল না। চিরকাল যাহাকে আদর করিয়া যত্নপূর্ব্বক আশ্রয় দিয়াছি, সে কেমন করিয়া এক কথায় বিদায় হইবে, যাই-য়াও যাইতে চাহে না। যদিও যে কামিনীদিগকে স্ত্রীর স্থানে বসাইতে লালায়িত হইতাম, তাহাদের এক্ষণে প্রভুর প্রসাদে অকপটে মাতৃস্থানে সংস্থাপন পূর্ব্বক মাতৃ সম্বোধন করিতে সমর্থ লাভ করিলাম, কিন্তু তথাপি পাজী মন এখনও সুবিধা পাইলে পলাইতে চেষ্টা করিত। এক দিন কোন স্ত্রীলোককে দেখিয়া, মন পূর্ব্ব পশুভাবে ছুটিল, কিন্তু সকল বন্ধন ছিঁড়িতে পারিল না; সুতরাং কিয়দ্দূর যাইয়া পুনরায় প্রত্যাগমন করিল। সেই দিনের ঘটনায় আমরা যারপরনাই দুঃখিত হইয়া পরমহংসদেবের নিকট যাইয়া আত্মদৌর্ব্বল্য প্রকাশ করিলাম। অভয়দাতা পরমহংসদেব, ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "সে জন্য চিন্তা নাই। যে বিষয়ে মনের দৃঢ় সংস্কার হয়, তাহা প্রায় যায় না। একদা আমি বর্দ্ধমানের পথে গো-যানে গমনকালীন পথিমধ্যে একটী 'সরাই'এতে বিশ্রাম করিতেছিলাম। একটী বলদের উপর আর একটীকে উঠিতে দেখিয়া

আমি আশ্চর্য্য হইলাম এবং ভাবিতে লাগিলাম, ইহারা দাম্‌ড়া, তথাপি এ প্রকার ভাব কেন? পরে বুঝিলাম যে, সহবাস রসাস্বাদন হইবার পর উহাদের 'বাঁধ' হইয়াছিল। সেইজন্য পূর্ব্বসংস্কার অদ্যাপি বিস্মৃত হয় নাই। তোমাদের সম্বন্ধেও তদ্রূপ।" এখনও যে আমরা সাধু হইয়াছি, তাহা নহে। তবে প্রভুর শক্তিতে হস্ত পদ আবদ্ধ আছে, কিছু করিয়া উঠিতে পারি নাই। পাখী উড়িতে না পারিলে পোষ মানে। কাঞ্চনের দাস হইয়া আমরা যে ভাবে দিন যাপন করিতেছিলাম, তাহারও কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। অর্থকে পৃথিবীর সারাৎসার পদার্থ বলিয়া আমাদের ধারণা ছিল। অদ্যাপি কি সে সংস্কার গিয়াছে? তাহা কে বলিতে পারে? ধনোপার্জ্জনের জন্য স্বাভাবিক পন্থা ব্যতীত যে কোন রূপে. অর্থাৎ বলে, কলে, কৌশলে, দুইটা পয়সা গৃহে আনিতে পারা যায়, এই আমাদের একমাত্র জ্ঞান ছিল। মিথ্যা-কথা, জুয়াচুরী, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি যে কোন ভাবে অর্থোপার্জ্জনপক্ষে সহায়তা হয়, তাহার অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা করিয়া দেখিবার কোন কারণ ছিল না। ফলে, যে সকল প্রক্রিয়াকে ভদ্রলোকেরা ঘৃণা করেন, বাস্তবিক সে সকল কার্য্যকে আমরা মন্দ বলিয়া একদিনও মনে করিতাম না। তবে উল্লিখিত কামিনীভাবের ন্যায়, রাজদণ্ডের ভয়েই হউক, কিম্বা সুবিধা করিতে পারি নাই বলিয়াই হউক, মনের সাধ পূরিয়া কার্য্য করিতে পারি নাই। স্বার্থ-পরতা সম্বন্ধীয় একটী দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ না করিয়া নিরস্ত হইতে পারি-তেছি না। পরমহংসদেবকে নানাস্থানে গমন করিতে দেখিয়া মনে হইত যে, কবে দয়া করিয়া আমাদের বাটীতে চরণধূলি দিয়া পবিত্র করি-বেন। কালক্রমে একদিন মনোভাব প্রকাশ করিয়া ফেলিলাম। তিনি অস্বীকার করিলেন। মনে তখন ভক্ত বলিয়া বিলক্ষণ অভিমান হইয়াছে, আপনার অবস্থা তখন ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছি, পরমহংসদেবের চেলা বলিয়া পরিচয় দিতে শিখিয়াছি, আর পায় কে? পরমহংসদেবের কথায় মনে বড়ই ব্যথা পাইলাম। কি বলিব কোন উপায় ছিল না। একদিন সহসা তিনি আমাদের বলিলেন, কবে তোমাদের বাটীতে যাইব? আমরা আকাশ থেকে পড়িলাম। কি বলিব, ভাবিয়া বলিলাম, যে দিন আপনার ইচ্ছা। তিনি দিন স্থির করিয়া দিলেন। পরমহংসদেব যদিও আমাদের বাটীতে আসিবেন বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, আমরা মৌখিক আনন্দের ভাব দেখাইয়া অন্তরে অন্তরে যারপরনাই বিরক্ত হইতে

থাকিলাম। এ প্রকার বিরক্তির কারণ অর্থব্যয়। কেবল এলে গেলে কাহারও ক্ষতি হয় না। তিনি যথায় যাইতেন, তথায় প্রায় দেড়শত বা দুইশত ভক্ত একত্রিত হইতেন। তাঁহাদের সকলকে পরিতৃপ্ত করিয়া ভোজন করাইতে হইলে দশ টাকা ব্যয় হইবার সম্ভাবনা। আমরা বিষয়ী, আমাদের এপ্রকার ব্যয় করিতে সত্য কথা বলিতে কি, ক্লেশকর বোধ হইল। একদিন যাঁহার চরণধূলি বাটীতে পড়িল না বলিয়া লোকের নিকট কত আড়ম্বরই করিয়াছিলাম, সেদিন গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলাম,কিন্তু অদ্য সেই ব্যক্তির কতদূর নীচ প্রকৃতি, তাহা সকলে দেখুন! এইরূপ ভক্তিতে আমরা ঈশ্বর লাভ করিব! এইরূপ হৃদয় লইয়া আমরা কোন্ সাহসে যে ভগবানের নিকট অগ্রসর হই, তাহা সময়ে সময়ে মনে হইলে, আপনার গালে আপনি করাঘাত করিলেও যথেষ্ট শাস্তি হয় না বলিয়া মনে হয়।

তাই বলি, আমাদের গুণে পরমহংসদেবকে পাই নাই, সে গুণ তাঁহারই। আমরা যাহা মনে করি, তাহা কি ঠাকুর কখন করিতে দেন? আমরা ইচ্ছা করিয়া প্রতিমুহূর্ত্তে বিষ পান করিতে চাই, তিনি যে তাহা কাড়িয়া লইয়া অমৃত প্রদান করিয়া থাকেন। আমরা কি অমৃত চাই? কখন নহে। তাঁহাকে আমাদের বাটীতে কদাচ আনা হইবে না বলিয়া স্থির নিশ্চয় হইল; কিন্তু তিনি তাহা শুনিলেন না। জোর করিয়া আমাদের নিতান্ত আন্তরিক অনিচ্ছাসত্ত্বেও (মুখে অবশ্যই স্বীকার করিয়াছিলাম) তিনি সেই দিবসে সমুদয় ভক্ত লইয়া আসিলেন এবং আনন্দ করিয়া যাইলেন। আমরা কিন্তু খুসি হইয়াও নিজের অর্থব্যয়জনিত অন্যের ন্যায় প্রাণটা ভরিয়া আনন্দ করিয়া লইতে পারিলাম না। চিকিৎসকেরা যেমন অপরের হাত পা কাটিয়া আনন্দ সম্ভোগ করেন, সেইরূপ অপরের ব্যয়ে উদর পূরিয়া প্রসাদ পাইয়া সংকীর্ত্তন করিলে যে পরিমাণে লাভ হইল বলিয়া আনন্দ হয়, সে প্রকার কি নিজ ব্যয়ে হইবার সম্ভাবনা? এক ব্যক্তি বেশ্যার জন্য ফুলের মালা ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেছিল। তাহার অমনোযোগিতাবশতঃ একছড়া মালা পথে পড়িয়া কাদা লাগিয়া গেল। সে মনে করিল, কাদা লাগা ফুল সে লইবে না। তবে কি করে? ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে মনে স্থির করিল যে, ঈশ্বর ত সর্ব্বব্যাপী,তিনি এস্থানেও আছেন, এ মালা তাঁহার গাত্রেই দেওয়া হইয়াছে। আমরা অবশেষে মনে মনে ঐ প্রকার মীমাংসা করিয়া অর্থব্যয়ের কষ্ট নিবারণ করিয়া লইলাম।

কিন্তু দয়াময় ঈশ্বরের কি মহিমা! কাহাকে তিনি কোন্ পথে কি ভাবে কেমন করিয়া কৃতার্থ করেন, তাহা জীব-বুদ্ধি কেমন করিয়া বুঝিবে অথবা ধারণা করিতে সমর্থ হইবে? আমরা যে ভাবে পরমহংসদেবের পূজা করিলাম, তাহা সকলে অবগত হইয়াছেন, ইহার ফল কি হইতে পারে? কপটের পুরস্কার কি হয়? স্বার্থপরের পরিণাম কি হইয়া থাকে? যাহা হইল, তাহা বেদ-বিধি ছাড়া, কেহ কোথাও খুঁজিয়া পাইবেন না, অথবা কেহ অনুমান করিতেও পারিবেন না।

ইতিপূর্ব্বে তাঁহার উপদেশে আমরা আস্তিক হইয়াছিলাম। উপদেশ অর্থে কেবল মুখের কথা নির্দ্দেশ করিতেছি না। উপদেশ বলিলে আমরা যাহা সচরাচর বুঝিয়া থাকি, অর্থাৎ কতকগুলি বাক্যের কৌশল, এ উপদেশ সেরূপ নহে। আমরা যখন তাঁহাকে ঈশ্বর আছেন কি না, এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে, "দিনের বেলায় সূর্য্যের কিরণে একটীও তারা দেখা যায় না, সেইজন্য তারা নাই একথা বলা যায় না। দুগ্ধে মাখন আছে, দুগ্ধ দেখিলে কি মাখনের কোন জ্ঞান জন্মে? মাখন দেখিতে হইলে দুগ্ধকে দধি করিতে হয়, পরে উহা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে (ইচ্ছামত সময়ে হইবে না) মন্থন করিলে, মাখন বাহির হইয়া থাকে। যেমন বড় পুষ্করিণীতে মাছ ধরিতে হইলে অগ্রে যাহারা তাহাতে মাছ ধরিয়াছে, তাহাদের নিকটে, কেমন মাছ আছে, কিসের টোপে খায়, কি চার প্রয়োজন, এই সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, যে ব্যক্তি মাছ ধরিতে যায়, সে ব্যক্তি নিশ্চয় সিদ্ধ মনোরথ হইয়া থাকে। ছিপ ফেলিবামাত্র মাছ ধরা যায় না, স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে হয়। পরে সে 'ঘাই ও ফুট' দেখিতে পায়। তখন তাহার মনে মাছ আছে বলিয়া বিশ্বাস হয় এবং ক্রমে মাছ গাঁথিয়া ফেলে। ঈশ্বর সম্বন্ধেও সেই প্রকার। সাধুর কথায় বিশ্বাস, মন-ছিপে, প্রাণ-কাঁটায়, নাম টোপে, ভক্তিচার ফেলিয়া অপেক্ষা করিতে হয়, তবে ঈশ্বরের ভাবরূপ 'ঘাই ও ফুট' দেখিতে পাওয়া যাইবে। পরে একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার হইবে।" আমরা ঈশ্বরই মানিতাম না, তাঁহার রূপ দেখা যাইবে, একথা কে বিশ্বাস করিবে? আমাদের এই ধারণা ছিল যে, ঈশ্বর নাই। যদি থাকেন, আমাদের ব্রাহ্ম পণ্ডিতদিগের মতে তাহা নিরাকার, ব্রাহ্মসমাজে বেড়াইয়া তাহা শুনিয়া রাখিয়াছিলাম। বিশ্বাস হইবে কিরূপে? পরমহংসদেব আমাদের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "ঈশ্বর প্রত্যক্ষ বিষয়। যাঁহার

মায়া এত সুন্দর ও মধুর, তিনি কি অপ্রত্যক্ষ হইতে পারেন? দেখিতে পাইবে।" আমরা কহিলাম, "সব সত্য, আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহার বিরুদ্ধে কে কথা কহিতে পারিবে? কিন্তু এই জন্মে কি তাঁহাকে পাওয়া যাইবে?" তিনি বলিলেন, "যেমন ভাব তেমন লাভ, মূল কেবল প্রত্যয়"। এই বলিয়া একটী গীত গাহিলেন,

"ভাবিলে ভাবের উদয় হয়।
যেমন ভাব তেমন লাভ মূল সে প্রত্যয়।
কালী পদ সুধা হ্রদে, চিত্ত ডুবে রয়।
(যদি চিত্ত ডুবে রয়)
তবে, জপ যজ্ঞ পূজা বলি কিছুই কিছু নয়।"

তিনি পুনরায় বলিলেন, "যে দিকে যত পা যাওয়া যায়, বিপরীত দিক্ তত পশ্চাৎ হইয়া পড়িবে, অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে দশহাত গমন করিলে পশ্চিম দিকের দশহাত পশ্চাৎ হইবেই হইবে।" আমরা তথাপি বলিলাম যে, ঈশ্বর আছেন বলিয়া প্রত্যক্ষ কিছু না দেখিলে, দুর্ব্বল অবিশ্বাসী মন কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না।" পরমহংসদেব বলিলেন, "সান্নিপাতিক রোগী এক পুকুর জল পান করিতে চায়, এক হাঁড়ী ভাত খাইতে চায়, কবিরাজ কি সে কথায় কখন কাণ দেন? আজ জ্বর হইয়াছে, কাল কুইনাইন দিলে কি জ্বর বন্ধ হয়? না, ডাক্তার রোগীর কথায় তাহা ব্যবস্থা করিতে পারেন? জ্বর পরিপাক পাইলে ডাক্তার আপনি কুইনাইন দিয়া থাকেন, রোগীকে আর কিছু বলিতে হয় না।" আমাদের ব্যস্ত চিত্ত কিছুতেই স্থির হইল না।

দিন কতক পরে আমাদের মনে নিতান্ত ব্যাকুলতা আসিল। সেই সময়ে একদিন রজনী অবসানকালে স্বপ্নে দেখিলাম যে, পূর্ব্বপরিচিত এক সরোবরে আমরা স্নান করিয়া উঠিলাম। পরমহংসদেব নিকটে আসিয়া একটী মন্ত্র প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, "প্রত্যহ স্নানের পর আর্দ্র বস্ত্রে একশত বার জপ করিবে।" নিদ্রা ভঙ্গের পর আনন্দে শিহরিয়া উঠিলাম এবং তৎক্ষণাৎ দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার নিকটে যাইয়া স্বপ্নবৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া বলিলাম। এই কথা শুনিয়া পরমহংসদেব অতিশয়আহ্লাদিত হইলেন এবং নানাবিধ উপদেশ দিয়া, স্বপ্নে মন্ত্র পাওয়া নিতান্ত সৌভাগ্যের কথা, বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। আমরা এমনই জন্ম-অবিশ্বাসী, ইহাতেও বিশ্বাস হইল না। পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল কি একদিনে যাইবে? স্বপ্ন মস্তিষ্কের বিকার, উদর

উষ্ণ হইলে এবং মনে এক বিষয় সর্ব্বদা চিন্তা করিলে, তাহা স্বপ্নে দেখা যায়, একথা ইংরাজী-বিদ্যা-বিশারদ জ্ঞানী-প্রবরেরা বলিয়াছেন। এ সংস্কার— পরমহংসদেবের কথায় কি দূর হইতে পারে? কি করিব, চুপ করিয়া ফিরিয়া আসিলাম।

তদনন্তর দিন দিন অশান্তি আসিয়া আমাদের হৃদয় অধিকার করিল। পূর্ব্বে কোন দিন কোন সুন্দরী স্ত্রী দেখিলে তাহার ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া, দু'শ মজা সম্ভোগ করিয়া লইতাম, এখন আর সে ভাব আসে না। অশান্তি দূর করিবার নিমিত্ত সুন্দরীর ছবি হৃদয়মাঝে আনিতে চেষ্টা করি, কিন্তু তাহা আর স্থান পায় না। যে বিষয়ের অনুরোধে একদিন প্রভুর আসাও উপেক্ষা করিয়াছিলাম, তাহার সংস্পর্শে বরং অশান্তি দ্বিগুণ হইয়া উঠিতে লাগিল। মনে হইত, যেন এ পৃথিবী আমাদের জন্য বায়ুশূন্য হইয়াছে। বক্ষঃস্থলের ভিতর, থেকে থেকে, যেন কেমন এক প্রকার ক্লেশকর ভাব অনুভব করিতাম। তখন আপনা-আপনি আক্ষেপ করিয়া কহিতাম, কি কুক্ষণেই পরমহংসদেবের কাছে আমরা গিয়াছিলাম, কেন আমাদের এ দুর্ব্বুদ্ধি হইয়াছিল! তখন কি কেহ বন্ধু ছিল না, যাহারা এই অশান্তির রাজ্য হইতে আমাদের প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিত? এখন উপায় কি? ঈশ্বর আছেন কি না, তাহা স্থির হইল না। কথায় কে বিশ্বাস করে? যদি এমন আভাস পাওয়া যায় যে, ঈশ্বর বলিয়া কেহ আছেন, তাহা হইলে চুপ করিয়া থাকিতে পারি। জ্ঞান-বিচারে ঈশ্বর নিরূপণ করা পাগলের কথা। কেবল জ্ঞানে ঈশ্বর আছেন বলাও যাহা, আর ঈশ্বর নাই বলিয়া মনে দৃঢ় ধারণা করিয়া রাখাও তদ্রূপ। এই প্রকার অবস্থায় আমরা কিয়দ্দিবস অবস্থিতি করিলাম। একদিন বেলা এগারটার সময় পটলডাঙ্গার গোলদিঘির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে আমরা দুইজনে আমাদের মনোদুঃখ বলাবলি করিতেছিলাম, এমন সময়ে একটী শ্যামকায় ব্যক্তি ঈষৎ হাস্য করিয়া, নিকটে আসিয়া, মৃদুস্বরে বলিলেন, **"ব্যস্ত হ'চ্চ কেন, স'য়ে থাক।"** আমরা চমকিয়া উঠিলাম। কে আমাদের প্রাণের কথা বুঝিয়া অশান্তিরূপ প্রজ্বলিত হুতাশনে "ব্যস্ত হ'চ্চ কেন, স'য়ে থাক" রূপ আশা-বারি ঢালিয়া দিলেন? কে আমাদের অন্তররাজ্যে প্রবেশ করিয়া অন্তরের কণ্টক-বৃক্ষ ছেদন করিয়া শান্তি স্থাপন করিলেন? এই কি ঈশ্বরের "ফুট" "ঘাই"? কি এ? তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া দেখি, আর তিনি নাই। কোন্ দিকে যাইলেন, দেখিতে পাইলাম না।

আমরা দুই জনে পাতি পাতি করিয়া দেখিলাম, তাঁহাকে আর দেখা গেল না। আরও সন্দেহ বাড়িল, আরও আনন্দ উথলিয়া উঠিল। কি দেখিলাম, কি শুনিলাম, এ যে অমৃতবৎ প্রাণ-সংরক্ষিণী জীবন-সঞ্জীবনী আকাশবাণীর মত হইয়া গেল! বেলা এগারটা, আমরা দুইজনে, সুস্থ দেহে, সুস্থ মনে দাঁড়াইয়াছিলাম। চক্ষের দোষ ছিল না, কারণ, সকলকে পূর্ব্বের ন্যায় দেখিতেছিলাম। কাণের বিকৃতাবস্থা হয় নাই, কারণ, তাহাতেও পূর্ব্ববৎ শ্রবণ করিতেছিলাম। তবে দেখিলাম কি! শুনিলাম কি! আমরা দুই জনে শুনিলাম, দুই জনে দেখিলাম, দুই জনের এক সময়ে এক প্রকার দর্শনের এবং এক প্রকার শ্রবণের বিকার জন্মিল! এ প্রকার বিকারকেও ধন্য, এ প্রকার দর্শন ও শ্রবণকেও ধন্য! আমরা দক্ষিণ দিকে বহুবাজার পর্য্যন্ত দেখিলাম, সে দিকে তিনি নাই; পশ্চিমের দিকে কলুটোলা পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছিল, সে দিকেও তিনি নাই; উত্তরের দিক হইতে ত আসিলেন, পূর্ব্বে যাইতে হইলে আমাদের সম্মুখ দিয়া যাইতে হইবে। তাঁহার অদৃশ্য হওয়ার কোন কারণ নিরূপিত করিতে পারিলাম না। কিন্তু সেই দিন এই ধারণা হইল যে, ঈশ্বর আছেন। পরমহংসদেবকে এই সংবাদ প্রদান করা হইল, তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মৃদু হাস্যে কহিলেন, "কত কি দেখিবে।"

এতদিনে বাস্তবিক আমাদের শান্তি হইল এবং মনের অন্ধকারপুঞ্জ বিদূরিত হইতেছে বলিয়া বুঝিলাম। আমরা ক্রমে আনন্দের আভাস পাইতে লাগিলাম। সময়ে সময়ে হৃদয়মাঝে কেমন এক প্রকার ভাব হইত, পরে উহা পরিবৃদ্ধি হইয়া এ প্রকার উচ্চ হাস্যের ফোয়ারা ছুটাইত যে, আমরা ক্রমাগত অর্দ্ধ ঘণ্টা হাসিয়া ক্লান্ত হইয়া যাইতাম। কখন এত রোদন করিতাম যে, নয়নজলে বস্ত্র ভিজিয়া যাইত। কখন কথায় কথায় হাসি এবং কথায় কথায় কান্না আসিত। এ ক্রন্দন বিরহজনিত নহে। এই সময়ে আমরা সন্ন্যাসব্রত লইবার জন্য পরমহংসদেবকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন; "ইচ্ছা করিয়া কিছু হয় না এবং করিতেও নাই। ঈশ্বর কাহাকে কি করিবেন, তাহা তিনিই জানেন। বিশেষতঃ পুষ্করিণীতে যেমন মাছের ছানার ঝাঁকের নিয়ন্ত্রিত ধাড়ি মাছটাকে মারিয়া ফেলিলে, অন্য মাছ ছানাগুলিকে খাইয়া ফেলে, সেই প্রকার তোমাদের সংসার ত্যাগ করাইলে, স্ত্রী পুত্রাদিরা কোথায় যাইবে? ভগবান্ এখন এক প্রকার বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছেন, আবার তাঁহাকে নূতন ব্যবস্থা করিতে হইবে। সময় হইলে সকল

দিকে সুবিধা হইবে।" এ কথা আমরা শিরোধার্য্য জ্ঞান করিলাম। সহজে সংসার ছাড়িবে কে? তখন আমরা আপনাদিগকে উন্নত মনে করিয়া লইয়াছিলাম। তখন আমরা বৈরাগ্যকে সার ধর্ম্ম জ্ঞান করিয়াছিলাম। অন্য কিছু হউক বা নাই হউক, লোকের নিকটে সম্মান পাইবার বিলক্ষণ সুবিধা। বৈরাগী হইয়া আপনার মাথা আপনি কিনিব। কিন্তু লোকে তাহার জন্য লালায়িত হইয়া বেড়াইবে। বিনা শারীরিক ক্লেশে, সুখ স্বচ্ছন্দে দিন যাপন হইয়া যাইবে। সকলের উপর সহজে একাধিপত্য স্থাপন করিবার বৈরাগী হওয়া ভিন্ন দ্বিতীয় পন্থা নাই। আমরা পুনরায় সন্ন্যাসী হইবার চেষ্টা করিলাম। মনে বড় সাধ হইল যে, লালাবাবুর মত অক্ষয় নামটা রাখিয়া যাই। কিন্তু হইবে কি? পরমহংসদেব কহিলেন, "সংসার ছাড়িয়া যাইবে কোথায়? সংসারের সহিত কেল্লার তুলনা দেওয়া হয়। কেল্লার মধ্যে থাকিয়া যেমন শত্রুর সহিত যুদ্ধ করা সহজ, কারণ, তথায় রসদ ও গোলাগুলী অধিক পরিমাণে জমা করা থাকে। মাঠে যাইয়া যুদ্ধ করা তেমন নহে, তাহা দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া চলিতে পারে না। সেই প্রকার সংসারে সাংসারিক কার্য্য চারি আনা এবং অবশিষ্ট বারো আনা মনে ঈশ্বর সাধনা করিতে হয়। সংসারে বারো আনা বৈরাগ্য জন্মিলে, তখন সংসার ছাড়ায় ক্ষতি হয় না। তাহা না করিলে 'এক কৌপীনকো আস্তে'র ন্যায় হইতে হইবে।

"কোন অরণ্যে এক সাধু ছিলেন। তিনি ফলমূল ও কন্দাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। কুটীরাদি না থাকায় বৃক্ষের নিম্নদেশেই অবস্থান করিয়া বর্ষার জল, শীতের হিম এবং গ্রীষ্মের প্রচণ্ড সূর্য্যকর হইতে আপনাকে রক্ষা করিতেন। এই অরণ্যের সন্নিকটে লোকালয় ছিল। সুতরাং, তত্ত্ব-জ্ঞান-লুব্ধ ব্যক্তিরা সময়ে সময়ে তাঁহার নিকটে আসিয়া ভগবৎবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বিষয়াসক্ত চিত্তে কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিয়া যাইতেন। এই সাধুকে মধ্যে মধ্যে জনসমাজে উপস্থিত হইতে হইত বলিয়া লজ্জাবরোধক কৌপীন অবলম্বন করিতে হইয়াছিল।

"সাধু প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক নদীতে অবগাহন করিয়া শুষ্ককৌপীন ধারণ ও আর্দ্র কৌপীন পরিবর্ত্তন করিতেন এবং উহা শুষ্ক করিবার জন্য বৃক্ষের শাখায় রাখিতেন।

"কিছুদিন এইরূপে অতিবাহিত হইলে পর, সাধু একদা কৌপীন পরি-

বর্ত্তনকালীন দেখিলেন যে, ইন্দুরে উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিয়াছে। তিনি অগত্যা নূতন কৌপীন পরিধান করিতে বাধ্য হইলেন। সাধু যতই নূতন কৌপীন ব্যবহার করিতে লাগিলেন, ইন্দূর ততই নষ্ট করিতে লাগিল। সাধু ক্রমে কৌপীনের জন্য নিতান্ত চিন্তিত হইয়া পাঁচজনকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করায়, তাঁহারা বিড়াল পোষিবার জন্য পরামর্শ দিল। সাধু তৎক্ষণাৎ গ্রাম হইতে একটী বিড়ালশাবক আনয়ন করিলেন এবং তৎপর দিবস হইতে তাঁহার কৌপীন বিনষ্ট হওয়া স্থগিত হইয়া গেল। সাধুর আনন্দের সীমা রহিল না।

"বিড়াল স্বভাবতঃ মৎস্যাদি এবং দুগ্ধ ব্যতীত আহার করিতে পারে না। অরণ্যে সাধুর নিকট যাইয়াও সে ভাব পরিবর্ত্তন করিতে পারে নাই। সুতরাং, সাধুর সহিত ফলমূল ভক্ষণ করিতে পারিত না। আহার ব্যতীত উহা ক্রমে জীর্ণ শীর্ণ হইতে লাগিল। সাধু তখন কৃষ্ণের জীব এবং তাঁহার উপকারী জ্ঞানে গ্রাম হইতে বিড়ালের জন্য দুগ্ধ ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন।

"কিয়দ্দিবস পরে কোন ব্যক্তি বলিল যে, 'সাধুজী! আপনার প্রত্যহ দুগ্ধের প্রয়োজন। দুই এক দিবস ভিক্ষায় চলিতে পারে। বারো মাস কে আপনাকে ভিক্ষা দিবে? আপনি একটী গাভী আনয়ন করুন, তাহাতে প্রচুর দুগ্ধ হইবে, আপনি এবং আপনার বিড়াল উভয়েই পরিতৃপ্ত রূপে দুগ্ধ পান করিতে পারিবেন। সাধু এই পরামর্শ নিতান্ত অবস্থাসঙ্গত জ্ঞান করিয়া অবিলম্বে তাহাই করিলেন। সাধুকে আর দুগ্ধ ভিক্ষা করিতে হইল না।

"কাল সহকারে সেই গাভীর বৎস হইতে লাগিল এবং উহাদের জন্য বিচালী সংগ্রহ করা ক্রমে প্রয়োজন হইয়া উঠিল। তখন সাধু পুনরায় সকলের পরামর্শে পতিত জমিতে কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিলেন। তদ্দ্বারা ধান, কলাই ও বিচালী অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হইতে লাগিল। কৃষিকার্য্যের জন্য কৃষক নিযুক্ত করিতে ও তাহাদের জমা খরচ ও ধান্যাদির হিসাব রাখিতে সদাই তাঁহাকে নিযুক্ত হইতে হইল। যখন ধান চাল সঞ্চিত হইয়া আসিল, তখন তাহা রক্ষার্থ গোলাবাড়ী ও বিচালী দ্বারা নিজের ও ভৃত্য গবাদির গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া, তিনি প্রকৃত গৃহস্থের ন্যায় মহাব্যস্ত হইয়া দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

"একদিন সাধু আপন গৃহপ্রাঙ্গণে ভৃত্যাদি ও গ্রামবাসীদিগের সহিত

অন্যান্য বৈষয়িক কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন, এমন সময়ে তাঁহার গুরু আসিয়া উপনীত হইলেন। তিনি সর্ব্বাগ্রে বিস্মিত হইয়া সাধুর কোন ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই স্থানে একটী উদাসীন থাকিতেন, তিনি কোথায় গিয়াছেন বলিতে পার ?' গুরু এই কথা বলিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, হয় ত তাঁহারই ভ্রম হইয়া থাকিবে। তিনি ভুলিয়া অন্য কোন স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ভৃত্য কোন উত্তর প্রদান করিতে পারিল না। পরে তিনি ঐ সাধুর বাটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সম্মুখে তাঁহার শিষ্যকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বৎস ! এ সকল কি ?' শিষ্য অপ্রতিভ হইয়া, অমনি গুরুর চরণে প্রণতি পূর্ব্বক বলিলেন, 'প্রভু ! এক কৌপীন কো আস্তে।' এই কথা বলিয়া তাঁহার অবস্থান্তর হইবার আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন এবং সেই সকল বিষয়াদি তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিয়া গুরুর পশ্চাদ্গামী হইলেন *।"

আমরা অগত্যা নিস্তব্ধ হইয়া রহিলাম। পাঠক পাঠিকাগণ! পরমহংস-

* তাৎপর্য্য।—সাংসারিক ব্যক্তিরা এইরূপে বন্ধনের উপর বন্ধন দ্বারা আপনাকে আপনি অজ্ঞাতসারে আবদ্ধ করিয়া রাখে। আত্মসংরক্ষক জ্ঞান-কৌপীন অজ্ঞান-মূষিক কর্ত্তৃক বিখণ্ডিত হওয়া নিবারণ হেতু যে সকল উপায় অবলম্বনের প্রণালী আছে, তাহাতে আশু উপকার হয় বটে, কিন্তু এতদ্দ্বারা পরিশেষে সমধিক ক্লেশের কারণ হইয়া থাকে। তখন প্রকৃত উদ্দেশ্য বিলুপ্ত হইয়া বাহ্যিক কার্য্যেরই আড়ম্বর হইয়া পড়ে। যেমন, আত্মরক্ষা হেতু বিদ্যাশিক্ষা, স্ত্রীলাভ এবং ধনোপার্জ্জনাদির নানাবিধ বিধি আছে। সংসারক্ষেত্রে যাহাতে ভ্রমসঙ্কটে পতিত না হইয়া বিশুদ্ধ জ্ঞানোপার্জ্জন করা যায়, তাহার জন্য বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজন। কিন্তু ইহা দ্বারা অহংভাবের এতদূর প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে যে, অভিমানের কার্য্যেই সমস্ত সময়াতিবাহিত হইয়া যায়। চরিত্র রক্ষাই স্ত্রী সহবাসের বিশেষ উদ্দেশ্য, কিন্তু তাহাতে সন্তানাদি উৎপন্ন হইয়া নূতন চিন্তার স্রোত খুলিয়া দেয়, অর্থাৎ সন্তানের শারীরিক মঙ্গলামঙ্গল কামনা, তাহাদের পরিণয় কার্য্যাদি দ্বারা কুটুম্বাদির সহিৎ সম্বন্ধ রক্ষা, সন্তানাদির সন্তান হইলে আনন্দে অভিভূত হওয়া ইত্যাদি। শরীর রক্ষার্থ ধনোপার্জ্জন। ধনের দ্বারা যেরূপ অভিমানের প্রাবল্য হইয়া থাকে, সেরূপ আর কিছুতে হইতে পারেনা। ধনী ব্যক্তিরা যে প্রকার অন্যায় কার্য্য করিয়া থাকেন, তাহা আর কাহারও অবিদিত নাই। মনুষ্যেরা এইরূপে আত্মবিস্মৃত হইয়া কার্য্যের হিল্লোলে নিয়ত ঘূর্ণিত হইয়া থাকে। যৎকালে তাহারা একেবারে আত্মহারা হয়, তখন ভগবান্ গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়া জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দিয়া থাকেন।

এ স্থানে যদিও ভগবান্ পরিত্রাণ করেন বটে, কিন্তু পূর্ব্ব হইতে সতর্ক হইলে কর্ম্মফলজনিত অশেষ দুঃখ ভোগ হইতে মুক্তিলাভ করিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা থাকে।

দেবের কতদূর অন্তর্দৃষ্টি ছিল, এই বার তাহা বুঝিয়া লইবেন। আমরা সাধু হইয়াছি, তাহার পরিচয় দিলাম। কিন্তু এই বার সাধুদিগের পরীক্ষার দিন উপস্থিত হইল। এ পর্য্যন্ত মনে বিলক্ষণ শান্তি রহিয়াছিল এবং পরমানন্দে দিন কাটাইতেছিলাম। কি জানি কেন, মন একেবারে অশান্তি-সাগরে ডুবিয়া বুকের ভিতরটা শূন্য হইয়া পড়িল এবং মরুভূমি-প্রায় বোধ হইল। আমরা ভাবিয়া আর কূল পাইলাম না। পরমহংসদেবের নিকট পুনরায় দুঃখকাহিনীর দোকান খোলা হইল। তখন তিনি আর এক ভাব দেখাইলেন। তিনি কহিলেন, "আমি কি করিব, সকলই হরির ইচ্ছা।" আমরা আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহাকে বলিলাম, "সে কি মহাশয়! আপনার আশায় এত দিন যাতায়াত করিতেছি, এখন এ প্রকার কথা বলিলে, আমরা কোথায় যাইব?" তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আমি তোমাদের কিছু খাইও নি, লিইও নি। আমার দোষ কি? ইচ্ছা হয় আসিও, না হয় না আসিও। তোমরা যে সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী * করিয়াছ, তাহা লইয়া যাও।" এই নিদারুণ কথা তাঁহার প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া আমরা দর্শদিক্ শূন্য বোধ করিলাম। একবার মনে হইল যে, পৃথিবী! তুমি বিদীর্ণ হইয়া আমাদের উদরস্থ করিয়া ফেল! আবার মনে হইল, না, নিকটে গঙ্গা আছেন, রজনীযোগে জোয়ারের সময়ে ডুবিয়া মরিব! এই স্থির করিয়া তাঁহার সম্মুখ হইতে স্থানান্তরে প্রস্থান করিলাম। তখন মনে হইল, মরিব কেন, একবার চেষ্টা করিয়া দেখি। পরমহংসদেব বলিয়াছেন যে, স্বপ্নসিদ্ধ ব্যক্তি সৌভাগ্যবান্। আজ সেই মন্ত্রের বিক্রম পরীক্ষা করিব। শুনিয়াছি, ভগবান্ হইতে তাঁহার নাম বড়। তিনি যত রূপ ধারণ করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহা গিয়াছে ও যাইতেছে, কিন্তু নাম চিরকাল সমভাবে রহিয়াছে ও থাকিবে। এই ভাবিয়া পরমহংসদেবের গৃহের উত্তর দিকের বারাণ্ডায় শয়ন করিয়া রহিলাম এবং মনে মনে সেই মন্ত্র জপ করিতে লাগিলাম। অতি গভীর রাত্রে পরমহংসদেব সহসা সেই দিকের দ্বার খুলিয়া আমাদের নিকটে আসিয়া উপবেশন করিলেন এবং ভক্ত সেবা করিবার আজ্ঞা দিয়া চলিয়া গেলেন। আবার কি বিপদ্! ভক্ত সেবা করিবে কে? তাহাতে অর্থব্যয় আছে। অর্থব্যয় করিয়া ধর্ম্ম করা—তখনও সে শক্তি হয় নাই। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে আমরা বৈরাগী লালা

* ভক্তেরা যখন পরমহংসদেবের নিকট থাকিতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁহাদের নিমিত্ত সুরেন্দ্র বাবু কিছু দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন।

বাবুর মত হইতে গিয়াছিলাম। অত অনুরাগ, অত আত্মধিক্কার, গঙ্গায় ডুবিয়া মরিব, এ সকল ভাব এক কথায় উড়িয়া গেল। ধন্য বৈরাগ্য! ধন্য তোমার লীলা! সে যাহা হউক, আমরা ইচ্ছা করিয়া সে সকল কথা ভুলিতে চেষ্টা করিলাম,ফলে ভুলিয়া যাইলাম। দিনকতক পরে বৈশাখি পূর্ণিমার দিন,পরমহংসদেব পূর্ব্বের ন্যায় আপন ইচ্ছায় আমাদের বাটীতে আসিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। কি করিব চিন্তা করিয়া অন্য ভক্তের বাটীতে যাহাতে তিনি সেই দিন গমন করিতে পারেন, তাহার বিধিমত চেষ্টা পাইতে লাগিলাম এবং বলিলাম যে, আমাদের বাটীতে স্থানাভাব, নিকটে গয়লাপাড়া, অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত স্থান, পরমহংসদেবের কষ্ট হইবে, ইত্যাকার সহস্র আপত্তি উত্থাপন করিলাম। পরমহংসদেব যে সময়ে ভক্ত সেবার কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, আমরা সেই সময়ে বলিলাম যে, "অর্থ দিবার কর্ত্তা যিনি, তিনিই দিবেন, আমরা ভৃত্যবিশেষ, দ্রব্যাদি কিনিয়া আনিয়া দিব।" এই সময়ে আমাদের অর্থোপার্জ্জনের বিলক্ষণ সুবিধা হইয়াছিল এবং কয়েক দিনে শত শত মুদ্রা সংগ্রহ হইয়াছিল। পাষণ্ড আমরা, সেই অর্থগুলি একত্রিত করিয়া স্ত্রীর নিকট লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম। তখন একবার মনে হয় নাই যে, এ প্রকার অর্থ আসিতেছে কেন? অর্থগুলি আপনারা আত্মসাৎ করিয়া অন্যের স্কন্ধে পরমহংসদেবকে ফেলিবার প্রয়াস পাইয়া কৃতকার্য্য হইলাম। যদিও কোন ভক্ত সেই দিনে তাঁহার বাটীতে পরমহংসদেবকে লইয়া যাইতে স্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু অন্তরের সহিত নহে। সে যাহা হউক, যখন আমাদের মস্তকের বোঝা গেল, আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া রজনী যাপন করিলাম। প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগকালে পূর্ব্বের যাবতীয় কথা একে একে স্মরণ হইতে লাগিল। অর্থ কেন আসিয়াছে, কেন পরমহংসদেব বৈশাখী পূর্ণিমার দিন আসিবেন বলিয়াছেন, ইহার ভাব যেন দেখিতে পাইলাম। তখন মনে হইল যে,এই আমরা বৈরাগ্য লইতে গিয়াছিলাম? ধিক্! ধিক্! এমন কীটানুকীট আমরা, যে প্রভুর অর্থ আত্মসাৎ করিবার সময় মনে একবার চিন্তা হইল না! আমরা হইব বৈরাগী! বাস্তবিক বৈরাগীর ভাবই বটে! আপন পর বিচার নাই,হাতে এলেই আমার। বলিহারী বৈরাগ্য ভাব, সাবাস বৈরাগী ঠাকুর! এই ঘটনায় বাস্তবিক আমাদের নির্ল্লজ্জ চক্ষে লজ্জা আসিয়াছিল। কেমন করিয়া পরমহংসদেবের নিকটে মুখ দেখাইব, কেমন করিয়া একথা অন্য ভক্তদিগকে বলিব, ভাবিয়া ম্রিয়মাণ হইয়াছিলাম। এবারে অতি সযত্নে হৃদয়ের সহিত ভক্তসেবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

যথাদিনে যথাসময়ে পরমহংসদেব শুভাগমন করিলেন এবং যথানিয়মে মহোৎসব কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন পূর্ব্বক আনন্দের হাট বাজার সংস্থাপন করিয়া যথাসময়ে দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন করিলেন।

পরমহংসদেবের সহিত সাক্ষাৎ হইবার কিছুদিন পরে আমরা চৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। যতই চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করি, ততই যেন পরমহংসদেবকে দেখিতে পাই। মনে হইতে লাগিল, এই গ্রন্থখানি যেন পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্তবিশেষ। আমাদের মনে একটা নিতান্ত সন্দেহ জন্মিয়াছিল। সন্দেহ হইবারই কথা; কথাটাত একটা কথার কথা নহে। একদিন পরমহংসদেব দক্ষিণেশ্বরে রাত্রি যাপন করিতে আমাদের আজ্ঞা করেন। আমরা তাহা স্বীকার করিয়াছিলাম। ঠিক্ সন্ধ্যার সময়ে তাঁহার গৃহে আমরা বসিয়া আছি, তথায় পরমহংসদেব ব্যতীত আর কেহ ছিলেন না। তিনি অতি প্রশান্তভাবে কিয়ৎকাল বসিয়া থাকিয়া আমাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দেখিতেছ ?" আমরা বলিলাম, "আপনাকে দেখিতেছি।" পরমহংসদেব পুনরায় কহিলেন, "আমাকে কি মনে কর ?" আমরা বলিলাম, "আপনাকে শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়া জ্ঞান হয়।" পরমহংসদেব কিয়ৎকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিতে লাগিলেন, "বামৃণী ঐ কথা ব'লৃতো বটে।" তদবধি আমাদের মনে এক প্রকার কি অস্পষ্ট ভাব হইয়া রহিল, উহা বিশেষরূপে বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু সেদিনকার কথাটী নিতান্ত গুরুতর বলিয়া ধারণা হইয়াছিল। আমরা প্রতিদিন পরমহংসদেবের অমানুষ শক্তির অনেক কার্য্যই দেখিতাম, তাহা স্থানে স্থানে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। আমরা যে দিন যাহা শ্রবণ করিব বলিয়া মনে করিয়া গিয়াছি, সেই দিন সেই কথাই শ্রবণ করিয়াছি। যে যেখানে যাহা করিত, তিনি সকল বিষয় জানিতে পারিতেন। তিনি জিলিপি খাইতে বড় ভালবাসিতেন। সেইজন্য আমরা একদিন শ্যামবাজারের মোড়ের দোকান হইতে জিলিপি খরিদ করিয়া দক্ষিণেশ্বরে যাইতেছিলাম। পুলের দক্ষিণদিকে একটা চার পাঁচ বৎসরের ছেলে একখানি জিলিপির জন্য গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। আমরা প্রথমে তাহাকে ধমকাইয়া তাড়াইবার চেষ্টা করিলাম। সে শুনিল না। পরে ভক্তমালগ্রন্থের একটী গল্প আমাদের মনে হইল। "এক সাধু রুটী প্রস্তুত করিয়া ঘৃত আনয়ন করিতে গিয়াছিলেন। প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন যে, একটী কুক্কুর রুটীগুলি মুখে করিয়া লইয়া যাইতেছে। সাধু কুক্কুরের পশ্চাৎ

ধাবিত হইয়া কহিলেন, রাম, অপেক্ষা কর, রুটীগুলি ঘি মাখাইয়া দি।" আমরা ভাবিলাম, এ ছোঁড়া বুঝি আমাদের ছলনা করিতেছে। কি জানি, যদি ঈশ্বরের কোন প্রকার কৌতুক হয়, তাহা হইলে, আমাদের অপকার হইবে, ইত্যাকার চিন্তা করিয়া, তাহাকে একখানি জিলিপি ফেলিয়া দিলাম। এ কথা আর কেহ জানিল না। দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছিয়া আমরা নির্দ্দিষ্ট স্থানে উহা সংস্থাপন পূর্ব্বক সমস্ত দিবস আনন্দ করিয়া কাটাইলাম। অপরাহ্নকালে পরমহংসদেব কিঞ্চিৎ জল পান করিতে চাহিলেন, আমরা ব্যস্তসমস্তে সেই জিলিপিগুলি প্রদান করিলাম। আশ্চর্য্য ব্যাপার, তিনি বামহস্তে তাহা স্পর্শ করিয়া উর্দ্ধদিকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক জিলিপি কয়েকখানি চূর্ণ করিলেন এবং মস্তক নাড়িয়া ভক্ষণ করিবার অনভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া হস্তধৌত করিয়া ফেলিলেন! এতদ্দৃষ্টে আমাদের বক্ষঃস্থলের ভিতর যে কি হইতেছিল, তাহা প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। জিলিপিগুলি তৎক্ষণাৎ ফেলিয়া দেওয়া হইল। দুই চারি দিন পরে আমরা পুনরায় পরমহংসদেবের নিকটে গমন করিলে, তিনি কহিলেন, "দেখ, তোমরা আমার জন্য যখন কোন সামগ্রী আনিবে, তাহার অগ্রভাগ কাহাকেও প্রদান করিও না। আমি ঠাকুরকে না দিয়া ভক্ষণ করিতে পারি না। উচ্ছিষ্ট দ্রব্য ঠাকুরকে কেমন করিয়া দিব?" এই প্রকার ঘটনা সর্ব্বদাই হইত, সুতরাং তাঁহার প্রতি আমাদের অবতারের ভাবই জন্মিয়াছিল।

উল্লিখিত ভক্তসেবার পরদিন সন্ধ্যার সময় আমরা তাঁহার নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। কত উপদেশ দিলেন, কত কথাই বলিলেন। কথায় কথায় রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল। সে দিন আকাশ মেঘাবৃত থাকায় অতিশয় অন্ধকার হইয়াছিল। দশটার পর আমরা বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক বাহিরের বারাণ্ডায় আসিয়া পশ্চাৎ দিকে চাহিয়া দেখি যে, পরমহংসদেব আসিতেছেন, আমরা সম্মুখে ফিরিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি নিকটে আসিয়া কহিলেন, "কি চাও"? "কি চাও" কথা যেন বিদ্যুতের ন্যায় অন্তর ভেদ করিয়া চলিয়া গেল। ভাবিয়া দেখিলাম, চাহিব কি? মনে করিলাম, ধন চাই। তখনই মনে হইল, ছি ছি কাঞ্চন লইব না। অর্থ কি, তা জানি। তবে কি লইব? সিদ্ধিই প্রার্থনা করি। না, তাহার পরিণাম অতিশয় ভয়ানক; তবে লইব কি? তখন মনে হইতে লাগিল, এই ত ভগবান্ প্রত্যক্ষ করিতেছি, এই ত আমাদেরই ইষ্টদেব বর প্রদান করিতে সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। কি লইব? তখন মনে হইতেছে যে, এখন যাহা

চাহিব, তাহাই প্রাপ্ত হইব। কারণ, পরমহংসদেব আজ আমাদের প্রতি কল্পতরু হইয়াছেন। অদ্যাবধি যাহা কেহ পাইয়াছেন কি না, জানি না; কত লোকে আসা যাওয়া করিতেছে, তাহারা হতাশের কথাই বলে, সাধন ভজনের কথাই বলে, ঈশ্বর লাভ করিতে হইবে বলিয়া কর্ম্ম অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়, আমি কিছু পাইয়াছি, আমায় সাধু কৃপা করিয়াছেন, এ কথা কেহ বলে না, কাহার হৃদয়ে শান্তির কথা বাহির হয় না। এ কি নূতন কথা? এ কি আজ আমাদের নবভাব? প্রভু "কি চাও" বলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, আমরা চাহিব কি ভাবিয়া দিশেহারা হইলাম। অতঃপর কহিলাম, "প্রভু! চাহিব কি, তা' জানি না! অনেক ভাবিয়া দেখিলাম, আপনার নিকটে কি লইব, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কি লইব, আপনি বলিয়া দিন।" তিনি তৎক্ষণাৎ কহিলেন, "মন্ত্রটী আমায় প্রত্যর্পণ কর, আর জপ তপের প্রয়োজন নাই।" এই স্বর্গীয় কথায় প্রাণ মাতিয়া উঠিল। কি শুনিলাম! এ কি সত্য? না কি স্বপ্ন দেখিতেছি? আর কাল বিলম্ব না করিয়া তাঁহার চরণে মস্তকাবনত করিয়া মনে মনে মন্ত্রটী পুষ্পাঞ্জলি দিলাম। তিনি ভাবাবেশে মস্তকের ব্রহ্ম-তালুর উপরিভাগে দক্ষিণ চরণের বৃদ্ধ অঙ্গুলী সংস্পর্শ করিয়া কতক্ষণ রহিলেন, তাহা জ্ঞান ছিল না। যখন তাঁহার ভাবাবসান হইল, তিনি চরণ সরাইয়া লইলেন এবং আজ্ঞা করিলেন যে, "যদি কিছু দেখিবার ইচ্ছা থাকে, ত আমায় দেখ এবং যখন আসিবে, এক পয়সার কোন দ্রব্য আনিবে।" আমরা তদবধি শান্তির রাজ্য লাভ করিয়াছি। এখন একদিনও মনে হয় না যে, আর আমাদের কোন কার্য্য আছে। তিনি আমাদের সর্ব্বস্ব ধন। যখন যে ভাবে, যে অবস্থায়, যে প্রকারে রাখেন, তাহাতেই পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকি। আমরা এই নিমিত্ত তাঁহাকে পতিতপাবন বলিতে বাধ্য হইয়াছি। তাঁহার নিকটে যাইবার সময় আমাদের যাহা প্রয়োজন ছিল, এক্ষণে তাহা পরিসমাপ্ত হইয়া গিয়াছে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, পরমহংসদেব আমাদের ন্যায় শত শত পাষণ্ড-দিগকে পরিত্রাণ করিয়াছেন। এই শ্রেণীর অনেকের কথাই অনেকেই জানেন। আমরা তাঁহাদের নামোল্লেখ করিয়া ঘটনাপরম্পরা লিপিবদ্ধ করিবার মনস্থ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহারা সাধারণের নিকট নিজ নিজ পূর্ব্ব পরিচয় প্রদান করিতে লজ্জিত এবং আপনাদিগকে এখনও পরমহংসদেব কর্ত্তৃক বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন কি না, বুঝিতে না পারায়, সাধারণ সমক্ষে পরমহংসদেবের

নামের সহিত কোন প্রকার সংস্রব রাখিতে চাহেন না। আমরা সেই সকল ব্যক্তিদিগের অভিপ্রায় স্পষ্ট বুঝিতে পারি নাই। তাঁহারা পরমহংসদেবের শিষ্য বলিয়া পরিচিত। যে কেহ তাঁহাদের শ্রদ্ধা করেন, তাহা পরমহংসদেবের সম্বন্ধ আছে বলিয়াই করিয়া থাকেন। কিন্তু সহসা তাঁহারা আমাদের নিকটে আসিয়া হস্ত বন্ধন করিয়া দেওয়ায় আমরা তাঁহাদের অভিপ্রায় স্থির করিতে পারিলাম না। হয়, তাঁহারা কিছু দিন পরে পরমহংসদেবকে উপেক্ষা করিয়া আপনাদিগকে সাধু মোহন্ত করিয়া তুলিবেন, না হয়, এক্ষণে পূর্ব্বকাহিনী প্রকাশ করিলে পাছে সর্ব্বসাধারণে তাঁহাদের পূর্ব্বাবস্থা জ্ঞাত হইতে পারেন, সেই লজ্জায় এ প্রকার অবৈধাচরণ করিয়াছেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কোন কোন ভক্ত আমাদের এ প্রকার কথাও কহিয়াছেন যে, কাহারও পূর্ব্বকার চরিত্র চিত্রিত করিলে, রাজদণ্ড পাইতে হইবে। আমরা রাজদণ্ডের ভয়ে যে তাঁহাদের নামোল্লেখ করিতে নিরস্ত হইয়াছি, তাহা নহে। এইরূপ যাঁহাদের হৃদয়ের ভাব, সে সকল লোকের বাস্তবিক পরমহংসদেবের নামের সহিত কোন সংস্রব না থাকাই কর্ত্তব্য। এই শ্রেণীর লোকেরা যে স্থানে থাকেন, সেই স্থানেই একটা বিভ্রাট ঘটাইবার চেষ্টা পান। আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, যদি এই সকল ব্যক্তিরা কিঞ্চিৎ ঐশ্বরিক শক্তি লাভ করিতে পারেন,তাহা হইলে সেই দিন ইহাঁদের মুখেও হৃদয় ঠাকুরের ন্যায় কথা বাহির হইবে।

যে সকল ব্যক্তিরা তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, তাঁহারাও প্রত্যেকে পরমহংসদেবের কৃপায় অদ্য মনুষ্যমণ্ডলে মনুষ্য বলিয়া পরিচয় দিবার যোগ্য হইয়াছেন।

ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে,আমাদের ন্যায় শত শত পাষণ্ড পরমহংসদেবের কৃপায় পরিত্রাণ পাইয়াছেন। এই সকল ব্যক্তিদিগের মধ্যে বাবু সুরেন্দ্রনাথ মিত্র এবং বাবু গিরিশ্চন্দ্র ঘোষের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিয়া, পরমহংসদেবের মহিমা কতদূর বিস্তৃত, তাহার পরিচয় দেওয়া যাইবে। সুরেন্দ্র বাবু (সুরেশ বলিয়া পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছেন) একজন কৃতবিদ্য এবং কলিকাতার সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভব ব্যক্তি। ইনি সওদাগরী আফিসের প্রধান বাঙ্গালী কর্ম্মচারী, সুতরাং তাঁহার অর্থোপার্জ্জন পক্ষে অসুবিধা ছিল না। সুরেন্দ্র বাবু বর্ত্তমান বাজারের লোক ছিলেন। ধর্ম্ম কর্ম্মাদি কিরূপ করিতেন এবং সে সম্বন্ধে তাঁহার কিরূপ ভাব বা সংস্কার ছিল, তাহা সবিশেষ বলা যায়

না ; কিন্তু পরমহংসদেবের নিকট গমনকাল পর্য্যন্তও তিনি দীক্ষিত হন নাই। এই নিমিত্ত বোধ হয়, তাঁহার ধর্ম্মভাব প্রবল ছিল না। হিন্দুসংস্কারাদি তিনি যদিও সমুদয় সমর্থন করিতেন না, কিন্তু তাঁহাকে অহিন্দু বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। তবে ইংরেজী ঢংটা কিছু ছিল, তাহা বর্ত্তমান কালের নিয়ম। সুরেন্দ্র বাবুর অন্য বিশেষ কোন গুণের পরিচয় আমরা পাই নাই বটে, কিন্তু তিনি যে একজন হৃদয়বান্ লোক, তাহার ভুল নাই। তিনি আমাদের মত নিরীশ্বরবাদী ছিলেন না, কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁহার যে কোন প্রকার জ্ঞান লাভ হইয়াছিল, তাহাও আমরা বুঝিতে পারি নাই। তাঁহার নিকটে শ্রবণ করিয়াছি যে,একদিন মধ্যাহ্নকালে আহারান্তে বহির্ব্বাটীতে তিনি দাঁড়াইয়াছিলেন, এমন সময়ে একটী কৃষ্ণবর্ণা, আলুলায়িতকেশা, রক্তবস্ত্রপরিধানা, ত্রিশুলহস্তা স্ত্রীলোককে রাজপথ দিয়া গমন করিতে দেখিলেন। ভৈরবী সুরেন্দ্রকে দেখিয়া কহিলেন, “বাবা! সব ফাঁকি,কেবল সেই সত্য”, এই বলিয়া চলিয়া গেলেন। সেই ভৈরবীকে দেখিয়া সুরেন্দ্রের একটু সাময়িক ভাবান্তর হইয়াছিল। সুরেন্দ্র বাবুর এই সময়ে নিতান্ত মানসিক ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার কারণ আমরা নির্দ্দেশ করিতে পারিলাম না, কিন্তু তাহাতে তাঁহার প্রাণ সংশয় হইয়াছিল। এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত সুরেন্দ্র বাবুর কোন পরম বন্ধু পরমহংসদেবের নিকটে লইয়া গিয়াছিলেন। পরমহংসদেব সুরেন্দ্র বাবুকে দেখিবামাত্র, এমন ভাবে উপদেশ দিয়াছিলেন যে, সেই জ্ঞানালোক তাঁহার দীর্ঘকালসঞ্চিত পূর্ব্ব-সংস্কার-তিমিরপুঞ্জ এককালে বিদূরিত হইয়াছিল। সুরেন্দ্র বাবু সেই দিনে ভবসমুদ্রের মধ্যে কূল পাইলেন, জীবনের লক্ষ্য কি বুঝিলেন এবং মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন। পরমহংসদেব তাঁহাকে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটী উপদেশ তাঁহার হৃদয়ে মূলমন্ত্রবৎ কার্য্য করিয়াছিল। পরমহংসদেব কহিয়াছিলেন যে, “লোকে বাঁদরছানা হইতে চায় কেন? বিড়ালছানা হইলে ত ভাল হয়। বাঁদরের স্বভাব এই যে, সে ইচ্ছা করিয়া তাহার মাতাকে জড়াইয়া ধরিলে,তবে সে তাহাকে স্থানান্তরে লইয়া যাইবে,কিন্তু বিড়ালছানার স্বভাব সেরূপ নহে। তাহার মাতা তাহাকে যে স্থানে রাখিয়া দেয়, সে সেই স্থানে পড়িয়া ম্যাও ম্যাও করিতে থাকে। বাঁদরছানার স্বভাব জ্ঞান-প্রধান এবং বিড়ালছানার স্বভাব ভক্তি-প্রধান সাধকদিগের সহিত তুলনা করা যায়।” সুরেন্দ্র বাবুর মন এই কথায় একেবারে মজিয়া গেল। তিনি তদবধি প্রত্যেক

রবিবারে দক্ষিণেশ্বরে না যাইলে স্থির থাকিতে পারিতেন না। কিন্তু পূর্ব্ব সংস্কার সকলেরই সমান। সুরেন্দ্র বাবু, পরমহংসদেবের উপদেশে বিমোহিত এবং পরিবর্ত্তিত হইয়াও, পূর্ব্ব সংস্কারবশতঃ মধ্যে মধ্যে আপন কু- অভ্যাসের অনুরোধে তথা হইতে পাস কাটাইতে চেষ্টা করিতেন, কখন তাহাতে কৃতকার্য্যও হইতেন। কোন রবিবারে তিনি আফিসের কর্ম্মের ভান দেখাইয়া দক্ষিণেশ্বরে গমন করিলেন না। পরমহংসদেব তাহা শুনিলেন এবং ভাবাবেশে কহিতে লাগিলেন, "দিনকতক আমোদ আহ্লাদ করিবার সাধ আছে, করুক, পরে ও সব কিছুই থাকবে না। তখন এ কথার মর্ম্ম কেহই অনুধাবন করিতে পারিল না। পরদিন সুরেন্দ্র বাবু কোন ভক্তের নিকট আগমন পূর্ব্বক পরমহংসদেবের নিকট কি কি কথা হইয়াছিল, জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি যতদূর যাহা স্মরণ রাখিয়াছিলেন, তৎসমুদয় কহিলেন। সুরেন্দ্র বাবু তখন আর কোন কথা ভাঙ্গিলেন না। পরের রবিবারে তিনি দক্ষিণেশ্বরে গমন করিলেন বটে, কিন্তু পরমহংসদেবের নিকটে না বসিয়া সকলের পশ্চাতে উপবেশন করিলেন। পরমহংসদেব সুরেন্দ্র বাবুর কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিত ভাব দেখিয়া বলিলেন, "চোরটীর মত অমন করিয়া বসিলে যে? নিকটে আইস।" সুরেন্দ্র বাবু কি করেন, সম্মুখে যাইয়া বসিলেন। পরমহংসদেব সাধারণ উপদেশচ্ছলে কহিতে লাগিলেন, "দেখ, লোকে যখন কোথাও যায়, মাকে সঙ্গে লইয়া যায় না কেন? তাহা হইলে অনেক বিষয়ে, যাহা করিবার কোন সঙ্কল্প ছিল না, তাহা হইতে রক্ষা পায়। পুরুষার্থ সর্ব্বদা প্রয়োজন।" সুরেন্দ্র বাবু, এই কথাগুলি তাঁহাকে কথিত হইতেছে বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। তিনি পুরুষার্থের কথা শ্রবণ করিয়া মনে মনে কহিতেছিলেন, ঐ পুরুষার্থের জ্বালায় অস্থির হইয়াছি। পরমহংসদেব অমনি তাহা জানিতে পারিয়া রোষান্বিত ভাবে সুরেশচন্দ্রের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, "কুকুর শৃগালের পুরুষার্থকে পুরুষার্থ বলে না। পুরুষার্থ ছিল অর্জ্জুনের যখনই যাহা করিবেন বলিয়া মনে করিতেন, তখনই তাহা সম্পন্ন করিতে পারিতেন।" সুরেন্দ্র বাবু এই কথা শ্রবণ করিয়া অবাক্ হইয়া পড়িলেন এবং মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "প্রভু! আর বাড়াবাড়ি করিবেন না। আপনার নিকটে আর গোপন করিব কি? মনের কথা টানিয়া বাহির করিলেন, কোথায় কি লুকাইয়া করিলাম, তাহা যদি দেখিতে পাইবেন, তবে আর যাইব কোথায়? ঠাকুর! আপনি জানিতে পারিয়াছেন, আর কেন? আর কিছু ভাঙ্গিবেন

না, এখনই এই ভক্তমণ্ডলী সকলে জানিতে পারিবে।" পরমহংসদেব নিরস্ত হইলেন। সুরেন্দ্র বাবু তদবধি তাঁহার পূর্ব্বের যে সকল কু-অভ্যাস ছিল, তাহা ক্রমে পরিত্যাগ করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন।

পরমহংসদেবের শক্তির প্রভাবে সুরেন্দ্র বাবু কিছু দিনের মধ্যে একজন ভক্তশ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বাটীতে পরমহংসদেব সর্ব্বদাই আসিতেন এবং ভক্তগণ লইয়া মহা আনন্দ করিয়া যাইতেন। সুরেন্দ্রবাবুর পূর্ব্ব প্রকৃতি প্রায় পরিবর্ত্তন হইয়া আসিল। তিনি অতিশয় ভক্তিসহকারে প্রত্যহ তাঁহার ইষ্টদেবী কালীর পূজা করিতে লাগিলেন এবং দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের নিকটে যে সকল ভক্ত থাকিতেন,তাঁহাদের জন্য যে সকল ব্যয় হইত, তাহা এবং পরমহংসদেব সম্বন্ধীয় নানাকার্য্যে অর্থব্যয় সহ্য করিতেন। সুরেন্দ্র বাবু মুক্তহস্তপুরুষ হইয়া উঠিলেন।

সুরেন্দ্র বাবু সর্ব্বপ্রকারে পরিবর্ত্তিত হইলেন বটে,কিন্তু তাঁহার পানদোষটী কোনমতে যাইল না। এই পানদোষের নিমিত্ত ভক্তগণ সর্ব্বদাই দুঃখিত ছিলেন। একদা মহাষ্টমীর দিন নৌকাযোগে দক্ষিনেশ্বরে যাইবার সময় কোন ভক্ত সুরা পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করায়, সুরেন্দ্র বাবু কহিয়াছিলেন যে, তিনি ইচ্ছা করিয়া কিছু করিতে পারিবেন না—তাহা তাঁহার সাধ্যাতীত। পরমহংসদেব যে প্রকার আদেশ করিবেন, সেইরূপ করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। তিনি তাঁহার সঙ্গীকে আরও কহিয়াছিলেন যে, তুমি একথা তাঁহার নিকট উত্থাপন করিও না। তিনি আপনি যাহা বলিবেন, তাহাই গ্রাহ্য করিব। সঙ্গের ভক্তটী চিন্তিত হইলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন, যদ্যপি পরমহংসদেব কোন কথা না বলেন, তাহা হইলে সকল কার্য্যই ভ্রষ্ট হইয়া যাইবে। এই ভাবিয়া পরমহংসদেবকে স্মরণ করিতে করিতে দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া পৌঁছিলেন। তাঁহারা উভয়ে মন্দির-উদ্যানে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, পরমহংসদেব ভাবাবেশে বকুলতলার ঘাটের নিকটে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, সুতরাং তখন তাঁহার সহিত কোন কথাই হইল না। কিয়ৎকাল পরে তিনি আপন গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সুরেন্দ্র বাবু ও তাঁহার সঙ্গী পশ্চাৎবর্ত্তী হইয়া গৃহমধ্যে আসিয়া উপবেশন করিলেন। পরমহংসদেব তখনও নয়নোন্মীলিত করেন নাই, কিন্তু সুরেন্দ্রবাবুর প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ও সুরেন্দ্র! খাব বলে খাবে কেন? কুণ্ডলিনীকে দিবার নিমিত্ত অতি অল্পপরিমাণে কারণ-স্বরূপ পান

করিবে। সাবধান! পা না টলে এবং মন না টলে। প্রথমে "কারণ" অবলম্বন পূর্ব্বক আনন্দ লাভ করিতে হয়, যাহাকে কারণানন্দ কহে; তদনন্তর আপনি আনন্দ আসিয়া থাকে, তাহাকে ভজনানন্দ কহে। সুরেন্দ্রবাবু ও তাহার সঙ্গী অবাক্ হইয়া রহিলেন। আক্ষেপের বিষয়, সুরেন্দ্রবাবু এই দৈববাণীবৎ উপদেশ: যাহা কাহার ভাগ্যে কেহ ঘটিতে দেখে নাই, শুভাদৃষ্টগুণে প্রাপ্ত হইয়াও তদনুযায়ী কার্য্য করিতে পারেন নাই। কেন যে তিনি এই দৈববাণী উপেক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে আমরা অসমর্থ। বোধ হয়, তাঁহার পূর্ব্বার্জ্জিত পাশ্চাত্য সংস্কার এই বিভ্রাট ঘটাইয়াছিল। কিন্তু পরমহংসদেবের শক্তির কি মহিমা, সুরা সেবন করিয়াও, সুরেন্দ্রবাবু একদিন অন্য কথা কহিতেন না! সে সময়ে তাঁহার যেন ভক্তিস্রোত খুলিয়া যাইত! তাঁহার বালকবৎ মা মা শব্দে পাষণ্ডের হৃদয়েও প্রেমের সঞ্চার হইত! সে সময়ে তাঁহাকে দেখিলে অকপট সরল এবং ভক্তির মূর্ত্তি বলিয়া জ্ঞান হইত। এই নিমিত্ত সুরা সেবন করিয়াও সুরেন্দ্র বাবুর আধ্যাত্মিক উন্নতির হানি হয় নাই। তিনি পরমহংসদেবের সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয় করা ভাব বুঝিয়া একখানি ছবি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। সেই ছবিতে শিবের মন্দির ও গির্জ্জার সম্মুখে গৌরাঙ্গদেব ও ঈশা উভয়ে উভয়ের হস্তধারণ পূর্ব্বক নৃত্য করিতেছেন, সঙ্গে সকল সম্প্রদায়ের একটী করিয়া ভক্ত আছেন, খোল করতাল ও শিঙ্গা বাজিতেছে; পরমহংসদেব কেশব বাবুকে তাহা দেখাইয়া দিতেছেন। এই চিত্রখানি প্রস্তুত করিবার দুইটী ভাব ছিল। প্রথম, এই ভাবটী পরমহংসদেবের নিজের সাধনের ফলস্বরূপ এবং দ্বিতীয়, উহা কেশব বাবু পরমহংসদেবের নিকট হইতে পাইয়াছেন। কেশব বাবুর অন্তরে যাহাই থাকুক, নববিধান ভাবটী যে পরমহংসদেবের ভাবের বিকৃতি, তাহা সুরেন্দ্রবাবুও বুঝিয়াছিলেন; এবং এই নিমিত্ত ছবিখানি কেশববাবুকে দেখাইতে পাঠাইয়াছিলেন। কেশব বাবু ছবিখানি দেখিয়া সুরেন্দ্র বাবুকে এই বলিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন, "যাহা হইতে এই ছবির ভাব বাহির হইয়াছে, তিনি ধন্য!" সুরেন্দ্র বাবু এই মর্ম্মে আর একটী যন্ত্র নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের চিহ্নবিশেষ যে সকল যন্ত্র আছে, যথা, বৈষ্ণবদের খুন্তি, খ্রীষ্টানদের ক্রস, মুসলমানদের পঞ্জা ইত্যাদি লইয়া এক স্থানে মিলাইয়াছিলেন। কেশব বাবু ঐ যন্ত্রটী লইয়া একবার নগর কীর্ত্তনে বাহির হইয়াছিলেন। সুরেন্দ্র বাবু পরমহংসদেবকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতেন।

সুরেন্দ্র বাবু একজন নিতান্ত সহজব্যক্তি ছিলেন না। তিনি ইদানীং কহিতেন যে, যে দিন তাঁহাকে প্রথমে পরমহংসদেবের নিকটে গমন করিবার নিমিত্ত তাঁহার বন্ধু প্রস্তাব করেন, সেই দিন তিনি পরমহংস নাম শুনিয়া কহিয়াছিলেন, "দেখ, তোমরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা কর ভালই, আমায় কেন আর সে স্থানে লইয়া যাইবে? আমি 'হংস মধ্যে বকো যথা' ঢের দেখিয়াছি। তিনি যগ্যপি বাজে কথা কহেন, তাহা হইলে আমি তাঁহার কান মলিয়া দিব।" সুরেন্দ্র বাবু শেষে এই কথা কহিয়া রোদন পূর্ব্বক বলিতেন, "অবশেষে তাঁহার নিকটে আমি নাক কান মলা খাইয়া আসিলাম!"

বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের ইতিবৃত্ত অতি সুন্দর। তিনি সর্ব্বপ্রথমে ধার্ম্মিক ছিলেন। হিন্দুধর্ম্মে বিশেষ আস্থা ছিল কি না,জানি না, থাকিবার কথা নহে। তিনি কিন্তু সর্ব্বদা আদি ব্রাহ্মসমাজে উপাসনাদিতে যোগ দিতেন। একদা উৎসবের দিন, প্রথমে বেচারাম বাবু এবং পরে দেবেন্দ্র ঠাকুর ও পূর্ব্বদেশীয় একজন প্রচারক মন্দিরে উপাসনা কার্য্য করিয়াছিলেন। পর-দিন কেশব বাবুর বাটীতে বক্তৃতাদি সম্বন্ধে আন্দোলন হইতেছিল। কেশব বাবু কহিলেন, "বেচারাম বাবু কেমন বলিলেন?" একজন উত্তর করিলেন, "আহা! তাঁহার যেমন বলিবার কায়দা, তেমনি শব্দবিন্যাস করিবার ক্ষমতা!" এই কথা শুনিয়া কেশব বাবু পুনরায় বলিলেন, "বাঙ্গাল্‌টা কেমন বলিল।" গিরিশ বাবু তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া মর্ম্মাঘাত পাইলেন এবং ভাবিলেন, "এ কি! ধর্ম্মের ভিতর এত কপটতা! বাঙ্গাল্‌টা—ইহাদের ভ্রাতৃভাব কেবল মুখের কথামাত্র!"এই বলিয়া একেবারে কালাপাহাড়বিশেষ হইয়া দাঁড়াইলেন। শুনিয়াছি, সাধু দেখিলেই তাহার চিমটে কাড়িয়া লইয়া প্রহার করিতেন। বাটীতে দুর্গা ঠাকুর আনা হইয়া-ছিল, তাহা টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত তিনি ঈশ্বর মানিতেন না। তাঁহার মন হইতে ঈশ্বর শব্দটী দূর করিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন। এইপ্রকার প্রবাদ আছে যে, কোন সময়ে বরাকরের সন্নিহিত পঞ্চকূট পাহাড়ের দুর্গম স্থানে পতিত হইয়া ভয়ে ঈশ্বর শব্দটী তাঁহার মুখ হইতে বহির্গত হইয়াছিল। তেজীয়ান্ গিরিশ বাবু আপনাকে ধিক্কার দিয়া কহিয়া-ছিলেন, "কি? ভয়ে ঈশ্বর বলিলাম! কখনও বলিব না। যদি কখনও প্রেমে বলিতে পারি, তবে তাঁর নাম গ্রহণ করিব!"

গিরিশ বাবুর চৈতন্য-লীলা যখন অভিনয় হয়, পরমহংসদেব তাহা

দেখিতে গিয়াছিলেন। সে দিন গিরিশ বাবুর অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইয়াছিল। পরমহংসদেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হওয়ায় মধ্যে মধ্যে উভয়েরই যাতায়াত হইত। কিন্তু গিরিশ বাবু যাহাই থাকুন, তিনি যে একজন অতি বিচক্ষণ এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। তিনি জানিতেন যে, যিনি গুরু, তিনি ব্রহ্মা, তিনি বিষ্ণু এবং তিনিই মহেশ্বর। পরমহংসদেবকে তিনি অসাধারণ ব্যক্তি বলিয়া বুঝিতে পারিয়াও, তাঁহার চিত্ত বোধ হয় পরীক্ষা করিতে চাহিয়াছিল। পরমহংসদেব একদিন থিয়াটারে অভিনয় দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন, অভিনয়ান্তে গিরিশ বাবু, পরমহংসদেবের নিকট আগমন পূর্ব্বক, কথায় কথায় তাঁহাকে এ প্রকার কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন যে, তাহা লেখা পড়ায় প্রকাশ করা যায় না। বরং জগাই মাধাই কর্ত্তৃক নিত্যা-নন্দের কলসীর কাণার আঘাত সহস্রগুণে ভাল ছিল, কিন্তু গিরিশ বাবুর সেই দিনের গালাগালির তুলনা নাই। কারণ একবার প্রহার করিলে তাহার যন্ত্রণা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। কিন্তু কবির মুখের খেউড় যে কি প্রকার মর্ম্মে মর্ম্মে যাইয়া বিদ্ধ হয়, তাহা বর্ণনা করা অপেক্ষা অনুমান করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। এই গালাগালিতে উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু পরমহংসদেবের অপূর্ব্ব মানসিক ভাব দেখিয়া সকলেই মনের আবেগ সম্বরণ করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বে যেমন হাসিতেছিলেন, এখনও তেমনি হাসিতে লাগিলেন। হাসিতে হাসিতে যথা সময়ে দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া যাইলেন।

এই সমাচার যখন ভক্তদিগের নিকটে প্রচারিত হইল, সকলেই দুঃখিত হইলেন এবং তাহা না হইবেন কেন? দোষী ব্যক্তিকে অতিরিক্ত কটু বলিলে লোকের প্রাণে আঘাত লাগিয়া থাকে। সর্ব্বশুভানুধ্যায়ী, নিরপরাধী পরমহংসদেবের সহিত সে প্রকার ব্যবহার যে নিতান্ত ধর্ম্ম, নীতি এবং লোক বহির্ভূত কার্য্য বলিয়া ধারণা না হইবে, তাহার হেতু নাই।

অতঃপর পরমহংসদেব একদিন অন্যান্য ভক্তদিগের সহিত বসিয়া আছেন, এমন সময়ে আমরা যাইয়া উপস্থিত হইলাম। আমরা যাইবামাত্র তিনি কহিলেন, "গিরিশ আমায় গাল দিয়াছে।" আমরা কহিলাম, "কি করিবেন?" তিনি পুনরায় কহিলেন, "আমায় যদি মারে?" আমরা কহিলাম, "মার খাইবেন।" তিনি কহিলেন, "মার খাইতে হইবে?" আমরা বলিলাম, "গিরিশের অপরাধ কি? কালীয় সর্পের বিষে রাখাল বালকগণের মৃত্যু

হইলে শ্রীকৃষ্ণ কালীয়ের যথাবিহিত শাস্তি প্রদান পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, 'তুমি কি জন্য বিষ উদ্গীরণ কর?' কালীয় সানুনয়ে কহিয়াছিল, 'প্রভু! যাহাকে অমৃত দিয়াছেন, সে তাহাই দিতে পারে, কিন্তু আমায় ঠাকুর বিষ দিয়াছেন, আমি অমৃত কোথায় পাইব?' গিরিশের ভিতরে যাহা ছিল, যে সকল পদার্থ দ্বারা তাহার হৃদয়ভাণ্ডার পরিপূর্ণ ছিল, সেই কালকূটসম বাক্যগুলি ফেলিয়া দিবার আর স্থান কোথায়? উহা যথায় নিক্ষিপ্ত হইত, তথায় বিপরীত কার্য্য হইত, সন্দেহ নাই। আমাদের বলিলে হয়ত, এতক্ষণ তাঁহার নামে রাজদ্বারে অভিযোগ করা হইত,এই সকল বুঝিয়া,প্রভু! আপনি নিজে অঞ্জলি পাতিয়া লইয়া আসিয়াছেন।" সাধে কি বলি পতিতপাবন দয়াময়! অমনি তাঁহার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইল,তাঁহার অক্ষিদ্বয়ে জল আসিল এবং তখনই গিরিশের বাটীতে গমন করিবার নিমিত্ত উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কোন কোন ভক্ত সেই দুই প্রহরের সূর্য্যোত্তাপে তাঁহার ক্লেশ হইবে বলিয়া আপত্তি করিলেন, কিন্তু তিনি তাহা না শুনিয়া সেই দণ্ডে শকটারোহণে গিরিশের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এদিকে গিরিশ তাঁহার নিজ কীর্ত্তি স্মরণ করিয়া আপনাকে আপনি সহস্র লাঞ্ছনা করিতেছিলেন। তিনি কেমন করিয়া ভদ্রসমাজে মুখ দেখাইবেন, ভাবিতেছিলেন। সে ভাবনা দূরী-কৃত হইল। পরমহংসদেব এমন ভাবে উপদেশ দিতে লাগিলেন এবং ভক্ত সহ হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিলেন যে, গিরিশ বাবুর মনে যে সকল দুঃখ এবং লজ্জা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা পরিষ্কার হইয়া গেল। সেই গিরিশ আজ পরমহংস-দেবের পরাক্রমে পরাজিত হইলেন।

গিরিশ বাবুর অন্য কোন প্রকার চরিত্র দোষ ছিল কি না, তাহা প্রকাশ নাই, কিন্তু মদে সিদ্ধ ছিলেন, একথা বলা বাহুল্য। কেবল মদ কেন, আব-গারী মহল তাঁহার ইজারা ছিল বলিলে কি বেশী বলা হইবে? মদ ছাড়াই-বার জন্য কোন ভক্ত পরমহংসদেবের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন, তিনি এই কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমার এত মাথা ব্যাথা কিসের? সে মদ ছাড়ুক আর নাই ছাড়ুক, যে তাহার কর্ত্তা, সে বুঝিবে। বিশেষতঃ, ওরা শূর ভক্ত, মদে দোষ হইবে না।" ভক্ত আর কি বলিবেন চুপ করিয়া রহিলেন।

পরমহংসদেব কর্ত্তৃক গিরিশ বাবুর ক্রমে সুখ্যাতি বিস্তার হইতে লাগিল। তিনি এই কথা শুনিয়া বড়ই বিরক্ত হইতেন এবং কহিতেন, "ঠাকুর! কথায়

কিছু হবে না। আমি ঢের কথা জানি, কার্য্য চাই। যে আমি, তাহাই আছি।" এই বলিয়া একদিন সন্ধ্যার পর মদের বোতল খুলিয়া বসিলেন। দুই একজন বন্ধুও জুটিল। তাহারা দুই চারি গ্ল্যাস মদ খাইয়া কাৎ হইয়া পড়িল; কিন্তু গিরিশের সে বিষয়ে মনোযোগের ত্রুটি হইল না। বোতলটী নিঃশেষিত হইলে একটী উদ্গার উঠিয়া সমুদায় নেশা কমিয়া গেল। দ্বিতীয় বোতল খোলা হইল। তাহাও যথাসময়ে ফুরাইয়া নেশা হইল না। পরে তৃতীয় বোতল ঐরূপে যখন নেশা উৎপাদন করিতে অসমর্থ হইল এবং ওদিকে জলে উদরস্থলী ফুলিয়া উঠিল দেখিয়া বিরক্ত হইয়া সেদিন হইতে গিরিশ বাবু আর মদ খাইতেন না। গিরিশ বাবুর একাগ্রতা শক্তি অতিশয় প্রবল। তিনি যাহা করিবেন বলিয়া মনে করেন, তাহা হইতে কেহ তাঁহাকে মতান্তর করিতে পারিত না। কিন্তু কু-সংস্কার বা কু-অভ্যাস কেহ কাহার কথায় পরিত্যাগ করিতে পারে না, পরমহংসদেব তাহা বিলক্ষণ জানিতেন। তন্নিমিত্ত তিনি গিরিশ বাবুকে সুরা সেবন করিতে নিষেধ করেন নাই।

কয়েকদিন পরে জনৈক অভিনেত্রীর পীড়া দেখিতে গিয়া গিরিশ বাবু তথায় হুইসকী সুরা পান করিতে আরম্ভ করেন। সেদিন তাঁহার অপরিমিত পরিমাণে নেশা হওয়ায়, তথায় তাঁহাকে অজ্ঞানাবস্থায় রজনী যাপন করিতে হইয়াছিল। বেশ্যাবাটীতে রজনী যাপন করা গিরিশ বাবুর জীবনে এই প্রথম ঘটনা। প্রাতঃকালে কিঞ্চিৎ চৈতন্য লাভ করিয়া তাঁহার অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। বারনারীর গৃহে রজনী যাপন হইয়াছে জানিয়া, বড়ই মর্ম্মাহত হইয়া, বাটীতে না গিয়া একখানি গাড়ী ভাড়া করিলেন এবং সঙ্গে এক শিশি মদ লইয়া দক্ষিণেশ্বরে শুভযাত্রা করিলেন। দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছিয়া তিনি উর্দ্ধ-শ্বাসে পরমহংসদেবের নিকট চলিয়া গিয়া তাঁহার চরণ দুইটী বক্ষে স্থাপন পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। অন্তর্যামী পরমহংসদেব তাঁহার অন্তরের ভাব বুঝিলেন, কিন্তু তখন কিছু প্রকাশ করিলেন না।

গিরিশ বাবু গৃহে প্রবেশ করিবার পর পরমহংসদেব, অন্য ভক্তের দ্বারা গাড়ী হইতে মদের শিশি ও গিরিশের চাদর এবং জুতা আনাইয়া রাখিয়াছিলেন। গিরিশের খোঙ্গারীর সময় উপস্থিত হইলে মনে হইল যে, গাড়ীতে মদ ছিল। গাড়ী তখন চলিয়া গিয়াছে। গিরিশ কি হইবে ভাবিতেছেন, পরমহংসদেব তখন সেই মদ বাহির করিয়া দিতে কহিলেন। গিরিশ আনন্দে তাহা ঢুকু ঢুক করিয়া পান করিতে লাগিলেন। সেদিন জন্মাষ্টমীর বন্ধের

জন্য তথায় অনেক লোকের সমাগম হইয়াছিল, গিরিশের মদ খাওয়া সকলে দেখিয়া আসিল।

এই ঘটনায় গিরিশ বাবু লজ্জিত হইয়া মদ খাওয়া এক প্রকার ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। সে দিন পরমহংসদেব গিরিশের নিকটে যে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, সেই সত্য-পাশ হইতে উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত, গিরিশের পরিত্রাণের ভার আপনি লইয়া তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, "যে কয়েক দিন সংসারে আছ, সে কয়েক দিন শীঘ্র শীঘ্র খেয়ে নে পরে নে", ইত্যাদি।

গিরিশ বাবুর ভক্তির তুলনা নাই। পরমহংসদেব তাঁহাকে বীরভক্ত, শূরভক্ত বলিয়া ডাকিতেন। গিরিশকে পাইলে তিনি যে কি আনন্দিত হইতেন, তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিয়াছেন। তিনি বলিতেন যে, গিরিশের ন্যায় বুদ্ধিমান ব্যক্তি আর দ্বিতীয় দেখেন নাই। পূর্ব্বোল্লিখিত মথুর বাবুর বারো আনা বুদ্ধি ছিল এবং গিরিশের ষোল আনার উপরে চারি ছয় আনা বলিতেন।

একদিন দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের বাটীতে পরমহংসদেব কতকগুলি ভক্ত সহিত একত্রিত হইয়াছিলেন। তথায় গিরিশ বাবুও উপস্থিত ছিলেন। পরমহংসদেবের ভাবাবেশ হইল। গিরিশ বাবু সেই সময় মনে মনে কি প্রার্থনা করিতেছিলেন, তাহা প্রকাশ নাই; কিন্তু পরমহংসদেব কিঞ্চিৎ জোর করিয়া কহিলেন, "ও গিরিশ! ভাব্‌চ কি? এর পর তোমাকে দেখিয়া সকলে অবাক্ হইবে।" যদিও এইরূপে বার বার গিরিশ বাবুর আকাঙ্ক্ষা মিটিতে লাগিল, তাঁহার মনে বোধ হয় তখনও কিছু কিছু সন্দেহ ছিল। কিন্তু তাহা অচিরাৎ দূর হইয়াছিল। একদিন অধরলাল সেনের বাটীতে পরমহংসদেব কয়েকটী ভক্ত সমভিব্যাহারে আগমন করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে একজনের নিকট সুরা ছিল। পরমহংসদেব তাহা জানিতেন। অধর বাবুর বাটীতে প্রবেশ করিবার সময় সেই ভক্তটী সুরার পাত্রটী গাড়ীর ভিতরে লুকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিল। পরমহংসদেব তাহাকে নিষেধ করেন এবং বলেন যে, গাড়োয়ান খাইয়া ফেলিবে; সুতরাং বোতলটী সঙ্গে কাপড়ের ভিতর লুকান রহিল। সেই দিন তথায় চণ্ডীর গীত হইয়াছিল, তজ্জন্য অনেকের সমাগম হয়। ইতিমধ্যে সেই বোতলটী সভাস্থলে বাহির হইয়া পড়িল ও সুরার গন্ধে দিক্ পরিব্যাপ্ত হইল। অনেকে কহিল যে, পরমহংসদেবের যে নেশার মত হয়, তাহা এই জন্য; লুকিয়ে লুকিয়ে মদ্যপান হইয়া থাকে। কেহ বলিল, তিনি

তান্ত্রিক, তাহাতে দোষ নাই। পরে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। যখন অনেকের জানাজানি হইল,তাহারা সকলে পরীক্ষা করিতে আসিয়া দেখিল যে, মদের লেশমাত্র নাই, উহাতে ডিঃ গুপ্তের ঔষধের গন্ধ বাহির হইতেছে। এই কথা গিরিশ বাবু শুনিয়া বলিয়াছিলেন যে, এই উনবিংশ শতাব্দীতে এক অদ্ভুত বুজরুকী হইতেছে। মদের দোষ কি? বেশ ত অমন গুরুর আমরা ঠিক চেলা হইতে পারি। বোতল উৎসর্গ করিয়া গুরুকে খাওয়াইব এবং সকলে প্রসাদ পাইব। এইরূপ চিন্তা করিয়া মদের বোতল খুলিয়া কার্য্য আরম্ভ হইল। দুই চারি গ্লাস সেবনের পর, সেই সুরার বোতলটী ডিঃ গুপ্তের ঔষধে পরিণত হইয়াছিল। তদনন্তর গিরিশ বাবুর অকপট বিশ্বাস বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অতঃপর তাঁহাকে একদিন পরমহংসদেব কহিলেন যে, "আর কিছু করিতে পার, আর নাই পার, প্রত্যহ একবার ঈশ্বরকে ডাকিও। তুমি বলিবে, তাহা যদি না পারি? একবার না হয় সন্ধ্যার পর একটা প্রণাম করিও। তুমি বলিবে, তাহাও যদি সুবিধা না হয়। ভাল, আমায় বকল্‌মা দিয়া যাও।" গিরিশ বাবুর মনের আকাঙ্ক্ষা সেইক্ষণ হইতে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আজকাল গিরিশ বাবুকে দেখিলে বাস্তবিক অবাক্ হইতে হয়। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে গিরিশকে যে ভাবে দেখা গিয়াছে, আজ আর তাঁহাকে তেমন দেখা যাইতেছে না।

গিরিশ বাবুর আর কোন সাধন ভজন নাই। তাঁহার মনে বিলক্ষণ শান্তি বিরাজ করিতেছে। তিনি এখন যে প্রকার তত্ত্বজ্ঞানী হইয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত বুদ্ধদেব চরিত, বিল্বমঙ্গল, নসিরাম এবং রূপসনাতনাদি গ্রন্থে দেদীপ্যমান্ রহিয়াছে। আমরা জানি, এই সকল পুস্তকের দ্বারা অনেকের ধর্ম্মের কপাট উদ্‌ঘাটন হইয়াছে।

অন্যান্য যে সকল ব্যক্তি ভক্ত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের জীবনে বিশেষ বিশেষ ঘটনা আছে, তাহা এস্থানে সন্নিবেশিত করা দুঃসাধ্য। তাঁহারা প্রত্যেকে ত্রিতাপে জ্বলিয়া পুড়িয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন; পরমহংসদেবের চরণছায়ায় উপবেশন করিয়া সকলেই মুক্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

পরমহংসদেবের অনেকগুলি স্ত্রীলোক ভক্ত ছিলেন। তাঁহাদের কি ভাব ছিল এবং পরমহংসদেব কর্ত্তৃক কি ভাবেই বা তাঁহারা পরিবর্ত্তিত হইয়াছিলেন, তাহা কাহারও জ্ঞাত হইবার উপায় নাই। তাঁহারা কেহ সন্ন্যাসিনী এবং কেহ পুরবাসিনী। যে সকল স্ত্রীলোক যাইতেন, তাঁহাদের মধ্যে বাবু মনোমোহন মিত্রের জননী সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর বলিয়া পরমহংসদেব কহিয়াছিলেন। তিনি যতদিন সধবা ছিলেন, তাঁহার ন্যায় পতিপরায়ণা স্ত্রী এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে দেখিতে পাওয়া অতি দুর্ল্লভ। বৈধব্য দশায় পতিত হইয়া যে কয়েকদিন জীবিত ছিলেন, তিনি প্রায় পাগলিনীর ন্যায় দিন যাপন করিতেন। বাম হস্তে লৌহ এবং ললাটে সিন্দূর ত্যাগ ভিন্ন অন্য বৈধব্য লক্ষণ তাঁহার বিশেষ কিছু ছিল না, অর্থাৎ তিনি লাল পেড়ে ধুতি পরিধান এবং স্বর্ণ বলয় হস্তে ধারণ করিতেন। আহারে সম্পূর্ণ সন্ন্যাসিনীর ভাব ছিল। তিনি হিন্দু বিধবা হইয়া বালা ও লালপেড়ে ধুতি ব্যবহার করিতেন বলিয়া অনেকে অনেক কথাই কহিত, কিন্তু তিনি সে সকল কথায় কর্ণপাত করিতেন না। একদিন পরমহংসদেবের সমক্ষে অন্যান্য স্ত্রীলোক বসিয়া আছেন, প্রসঙ্গক্রমে স্ত্রীলোকদিগের ধর্ম্ম কর্ম্মের কথা উঠিল। পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন, স্ত্রীজাতিদিগের পতিই একমাত্র ধর্ম্ম, ইহা শাস্ত্রের অভিপ্রায়। পতিতে শান্ত দাস্যাদি সকল রস আছে। পতি জীবিত অথবা মরিয়া যাইলেও, সে ভাব থাকা উচিত। অনেকে পতির জীবদ্দশার পর শ্রীকৃষ্ণকে পতি জ্ঞান করিয়া থাকে। তিনি তদনন্তর একটী গল্প বলিয়াছিলেন। "কোন রাজমহিষী স্বর্ণালঙ্কার ধারণ করিতেন না, তিনি সধবার ভাব রক্ষার জন্য রুলি পরিতেন। কত লোকে কত কি বলিত, কিন্তু তিনি আপনার মতের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতেন না। কালসহকারে রাজার মৃত্যু হইল। রাণী তাড়াতাড়ি রুলিগুলি ভাঙ্গিয়া সোনার বালা পরিলেন। লোকে অবাক্ হইয়া রহিল। একদিন একটী প্রতিবাসিনী তাঁহাকে এ প্রকার অলঙ্কার পরিবার হেতু জিজ্ঞাসা করায় তিনি কহিলেন, এত দিন আমার পতি নশ্বর ছিলেন, তাই নশ্বর পদার্থের লক্ষণ রাখিয়াছিলাম। এখন আমার পতি অক্ষয়, অমর এবং অজর, সেই জন্য অক্ষয় সোণার

বালা পরিয়াছি।" পরমহংসদেব কহিতে লাগিলেন, "এঁর বালা পরা সেইরূপ। ভিতরকার ভাব অতি উচ্চ এবং সুন্দর। লোকের কথায় কি কেহ ভাব পরিবর্ত্তন করিতে পারে? যে ভাব পরিবর্ত্তন করিতে পারে, তাহার তখনও প্রাণে সে ভাব হয় নাই বলিতে হইবে।" মনোমোহন বাবুর মাতার উচ্চভাব সম্বন্ধে একটী দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইতেছে। তাঁহার তৃতীয় জামাতা পরমহংসদেবের উপাসক হওয়ায় পাড়ার স্ত্রীলোকেরা আক্ষেপ করিত। তিনি এই কথায় বলিতেন, "আমার কি এমন সৌভাগ্য হইবে যে, আমার জামাই সন্ন্যাসী হইয়া সাধু সেবায় জীবন উৎসর্গ করিবে?"

গৌরদাসী (গৌরী মা বলিয়া পরিচিত) নাম্নি আর একটী ব্রাহ্মণের কন্যা পরমহংসদেবের বিশেষ অনুগৃহীতা পাত্রী ছিলেন। বালিকাবস্থা উত্তীর্ণ হইবার পর হইতেই তাঁহার হৃদয়ে পরমার্থতত্ত্ব বিষয়ের সূক্ষ্ম ভাব সঞ্চারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। তিনি পতি-গৃহে পূজা ও সঙ্কীর্ত্তনাদি দ্বারা দিনযাপন করিতেন। বিষয়াসক্ত লঘুচেতা ব্যক্তিরা কে আপন স্ত্রীকে ইচ্ছা করিয়া সন্ন্যাসিনী সাজাইতে চাহেন? তাঁহার প্রতি পতির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পড়িল। তিনি একদিন নিশিথকালে একবস্ত্রে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া দেশ দেশান্তর পরিভ্রমণ পূর্ব্বক শ্রীপাট নবদ্বীপে জনৈক বৈষ্ণবের নিকট দীক্ষিত হইয়া গৌরদাসী নাম প্রাপ্ত হইলেন। বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, তিনি বলরাম বাবুর বাটীতে এবং কখন তাঁহাদের বৃন্দাবনের কুঞ্জে বাস করিতেন। এই সময়ে তিনি পরমহংসদেবের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। তিনি পরমহংসদেবকে গৌরাঙ্গ বলিয়া চিনিলেন। একদিন তাঁহার মনে মনে সাধ হইয়াছিল যে, প্রভু যেরূপে নবদ্বীপে ভক্ত লইয়া ভাবে মাতামাতি করিয়াছিলেন, আমায় সেইরূপ একবার দেখাইলে জীবন ধারণ সার্থক জ্ঞান করি, কিন্তু প্রকাশ করিয়া কিছুই বলেন নাই। অন্তর্যামী ভক্তবৎসল পরমহংসদেব ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিতে কখন বিলম্ব করিতেন না।

একদা কতককগুলি ভক্ত একত্রিত হইলেন। মধ্যাহ্নকালে গৌরীমাতা স্বয়ং অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া পরমহংসদেবকে পরিবেশন করিলে পর, ভক্তপ্রবর কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত পরমহংসদেব তাঁহার পরিচয় করিয়া দিলেন। কেদার বাবু তাঁহাকে বিনয় সহকারে মাতৃ সম্বোধন পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন, তিনিও কেদার বাবুকে প্রণাম করিলেন। উভয়ে উভয়কে প্রণাম করনান্তর একবার পরস্পর চারি চক্ষে দেখাদেখি হইল এবং উভয়ের

নয়নধারায় বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। পরমহংসদেব তখন দুই একগ্রাস ভোজন করিয়াছিলেন। তিনি গৌরীমাতা এবং কেদার বাবুর প্রেমাবেশ দেখিয়া আপনি মাতিয়া আহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অন্যান্য ভক্তগণ সকলেই একেবারে উন্মত্তপ্রায় হইয়া পড়িলেন। ভাবের বন্যা আসিল। কাহার বক্ষঃস্থলে হু হু করিয়া আনন্দবায়ু উত্থিত হইয়া উচ্চ হাস্যের ঘোর ঘটা উপস্থিত করিয়া দিল, কেহ সংজ্ঞাশূন্য হইয়া কাহার গায়ে ঢলিয়া পড়িল, কেহ উন্মাদের ন্যায় নৃত্য করিতে লাগিল, কেহ নয়ন মুদিয়া গদগদস্বরে "জয় রামকৃষ্ণের জয়" বলিয়া মাতালের ন্যায় ঢলিতে লাগিল, কেহ এই দেখিয়া শুনিয়া ভয়ে তথা হইতে পলায়ন পূর্ব্বক থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। গৌরীমাতা প্রেমাবেশে খিচুড়ী প্রসাদ ভক্তদিগের মুখে অর্পণ করিবেন বলিয়া চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তাঁহার হাতের অন্ন হাতেই রহিল, তিনি জড়বৎ হইয়া পড়িলেন। চতুর্দ্দিকে লোক দাঁড়াইয়া গেল। সকলেই অবাক্। কিয়ৎকাল এইরূপে অতিবাহিত হইলে, পরমহংস-দেব সকলের বক্ষে হস্তার্পণ করিয়া সহজ ভাবে আনিয়া দিলেন। গৌরী মা অতিশয় ভক্তিপরায়ণা ছিলেন। পরমহংসদেবের ভক্তদিগের প্রতি তাঁহার বাৎসল্যভাব ছিল। তিনি সর্ব্বদা মালপো ও অন্যান্য পক্কান্ন দ্রব্য প্রস্তত করিয়া দক্ষিণেশ্বরে লইয়া যাইতেন। ভক্তেরা উদর পূর্ণ করিয়া সেই সকল মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিতেন।

যে সময়ে দক্ষিণেশ্বরে স্ত্রীলোকেরা যাতায়াত আরম্ভ করিলেন, তাহার কিছু দিন পূর্ব্বে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী (পরমহংসদেবের স্ত্রী) সেবা করিবার অভিপ্রায়ে আসিয়াছিলেন। পরমহংসদেব কখন কখন তাঁহাকে নিজ গৃহে প্রবেশ করিতে দিতেন এবং কখন নিষেধ করিতেন। সেই সময়ে মাতা ঠাকুরাণী একদিন পরমহংসদেবকে ভাবাবেশে দেখিয়া মন পরীক্ষার জন্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনি বলুন দেখি, আমি কে?" পরমহংসদেব অতিশয় আনন্দিত হইয়া কহিয়াছিলেন, "তুমি আমার আনন্দময়ী মা।" মাতা সেই কথা শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "ও কথা বলিতে নাই।" পরমহংসদেব কহিলেন, "আমি জানি, একরূপে মা আনন্দময়ী এই দেহ প্রসব করিয়াছেন, একরূপে মা আনন্দময়ী কালীরূপে কালীঘরে আছেন, আর একরূপে মা আনন্দময়ী আমার সেবা করিতেছে।" মাতার চক্ষে জলধারা বহিয়া পড়িল। তিনি তদবধি আর সে প্রকার কথা মুখে আনেন নাই। তাঁহার নম্র প্রকৃতি ও উদার

স্বভাবের জন্য সকল স্ত্রীলোকেই বশীভূত ছিলেন। পরমহংসদেবের নিকট সর্ব্বদা স্ত্রীলোকেরা অগ্রসর হইতে পারিতেন না, তাঁহারা মাতার নিকট আরাম পাইতেন।

আমরা একটী ভৈরবীকে দেখিয়াছি, তিনি কিছুদিন দক্ষিণেশ্বর থাকিয়া পরমহংসদেবের সহিত নানা প্রকার রঙ্গরসের কথা বলিতেন। তাঁহার হস্তে ত্রিশূল ও ললাটে সিন্দূরের প্রলেপ এবং তিনি গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকিতেন। পরমহংসদেবের সহিত যে সকল কথা কহিতেন, তাহা আমরা এক বিন্দু বিসর্গ বুঝিতে পারি নাই। সহজ বাঙ্গালা কথায় কথা কহিতেন, কিন্তু তাহার মাথামুণ্ড স্থির করিতে আমাদের মস্তক বিঘূর্ণিত হইয়া গিয়াছে। এই ভৈরবী ভিক্ষা করিয়া খাবার আনিয়া পরমহংসদেবকে খাওয়াইতেন।

আর একটী ভক্ত স্ত্রীলোকের কথা উল্লেখ না করিয়া এ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত করিতে পারিলাম না। পটলডাঙ্গার গোবিন্দ দত্তের কামারহাটীর ঠাকুর-বাড়ীতে একটী প্রাচীনা অদ্যাপি আছেন।* তিনি পরমহংসদেবকে বড়ই ভালবাসিতেন। তাঁহার বাৎসল্যভাবপ্রধান প্রকৃতি ছিল। তিনি তন্নিমিত্ত পরমহংসদেবকে আহার করাইতে ভালবাসিতেন। তত্ত্বকথার বড় একটা এলাকা রাখিতেন না। পরমহংসদেব সম্বন্ধে অতি অদ্ভুত কথা তাঁহার নিকট শুনা গিয়াছে। তিনি বলিতেন যে, "পরমহংসদেব একটী শিশুর ন্যায় আকার ধারণ পূর্ব্বক হামাগুড়ী দিয়া আমার অঞ্চল ধরিয়া খাবার চায়; না দিলে আঁচল ছাড়িয়া দেয় না।" ভগবান্ ভক্তের মনোবাঞ্ছা কিরূপে পূর্ণ করিয়া থাকেন, তাহা কাহার সাধ্য বলিতে পারে? ভক্ত ভগবানের লীলা অতি অপূর্ব্ব এবং লোকের গবেষণার অতীত বিষয়। যেমন, স্ত্রী পুরুষের লীলা ভুক্তভোগী না হইয়া অনুমান দ্বারা কাহারও স্থির নির্ণয় হইতে পারে না ও কখন কস্মিন্ কালে হইবার নহে, সেইপ্রকার ভক্তবৎসল দয়াময় হরি, ভক্তের প্রাণের কতদূর আকাঙ্ক্ষা কিরূপে পরিপূর্ণ করিয়া থাকেন, ভক্তই সে কথা প্রাণে প্রাণে বুঝিতে পারেন। ভক্তির রস ভক্তেই পান করিতে সক্ষম, ভক্তের মহিমা ভক্তেই বুঝিয়া থাকেন, অভক্তের তাহা অধিকার নাই। সেই জন্য, গায়ের জোরে, উষ্ণ মস্তিষ্কের উত্তেজনায়, আপনার বিষয়াত্মক বুদ্ধি ও বিদ্যার প্রভাবে ভক্তকাহিনী পর্য্যালোচনা করিতে যাইলে নিশ্চয় সর্ব্বতোভাবে কু-ফল ফলিয়া থাকে। এই স্ত্রীলোকটী "গোপালের মা" বলিয়া পরিচিতা ছিলেন।

* সন ১৩১৩ সালে ইনি দেহত্যাগ করিয়াছেন।

ইতিপূর্ব্বে আভাসে কথিত হইয়াছে যে, পরমহংসদেবের ভক্তদিগের মধ্যে অনেকেই সস্ত্রীক তাঁহার নিকটে গমন করিতেন। সুতরাং পরমহংসদেব সেই সকল ভক্তদিগের বাটীতে আসিলে, অন্তঃপুরে যাইয়া আহারাদি করিতেন। তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত কুটুম্বদিগের মহিলাগণ আসিয়া জুটিতেন। তাঁহাদের মধ্যে সকলকে ভক্তিমতী দেখা যাইত না, কিন্তু অনেকেই পরমহংসদেবের কৃপা লাভের জন্য লালায়িত হইতেন। এই রূপে ক্রমশঃ স্ত্রীলোক সংখ্যাও দিন দিন বাড়িয়া গিয়াছিল। পুরুষদিগের মধ্যে বিষয়ীরা যেমন আত্মাভিমানে পরিপূর্ণ, তাঁহাদের বাজারের শাক, মাছ কিম্বা বাটীর চাকর চাকরাণী যেমন খুসীর বিষয়, নিজ নিজ ইচ্ছার সম্পূর্ণ অধীন, তাঁহারা মনে করেন, ধর্ম্মটাও তদ্রূপ। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এই শ্রেণীর সংখ্যা প্রত্যেক পরিবারে শতকরা অষ্টনব্বই জনেরও কিছু অধিক হইবার সম্ভাবনা। আমরা দেখিতাম যে, এই স্ত্রীলোকেরা পরমহংসদেবকে দেখিয়া তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ বিকৃত-নাসোত্তলন-ভঙ্গিতে কহিতেন, "ওমা! ইনি আবার সাধু! জটা নাই, গায়ে ভস্ম নাই, গেরুয়া বসন নাই, একখানা বাঘছাল সঙ্গে নাই, এ কোন্ দিশি সাধু! কালে কালে কতই দেখ্‌বো" এই বলিয়া অভিমানের চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা দেখাইতেন। পরমহংসদেব এমনই সুচতুর ছিলেন যে, তিনি বাছিয়া বাছিয়া ভক্ত করিতেন। যে বাটীতে উপরোক্ত প্রকার স্বভাববিশিষ্ট স্ত্রী কিম্বা পুরুষ অধিক থাকিত, তিনি সেই বাটীতে প্রবেশ করিতেন এবং দর্পহারী পরমহংসদেব তাঁহাদের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া ঈশ্বরানুরাগ বৃদ্ধি করিয়া দিতেন। যে পুরুষ কিম্বা যে স্ত্রী আত্মাভিমানে পরমহংসদেবকে প্রথমে অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, তাঁহারাই আবার তাঁহার জন্য পাগল পাগলিনীপ্রায় হইয়া গিয়াছেন।

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ।

—০ঃ০—

ক্রমে পরমহংসদেবের একটী রীতিমত সম্প্রদায় হইয়া উঠিল। এই সম্প্রদায়, সম্প্রদায় বলিলে যে প্রকার বুঝায়, সে রূপ নহে। সম্প্রদায়ে এক মতে এবং এক ভাবে সকলেই পরিচালিত হইয়া থাকে, কিন্তু পরমহংসদেবের নিকট তাহা ছিল না। পূর্ব্বে স্থানে স্থানে বলা হইয়াছে যে, তাঁহার নিকট সকল সম্প্রদায়ের লোকজন যাতায়াত করিতেন এবং তাঁহারা সকলে পরমহংসদেবকে

তাঁহাদের স্ব স্ব সম্প্রদায়ের সিদ্ধপুরুষ বলিয়া জানিতেন। এই ব্যক্তিগণ সকলে একত্রিত হইলে জনাকীর্ণ হইয়া পড়িত। পরমহংসদেব তাঁহাদের মধ্যস্থলে থাকিলে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখাইত। তিনি যাহা উপদেশ দিতেন, কার্য্যে তাহাই দেখাইতে পারিতেন। তিনি বলিতেন, এক ঈশ্বর, ভাব অনন্ত। এ স্থানে সেই ভাবের কার্য্যই হইত। এই নানাবিধ ভাবের ভক্তেরা কোন কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা আপন স্বার্থ চরিতার্থ করিবার জন্য আসিতেন এবং তাহা পূর্ণ হইয়া যাইলে প্রস্থান করিতেন। কার্য্যকারী ভক্তদিগের মধ্যে ভক্তবীর সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, বলরাম বসু, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, হরিশ্চন্দ্র মুস্তফী, দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অতুলকৃষ্ণ ঘোষ, মনোমোহন মিত্র, কালিদাস মুখোপাধ্যায়, নবগোপাল ঘোষ, কালীপদ ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ভক্তশ্রেষ্ঠ মহাত্মারা সকলে মিলিত হইয়া পরমহংসদেবের আবির্ভাব উপলক্ষে মহোৎসব কার্য্যটী আরম্ভ করিলেন। ভক্তবীর সুরেন্দ্র এই মহোৎসবের প্রস্তাবকর্ত্তা এবং প্রথম বৎসর তিনি নিজ ব্যয়ে তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া সকলের তন্দ্রা ভঙ্গ করিয়া দিয়াছিলেন। পর বৎসর হইতে অদ্যাপি সাধারণ ব্যয়ে আবির্ভাব মহোৎসব সমাধা হইয়া আসিতেছে। জন্মোৎসবের দিন পরমহংসদেবের ভক্ত ও অন্যান্য যে কোন ব্যক্তি তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন, তাঁহাদের প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করা হইত। নিমন্ত্রিত ব্যক্তি ব্যতীত কত রকমের ভক্ত আসিয়া উপস্থিত হইতেন। প্রাতঃকাল হইতে ভক্তদিগের সমাগম আরম্ভ হইত। ত্রৈলোক্য বাবু এবং তাঁহার কর্ম্মচারীরা এ বিষয়ে বিশেষ সহায়তা (না করাই আশ্চর্য্যের বিষয়) করিতেন। যে সকল ব্যক্তিরা তথায় গমন করিতেন, তাঁহারা এই উপলক্ষ ব্যতীত কস্মিন্ কালে সে প্রদেশে যাইতেন কি না সন্দেহ। দশটার পরে পরমহংসদেব স্নানাদি করিতেন, পরে কীর্ত্তন আরম্ভ হইত। এই কীর্ত্তনে যে কি আনন্দ হইত, তাহা বর্ণনা করিবার যদ্যপি প্রভু কর্ত্তৃক কেহ শক্তি লাভ করেন, তিনি ব্যতীত আর কাহার শক্তি নাই; এ ক্ষেত্রে আমরা তাহা প্রকাশ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিব, যদ্যপি তদ্দ্বারা পাঠক পাঠিকারা তাহার কিঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হইতে পারেন। কীর্ত্তনের রস অক্ষরে (আঁকরে) বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পরমহংসদেব মধ্যে মধ্যে অক্ষর দিয়া গানটীকে মাতাইয়া আপনি মাতিয়া উঠিতেন। তিনি মাতিলে আর কাহার রক্ষা থাকিত না। ভক্তেরাও বিহ্বল হইতেন। এই মাতান

ভাবটীর বাস্তবিক সংক্রামকতাশক্তি ছিল। এক জনের হইলে আর এক জনকে আক্রমণ করিবেই, তাহার সন্দেহ নাই। ফলে, সেই স্থানের উপস্থিত ব্যক্তিরা কাষ্ঠ পুত্তলির ন্যায় হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। পরমহংসদেবের এ অবস্থায় জ্ঞান থাকিত না, তাহা স্থানান্তরেও বলা গিয়াছে। এই সময় উপস্থিত হইবার জন্য বিশেষ ভক্তেরা অপেক্ষা করিতেন। সেই সময়ে তাঁহাকে মনের সাধে সাজান হইত। জনৈক স্ত্রীলোক ভক্ত তাঁহার বস্ত্রখানি চাঁপা ফুলের রং করিয়া দিতেন। আহা! সেই বস্ত্র পরিধান করাইয়া দিলে তাঁহার কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বাহির হইত! গৌরী মা পুষ্পের মালা ও চন্দন আনিয়া দিতেন। যখন সেই মালা গলদেশে শোভা পাইত, যখন শ্বেত চন্দনের বিন্দু সকল চরণ এবং ললাটে প্রকাশিত হইত, তখন তাঁহাকে দর্শন করিয়া নয়ন এবং মনের আকাঙ্ক্ষা মিটিত না। আহা! সে রূপের তুলনা কি আছে? সে রূপ উপমাবিরহিত। সে রূপে যাহার নয়ন একবার ধাবিত হইয়াছে, সে আর প্রত্যাগমন করিতে পারে নাই। যেন রূপের জালে নয়ন-বিহঙ্গ আবদ্ধ হইয়া পড়িত। সে রূপ দেখিলে, আর অপরূপ বলিয়া জগতে দ্বিতীয় বস্তু স্বীকার করা যায় না। তখন মনে হইত, দেখিবার বস্তু বুঝি এত দিনের পর দেখা গেল। যাহা আমরা দেখি, সুন্দর মনোহর বলিয়া দেখি, তাহা সে রূপের নিকট কি সুন্দর বা মনোহর? তুলনা করিব কি? সে রূপ অনুপমেয়। চাঁদের তুলনা চাঁদ, সূর্য্যের তুলনা সূর্য্য, স্বর্ণের তুলনা স্বর্ণ, তেমনি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সে রূপের তুলনা তাঁহারই রূপ— তাঁহার তুলনা তাঁহারই নিকট। রূপ দেখিয়া মন ভুলিল, আপনাকে আপনি ভুল হইল, সকলে রামকৃষ্ণময় হইয়া পড়িল। জয় ধ্বনিতে দিক্ কম্পিত হইতে লাগিল, প্রাণের উৎসাহসূচক ভাব যেন হৃদয় ভেদ করিয়া বহির্গত হইতে লাগিল। কেহ ঊর্দ্ধবাহু হইয়া, কেহ করতালী দিয়া, কেহ ত্রিভঙ্গ ঠামে এবং লম্ফে ঝম্ফে নৃত্য করিতে লাগিলেন। নৃত্য করিতে করিতে কেহ প্রেমে বিহ্বল হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন, কেহ ভক্তের গায়ে ঢলিয়া পড়িলেন, কেহ আনন্দে অশ্রু বরিষণ করিতে লাগিলেন, কেহ হাসিতে হাসিতে যেন শ্বাস বায়ু পর্য্যন্ত প্রশ্বাস করিয়া ফেলিলেন এবং কেহ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। ক্রমে সকলে অর্দ্ধ মৃতপ্রায় হইয়া আসিলেন। আর বাক্য সরে না, ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাসে কাশি আসিয়া স্বরভঙ্গ করিতে লাগিল, সকলের গলদ্‌ঘর্ম্ম ছুটিল, খুলির হস্ত ফুলিয়া উঠিল,

সুতরাং সঙ্কীর্ত্তনের বিরাম হইল। শান্তি শান্তি প্রশান্তি আসিয়া সকলকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

পরমহংসদেব ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইলেন। অমনি গলার মালা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিলেন, বস্ত্রান্তর্ভাগের দ্বারা ললাটের চন্দন মুছিয়া ফেলিলেন, কিন্তু চরণের চন্দন কখন মুছিতে পারিতেন না। ঠাকুর! ভক্ত-দিগের নিকট আপনার চতুরালি চলিতে পারে না। স্বচ্ছন্দে মালা ছিঁড়িলেন, কপালের চন্দন মুছিলেন; এইবার মুছিয়া ফেলুন? অপেক্ষা কিসের? উহাতেও ত রজোগুণের প্রকাশ পাইতেছে; লোক দেখিতে পাইতেছে যে, ভক্তেরা পূজা করিয়াছে—মুছিয়া ফেলুন? বলিয়া রসিক ভক্ত-দিগের মনে ইত্যাকার আনন্দোচ্ছ্বাস হইতে লাগিল। তিনি চরণের চন্দন মুছিতে পারিলেন না! পারিবেন কেন? চরণ তাঁহার নয়, তিনি যাহাকে যাহা দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অধিকার কি? ভক্তেরা চরণ পাইয়াছে, সে চরণ তাহাদের হৃদয়ের ধন, সুতরাং তাহার শোভা বিনষ্ট করিতে পারিলেন না।

তিনি তদনন্তর ভক্তদিগের সহিত একত্রে ভোজন করিয়া অশেষ প্রীতি লাভ করিতেন, কিন্তু এরূপ স্থানে তিনি বর্ণানুরূপ ব্যবস্থা করিতে কহিতেন। যে সকল ভোজ্য সামগ্রী প্রস্তুত হইত, তাহার অগ্রভাগ কেহ পাইত না, অথবা কোন দেবদেবীকে নিবেদন করিয়াও দেওয়া হইত না। সমুদায় দ্রব্যগুলি পরমহংসদেবের গৃহে একত্রিত করিয়া তাঁহাকে দেখান হইত এবং সমস্ত দ্রব্যের অগ্রভাগ তাঁহাকেই প্রদান করা হইত। ভক্তেরা এই প্রকার ভোগের ব্যবস্থা করিতেন।

আজ সে দিন আর নাই! আজ সে রাম নাই, সে অযোধ্যা নাই! সেই ভক্তগণ আছেন, সেই দক্ষিণেশ্বর, কালীমন্দির ও পঞ্চবটী আছে, সেই আবির্ভাব মহোৎসবও প্রতি বৎসর হইতেছে, কিন্তু সে ভাব কোথায়? সে আনন্দ কোথায়? সে প্রেমের বন্যা কোথায়? সে সকল ফুরাইয়াছে, এ জীবনের মত ফুরাইয়াছে। আর সে দিন আসিবে না, আর তেমন করিয়া বস্ত্র পরিধান করাইয়া মনের সাধ মিটিবে না! আর সে সচন্দন চরণযুগল দেখিতে পাইব না, আর সে শ্রীমুখের মধুর নাম শ্রবণবিবরে ঢালিয়া মানব জন্ম সার্থক করিতে পাইব না! কালের স্রোতে সকলই চলিয়া গিয়াছে, কেবল স্মৃতিমাত্র এক্ষণে মৃতপ্রায় দেহকে জীবিত করিয়া রাখিয়াছে।

পরমহংসদেব ধনীদিগকে বড় পছন্দ করিতেন না, তিনি কাঙ্গাল ব্যক্তিদিগের প্রতি নিতান্ত প্রসন্ন ছিলেন। একদা আবির্ভাব মহোৎসবের দিন কোন একটী স্ত্রীলোক চারিটী রসগোল্লা লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি মাতাঠাকুরাণীর নিকট যাইয়া তাহা প্রদান করেন। তথায় অনেকগুলি ভক্ত স্ত্রী উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা তদ্দৃষ্টে কহিলেন যে, "বাছা! ঠাকুর এখন ভক্তদিগের সহিত মাতিয়াছেন, কেমন করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইবেন, বিশেষতঃ তাঁহার এখন ভোজন হইয়া গিয়াছে, এখন ত আর কিছু খাইবেন না? খাইলে অসুখ হইবে।" এই কথা ভক্তের প্রাণে যে কি গুরুতর শেলবৎ বিদ্ধ হইয়াছিল, তাহা ভক্ত ব্যতীত কেহ বুঝিতে সক্ষম হইবেন না। তাঁহার চক্ষে জল আসিল এবং মনে হইল, "ঠাকুর! তুমি ত অনাথনাথ! তোমার ভক্তেরা বড়লোক, তাহারা অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া মহোৎসব করিতেছে, তুমি আনন্দ করিতেছ। আমি দীনহীনা কাঙ্গালিনী। অনেক ক্লেশে আমি চারিটী পয়সা সংস্থান করিয়াছি। কি করিব আমার শক্তি নাই, আমি বুঝিলাম, তুমি কাঙ্গালের ঠাকুর নও!" যিনি তাঁহাকে ডাকিতে জানেন, যিনি হৃদয়তন্ত্রী টানিতে শিখিয়াছেন, যিনি তাঁহার ডাক-নাম শুনিয়াছেন, তাঁহার ডাকের প্রত্যুত্তর না দিয়া পলাইবার উপায় নাই। পরমহংসদেব তৎক্ষণাৎ আসিয়া রসগোল্লা ভক্ষণ করিয়া যাইলেন। হায় প্রভু! আমাদের এমন অভাজন করিলেন কেন? আমাদের আপনার সেই নাম, যে নামে ডাকিলে আপনি শুনিতে পান, আপনি কথা ক'ন, আপনি আসিয়া ভক্ত-প্রদত্ত মিষ্টান্ন ভক্ষণ করেন, তাহা আমাদের দিলেন না! তাহা হইলে, আমরা যখন তখন আপনার সহিত প্রাণ ভরিয়া, আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া কথা কহিয়া লইতাম। কি জানি কেন তাহা দেন নাই। ভাল বুঝিয়াছেন যাহা, তাহাই করিয়াছেন, তাহাতে আর আমাদের বক্তব্য কি থাকিতে পারে?

আর একদিন শশী নামক একটী কুমার ভক্ত (শশী সাক্ষাৎ হনুমানের মূর্ত্তি! অমন সেবা, বলিতে কি বোধ হয় স্বয়ং লক্ষ্মীও জানেন না!) পরমহংসদেবের জন্য এক পয়সার বরফ চাদরের প্রান্তভাগে বাঁধিয়া কলিকাতা হইতে দক্ষিণেশ্বরে লইয়া গিয়াছিল। এক পয়সার বরফ দুই প্রহরের সূর্য্যোত্তাপে চাদরের খুঁটে বাঁধা, প্রায় সাড়ে তিন ক্রোশ পথ, বালক লইয়া গেল! যেমন বরফ প্রায় তেমনি ছিল। পরমহংসদেব সেই বরফ পাইয়া অপরিমিত আনন্দিত হইয়াছিলেন। ভগবান্ ভক্তের বাসনা এইরূপ রক্ষা করিয়া থাকেন।

আর একদিন বাবু কেদার নাথ চট্টোপাধ্যায়, বরদাকান্ত শিরোমণি ও অপর দুই একটী ভক্ত একত্রিত হইয়া উদ্যানে ভোজনের নিমিত্ত পঞ্চবটীর নিম্নে অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তত করিতেছিলেন। ভক্তেরা নিতান্ত স্বার্থপর জাতি, আপনাদের উদ্দেশ্য সাধন হইলেই হইল। যাঁহার নিকট যাইয়া ঘূর্ণায়মান সংসার-কুলাল-চক্রের বিভীষিকা হইতে অব্যাহতি পাইলেন, যাঁহার কৃপায় কালের বিকট দশনাঘাত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন, তাঁহার সমক্ষে অন্ন প্রস্তত করিয়া ভক্ষণ করিবেন বলিয়া স্থির নিশ্চয় করিলেন, কিন্তু সেই মহা-পুরুষকে তাহা প্রদান করিয়া প্রসাদ ভক্ষণ করিতে হইবে, এ বুদ্ধি কাহারও ঘটে আইসে নাই। তাই ত বলি, এমন অবস্থা না হইলে রামকৃষ্ণের জন্ম হইবে কেন? পরমহংসদেব স্নানাদি করিয়া পঞ্চবটীতে যাইবামাত্র সকলে সসব্যস্ত হইলেন। তিনি প্রথমে কি কি পাক হইয়াছে সংবাদ লইলেন। পরে খিচুড়ির কথা শুনিয়া বলিলেন, "তাইত, বড় গরম, আমায় তোমরা অন্ন প্রস্তত করিয়া দাও, আহার করিব।" লজ্জায় সকলের মাথা হেট হইল, কাহার মুখে আর কথা নাই। সকলে চতুর্দ্দিক ধূমময় দেখিলেন। পরমহংসদেব কহিলেন, "দেখ, আমার ঘরে যে সন্দেশের হাঁড়ি আছে, তাহাতে ভাত রাঁধিতে পার?" ভক্তদিগের নিকটে চাউল ছিল, কিন্তু হাঁড়ি ছিল না, তাই তাঁহারা চিন্তা করিতেছিলেন। অমনি কোন ভক্ত সেই হাঁড়ি আনিয়া দিলেন এবং শিরোমণি মহাশয় অন্ন প্রস্তত করিতে আরম্ভ করিলেন। কি বিভ্রাট! সে হাঁড়িতে সন্দেশ ও চিনি থাকিত, তাহাতে অগ্নির সংস্পর্শ হইবামাত্র অমনি ফাটিয়া জল পড়িতে লাগিল এবং ফোঁস ফোঁস্ শব্দ হইতে লাগিল। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। আজ বিষম পরীক্ষার দিন। যদি প্রভুর আহার না হয়, আজ বুঝিব যে, আমাদের অন্ন চিরদিনের মত উঠিয়াছে। সম্মুখে ভাগিরথী, মা দেখিও! যদি প্রভুর অন্ন ভোজন না হয়, তাহা হইলে এ মুখ যেন লোকালয়ে আর না দেখাইতে হয়। মাগো! তুমি এই পাপিষ্ঠদিগের জন্য একটু স্থান দিও মা!" বলিয়া কথকের মনে মনে ধিক্কার হইতে লাগিল! যতই ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ হইতে লাগিল, কথকের শরীর হইতে যেন একসের পরিমাণে শোণিত বহির্গত হইয়া যাইতেছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে ভাত ফুটিতে আরম্ভ হইল। বেলাও তখন প্রায় দুই প্রহর। একে হাওয়ায় উনুনের তাপ বাহির হইয়া যাইতেছে, তাহাতে হাঁড়ির জল বাহির হইয়া ফোঁস্ ফোঁস্ করিতেছে, তাহাতে আবার পরমহংসদেবের আহারের সময় অতীত হইয়া যাইতেছে, কি হইবে ভাবিয়া

কথকের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইল। শিরোমণির কথকতার ব্যবসা আছে। তিনি ভাবিলেন, "হায়! ঠাকুর! এমন করিয়া আমায় শাস্তি না দিয়া পূর্ব্ব হইতে বিদায় করিয়া দিয়া কথকদিগের ন্যায় মূর্ত্তিমান্ কলির রূপবিশেষ করিয়া রাখিলে আমার সহস্র গুণে ভাল হইত। আমি অপবিত্র, হরিনামব্যবসায়ী, আপনি জেনে শুনে কেন এ কলঙ্কসাগরে নিমগ্ন করিলেন। আমার কলঙ্ক হউক, তাহাতে আমি ভীত নহি। কলঙ্কের পসরা যখন মস্তকে লইয়াছি,তখন কলঙ্কে আর ভয় কি? কিন্তু আমা কর্ত্তৃক যে আজ আপনার আহার হইল না,এই মনস্তাপ যে আর রাখিবার স্থান নাই। কলঙ্কভঞ্জন হরি! লজ্জানিবারণ মধুসূদন! আজ রক্ষা কর—এই বিপদ সাগর থেকে উদ্ধার কর।" এইরূপে সকলেই বিমর্ষ হইয়া এক দৃষ্টিতে অন্নের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। পরমহংসদেব কহিলেন, "ভাত হইয়াছে কি?" "সর্ব্বনাশ উপস্থিত! অরে বজ্র! তুই এখন কোথায়? মস্তকে পতিত হইয়া আমাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিয়া দে, যেন আর একেবারে উত্তর দিবার শক্তি না থাকে!" আবার বলিলেন, "এত দেরি হ'চ্চে কেন?" "প্রভু! আর না—আর এই ক্ষুদ্র আধার আপনার তাড়না সহ্য করিতে পারে না। আমরা ত দোষ করিয়াছি। প্রভু! আমরা নির্দ্দোষী ছিলাম কবে যে, আজ আমাদের পরীক্ষা করিতেছেন? ক্ষমা করুন, যাহা হয় একটা করিয়া দিন, আমরা নিশ্চিন্ত হই।" এই বলিয়া তখন সকলে হতাশ হইয়া পড়িলেন। তিনি আবার কহিলেন, "এতক্ষণে হয় ত হইয়াছে।" এই কথায় ভক্তদিগের প্রাণ উড়িয়া গেল। শিরোমণি কি করিবে, কাঁপিতে কাঁপিতে একটী অন্ন টিপিয়া দেখিলেন যে, অন্নগুলি সুসিদ্ধ হইয়াছে। তিনি অতি সাবধানে হাঁড়ি হইতে যখন পাত্রান্তরে অন্নগুলি ঢালিলেন, হাঁড়িটীর তলা ফুটিফাটার ন্যায় চারি-চির হইয়া গিয়াছে। তদ্দ্বারা সমুদায় জল নির্গত হইয়া যাওয়ায়, অন্নগুলি যেন শোলার ন্যায় লঘু বলিয়া দৃষ্ট হইল। পরমহংসদেবের আনন্দের সীমা রহিল না। শিরোমণিকে কহিতে লাগিলেন, "তোমার আরূঢ় ভক্তিতে এই ভাঙ্গা হাঁড়িতে রাঁধিতে পারিয়াছ; তাহা না হইলে কখনই হইত না।" শিরোমণি মনে করিলেন, আর কথায় কাজ নাই, আরূঢ় ভক্তি থাকে থাকুক, আর না থাকে নাই থাকুক, কিন্তু এমন পরীক্ষায় আর কখন ফেলিবেন না। আমাদের যদি পরীক্ষা দিবার শক্তি থাকিত, তাহা হইলে আপনি কি জন্য আসিয়াছেন? যাহারা পরীক্ষা দিতে পারে, তাহারা ত আপন জোরে চলিয়া যায়। শক্তিবিহীন আমরা

আপনার শরণাগত, এই বুঝিয়াছি। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন এই বুদ্ধি দৃঢ় হইয়া যায়।

পরমহংসদেব এইরূপে দক্ষিণেশ্বরে বসিয়া নানাবিধ ভক্ত * লইয়া বিহার করিতেছিলেন। আনন্দের আর অবধি ছিল না। নিত্য নব নব ভাব, নব নব রস ও নব নব উপদেশে মন প্রাণ দেহ যেন পুলকে আর্দ্র হইয়া থাকিত। তখন প্রত্যেক ভক্তের মনে যে কি অপার আনন্দ নিরবচ্ছিন্নভাবে অবস্থিতি করিত, তাহা এখন স্মরণ করিলে স্বপ্নবৎ জ্ঞান হইয়া থাকে। তখন সমস্ত দিন কিরূপে যে অতিবাহিত হইয়া যাইত, তাহা বুঝা যাইত না। প্রত্যেক রবিবারে এবং ছুটীর দিন লোকে লোকারণ্য হইত। পরমহংসদেব সকলকে মাতাইয়া তুলিতেন। এতদ্ভিন্ন পরমহংসদেবকে নিভৃতে পাইয়া দুটো প্রাণের কথা কহিতে অনেকেই অবসর অন্বেষণ করিতেন। তাঁহারা অন্য বারে আসিয়া কার্য্য সাধন করিয়া যাইতেন। এমন সময়ে একদিন সন্ধ্যার সময় পরমহংসদেব ভাবাবেশে বলিয়াছিলেন, "এখানে যে আসিবে, কেমন করিয়া ঈশ্বর দর্শন ও জ্ঞান ভক্তি পাইব বলিয়া যে আসিবে, তাহারই মনোরথ পূর্ণ হইবে।"

একদিন অপরাহ্নে আমরা তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত গমন করিয়াছিলাম। পরমহংসদেব একাকী বসিয়াছিলেন, প্রণাম করিয়া আমরা উপবেশন করিলে, তিনি কহিলেন, "দেখ আমি মা'কে কহিতেছিলাম যে, আর আমি লোকের সহিত কথা কহিতে পারি না। গিরিশ, বিজয়, কেদার, মহেন্দ্র এবং —(আর একটী শিষ্যের নাম † উল্লেখ করিয়া), এদের একটু শক্তি দে। ইহারা উপদেশ দিয়া প্রস্তুত করিবে, আমি একবার স্পর্শ করিয়া দিব।" আমরা আশ্চর্য্য হইয়া রহিলাম। তখন আমরা তাঁহার এপ্রকার কথার তাৎপর্য্য

---

* এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, যদিও সকল মতের ব্যক্তিরা তাঁহার নিকট উপদেশাদি লইতেন, কিন্তু ইহাদের সহিত পরমহংসদেবের মোটের উপর ত্রিবিধ ভাব দেখা যাইত। এক শ্রেণীর ব্যক্তিরা পরমহংসদেবকে গুরু এবং ঈশ্বর বলিতেন। পরমহংসদেব ইহাদের অনেকেরই পরিত্রাণের জন্য বকলমা লইয়াছেন বা নিজে দায়ী হইয়াছেন। এই ভক্তদিগকে আমরা বিশেষ ভক্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। দ্বিতীয় শ্রেণীর ভক্তেরা পরমহংসদেব হইতে কোন প্রকার প্রাচীন মতের দীক্ষা লইয়াছেন। এই নিমিত্ত তাঁহার সহিত গুরু শিষ্য সম্বন্ধ মাত্র। তৃতীয় শ্রেণীর ভক্তেরা অপর (যথা কুলগুরু ইত্যাদি) কর্ত্তৃক দীক্ষিত হইয়া আপন অভীষ্ট পূরণের নিমিত্ত পরমহংসদেবের সহায়তা লইয়াছেন, তাঁহাদের সহিত পরমহংসদেবের উপগুরু সম্বন্ধ।

† রাম—গ্রন্থকার সেবক রামচন্দ্র।

কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তিনি যে আমাদের অকূলে নিক্ষেপ করিয়া পলাইবার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন, তাহা কে জানিত?

ইহার কিছুদিন পরে তিনি গলদেশে বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন। প্রথম কয়েক দিন সে বিষয়ে কিছুই মনোযোগ করা হইল না। ক্রমে বেদনা বৃদ্ধি হওয়ায় গলাধঃকরণ করা অতিশয় ক্লেশকর হইয়া পড়িল। কঠিন দ্রব্য আহার করিতে অপারক হইলেন এবং তরল পদার্থ দ্বারা জীবন রক্ষা করিতে লাগিলেন। এই বেদনা ক্রমে গণ্ডমালায় পরিণত হইল। ইহাদের মধ্যে একটী বিচি স্ফীত ও প্রদাহযুক্ত হইয়া পাকিয়া উঠিল এবং গলনালিতে ফাটিয়া উহা হইতে পুঁজ নির্গত হইতে লাগিল। চিকিৎসার নিমিত্ত প্রথমে ডাক্তার রাখালদাস ঘোষ কিয়দ্দিবস যাতায়াত করিয়াছিলেন। তিনি অকৃতকার্য্য হইলে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার দীর্ঘকাল চিকিৎসা করিয়া বিশেষরূপে উপকার করিতে পারিলেন না। রোগের বৃদ্ধি এবং তাঁহার শারীরিক দৌর্ব্বল্য হওয়ায় ভক্তেরা বড়ই চিন্তিত হইলেন। তাঁহার শরীর দুর্ব্বল হইতেছিল, তথাপি কীর্ত্তন করা অথবা উপদেশাদি দেওয়া একদিনও বন্ধ করেন নাই। যে দিন অতিশয় মাতামাতি হইত, সেইদিন রোগের যন্ত্রণাও অত্যন্ত বৃদ্ধি হইত, তজ্জন্য অশেষ প্রকার ক্লেশ পাইতেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাহা ভুলিয়া গিয়া পূর্ব্বের ন্যায় আনন্দ করিতেন।

যত দিন যাইতে লাগিল, ব্যাধিও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া, তাঁহার শরীর একেবারে যারপরনাই অসুস্থ হইয়া আসিল। সময়ে সময়ে এত অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব হইত যে, পর দিবস অতি ক্লেশে শয্যাত্যাগ করিতেন। কিছুতেই ব্যাধির উপশম না হওয়ায় আমরা কালীপদ, গিরিশ ও দেবেন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলাম যে, একজন বহুদর্শী ইংরাজ ডাক্তারের দ্বারা ব্যাধি নিরূপণ করা কর্ত্তব্য। এই স্থির করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে আমরা দক্ষিণেশ্বরে গমন করিয়া দেখিলাম যে, পরমহংসদেব অতি বিষন্নভাবে একাকী বসিয়া আছেন। সেদিনকার ন্যায় অমন হৃদয়বিদারক ভাব ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই। আমরা আনন্দময়ের বিরস বদন দেখিয়া চতুর্দ্দিক শূন্য বোধ করিলাম। কি বলিয়া সম্ভাষণ করিব, ভাবিয়া অস্থির হইলাম। চলিত সামাজিক কথা, "কেমন আছেন," তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বলিতে পারিলাম না। কিন্তু তিনি আপনি কহিলেন, গতকল্য প্রায় এক পোয়া রক্ত উঠিয়াছিল। সে সময়টী শ্রাবণ মাসের শেষ, সর্ব্বদাই বৃষ্টি হইতেছিল এবং

গঙ্গার জল বৃদ্ধি হওয়ায় বাগানের উপরেও জল উঠিয়াছিল। তাঁহার একে গল-নালীর পীড়া, তাহাতে অমন বর্ষা, একতলা, আর্দ্র স্থান, তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর জ্ঞান করিয়া আমরা নিতান্ত কাতর হইয়া বলিলাম, "যদ্যপি অনুমতি করেন, তাহা হইলে একটী কথা বলি।" তিনি মস্তক নাড়িয়া আদেশ করিলেন। আমরা কহিলাম যে, "দিন কতক কলিকাতায় যাইয়া যদ্যপি অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে ইংরাজ ডাক্তার দ্বারা আপনার চিকিৎসা করান যায়। এরূপ প্রকারে আর সময় নষ্ট করা উচিত হইতেছে না বলিয়া বোধ হইতেছে। হায়! কি অশুভক্ষণেই সেই কথা আমাদের মুখ হইতে বাহির হইরাছিল। আমরা যদি তাহা না বলিতাম, হয় ত তাঁহার দক্ষিণেশ্বর পরিত্যাগ করা হইত না। আমরা অগ্র পশ্চাৎ না বুঝিয়া মনের আবেগে একটা কথা বাহির করিয়া পরিণামে এত যন্ত্রণা, এত মর্ম্মাঘাত পাইতেছি এবং যন্ত্রণা পাইয়াও তাহার বিরাম হইতেছে না। অথবা কি বলিতে কি বলিয়াছি, ইহা তাঁহার ইচ্ছা। তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত তাঁহার আসন পরিববর্ত্তন করা কি একজন ভৃত্যের কর্ম্ম? কখন নহে। এ প্রস্তাবে তিনি মহা আনন্দিত হইয়া বাগবাজার এবং গঙ্গার সন্নিহিত একটী বাড়ী ভাড়া লইবার জন্য আজ্ঞা দিলেন এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালকে ডাকাইয়া তখন পঞ্জিকা দেখিতে বলিলেন। শনিবার বেলা তিনটার পর দিন স্থির হইল। সে দিন বৃহস্পতিবার, সুতরাং মধ্যে একটী দিন রহিল। আমরা তৎক্ষণাৎ তথা হইতে কলিকাতাভিমুখে প্রত্যাগমন করিয়া বাগবাজারের রাজার ঘাটের পূর্ব্ব গলির ভিতরে একটী নূতন দ্বিতল বাড়ী ভাড়া লইলাম। পরমহংসদেব শনিবার প্রাতঃকালেই কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলেন। তিনি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে গমন পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, "আমাকে কি এরা গঙ্গাযাত্রা করিয়াছে? এ বাটীতে আমি থাকিতে পারি না।" কি কারণে তিনি যে এ কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আমরা জানি না। তিনি তখনই বলরাম বাবুর বাটীতে আসিয়া অবস্থিতি করিলেন।

পরমহংসদেব কলিকাতায় আসিয়াছেন, এই কথা প্রচার হইয়া গেল। তাহাতে লোকের সমাগম ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। বলরাম বাবুর বাটী যেন উৎসবক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইল। এখানে আসিয়া তিনি ইংরাজ ডাক্তার দেখাইতে আপত্তি করিলেন; সুতরাং প্রতাপ বাবুই ঔষধ বিধান করিতে লাগিলেন। পরমহংসদেবের শরীর বালকের অপেক্ষাও দুর্ব্বল ছিল, তন্নিমিত্ত হোমিওপ্যাথিক একটী দানা সেবন করিলেও তাঁহার শরীর বিকৃত হইয়া

যাইত। প্রতাপ বাবুকে বিশেষ সাবধানে ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হইত। বলরাম বাবুর বাটীতে এক পক্ষের অধিক বাস করিবার সুবিধা হইল না। তিনি তন্নিবন্ধন শ্যামপুকুরের শিবু ভট্টাচার্য্যের বাটীতে আসন পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই স্থানে আসিয়া রোগ কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইল। প্রতাপ বাবুর অনুরোধে, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়কে আনয়ন করিবার জন্য মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়কে প্রেরণ করা হয়। ডাক্তার সরকার পরমহংসদেবকে মথুর বাবুর সময় হইতে জানিতেন এবং এই ব্যাধির চিকিৎসার জন্য একদা তাঁহার শাঁখারিটোলার বাটীতে পরমহংসদেবকে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। ডাক্তার সরকারকে প্রতাপ বাবু পরামর্শের জন্য আনাইয়াছেন, এই ভাবেই ডাকা হয় এবং তাঁহার ষোল টাকা দর্শনীও সংস্থান করিয়া রাখা হইয়াছিল। পরমহংসদেবকে দেখিয়া ডাক্তার সরকার কহিলেন, "তুমি যে এখানে?" চিকিৎসার জন্য এরা এখানে আনিয়াছে বলিয়া পরমহংসদেব উত্তর করিলেন। ডাক্তার সরকার পূর্ব্বেই তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন। এবারেও অতি যত্ন সহকারে লক্ষণাদি দ্বারা রোগ নিরূপণ করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিলেন। তাঁহাকে সেই সময় দর্শনীর টাকা দেওয়া হইল। তিনি টাকা না লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ বাটী কাহার?" মহেন্দ্র বাবু কহিলেন, "পরমহংসদেবের ভক্তেরা ভাড়া লইয়াছে।" ডাক্তার সরকার ভক্তের কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন এবং বলিলেন, "ওঁর আবার ভক্ত কি?" ডাক্তার সরকার তখনও পর্য্যন্ত জানিতেন যে, ইনি মথুর বাবুর পরমহংস, অর্থাৎ বড়লোকের নানাপ্রকার সখের জিনিস থাকে, মথুর বাবুর পরমহংসও সেই ভাবে বলা হইয়াছিল। কিন্তু অদ্য তিনি নূতন কথা শুনিলেন। মথুর বাবুর পরমহংস আর এক্ষণে এক স্থানে সীমাবদ্ধ নহেন। অতঃপর তিনি অতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ভক্তদিগের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। গুপ্ত মহাশয়ও তাহা ব্যক্ত করিলেন। ডাক্তার সরকারের পূর্ব্ব সংস্কার দুরীভূত হইয়া আরও উৎসাহ বৃদ্ধি হইয়া গেল। তিনি যদিও একজন ঈশ্বর বিশ্বাসী ব্যক্তি বটেন, কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রাদি ও দেবদেবী এবং সাধু মহাত্মাদিগের অদ্ভুত শক্তি আদৌ বিশ্বাস করিতেন না এবং বোধ হয় আজও করেন না। বর্ত্তমান শতাব্দীর যে প্রকার পরিমার্জ্জিত ধর্ম্মভাব অর্থাৎ জীবের হিতসাধন করা, তাহা ডাক্তার সরকারের ধারণা ছিল এবং আছে। সে যাহা হউক, তিনি গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি ব্যক্তিদিগের নাম শুনিয়া বাস্তবিক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। পরমহংসদেব

কর্ত্তৃক গিরিশ প্রভৃতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে শুনিয়া, যারপরনাই বিমোহিত হইয়া কহিলেন, "ইহা অপেক্ষা হিতসাধন আর কি হইতে পারে? একটী ব্যক্তিকে কুপথ হইতে সুপথে আনিতে পারিলে, একজনের দায়িত্ব দূর হইতে পারে। পরমহংসদেব সাধারণের হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি। অতএব আমি টাকা লইব না।" মহেন্দ্র বাবু বিশেষ অনুরোধ করিয়া বলিলেন, পরমহংসদেবের ভক্তেরা ধনী না হইলেও কেহ অক্ষম নহেন। তাঁহারা অর্থব্যয় করিবার জন্যই তাঁহাকে কলিকাতায় আনিয়াছেন। আপনি সে জন্য কিছু মনে না করিয়া টাকা গ্রহণ করুন। ডাক্তার সরকার হাসিয়া কহিলেন, "আমাকে সেই পাঁচজনের মধ্যে পরিগণিত করিয়া লউন। আমি বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক চিকিৎসা করিব। যতবার প্রয়োজন হইবে, আমি আপনি আসিব। আপনারা মনে করিবেন না যে, আপনাদের সন্তুষ্ট করিতে আসিব, আমার নিজের প্রয়োজন আছে, জানিবেন।" পরদিন ডাক্তার সরকার সন্ধ্যার সময় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেদিন তথায় লোকারণ্য হইয়াছিল এবং গিরিশ বাবু প্রভৃতি যাবতীয় ভক্তগণও উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তার সরকারের সহিত গিরিশ বাবুর পরিচয় হইল এবং নানাবিধ বিচারাদি হইতে লাগিল। গিরিশ বাবু এবং অন্যান্য ভক্তদিগের সহিত আলাপ করিয়া ডাক্তার সরকার যথেষ্ট আনন্দিত হইয়াছিলেন। সেদিন ডাক্তার সরকার প্রায় দুই তিন ঘণ্টা তথায় বসিয়াছিলেন।

ডাক্তার সরকার প্রত্যহ দুই প্রহরের পর পরমহংসদেবকে দেখিতে আসিতেন। ব্যাধি সম্বন্ধে কথা কহিয়া ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন এবং গিরিশ বাবুর সহিত নানাবিধ তর্ক বিতর্ক করিয়া কোন দিন সন্ধ্যার পর চলিয়া যাইতেন। এই বিচারের সারাংশ এই স্থানে প্রদত্ত হইতেছে।

ডাক্তার সরকারের মত এই যে, মনুষ্য গুরু হইতে পারে না; কেহ কাহার চরণ ধূলি লইতে পারে না; ভাব,সমাধি, মস্তিষ্কের বিকার, সাকার রূপাদি বা অবতার কখন হইতে পারে না এবং ঈশ্বর অসীম, তিনি কদাচ সীমাবিশিষ্ট নহেন। ইত্যাকার গুরুতর বিষয়গুলি লইয়া বিচার হইয়াছিল। যেদিন এই সকল কথা হইল,তাহার পরদিন সন্ধ্যার সময় ডাক্তার সরকার প্রভৃতি সকলেই উপস্থিত ছিলেন। এমন সময়ে ভাবের কথা উঠিল। ভাব অর্থে ঈশ্বরের নামে যে অচৈতন্যাবস্থা উপস্থিত হয়, আবার সেই নামে যাহা বিদূরিত হইয়া থাকে। ডাক্তার সরকার এপ্রকার ভাব কখন দেখেন নাই। বলিতে বলিতে

একজন অচৈতন্য হইলেন। ডাক্তার সরকার তাহাকে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছেন, এমন সময় আর একটী ভক্ত ঢলিয়া পড়িলেন। তাঁহাকে দেখিতেছেন, তৃতীয় ব্যক্তির ভাব হইল। এইরূপে এক সময়ে কয়েকটী ব্যক্তি ভাবাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। ডাক্তার সরকার বিমুগ্ধ হইয়া কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিলেন না। ঐশ্বরিক শক্তির বৃত্তান্ত নৈসর্গিক তত্ত্বে যদ্যপি পাওয়া যাইত, তাহা হইলে ভাবনা কি থাকিত? যাহা হউক, ডাক্তার সরকার বোধ হয় সে ঘটনার কিছুই বুঝিতে পারেন নাই।

চরণধূলি গ্রহণ করা সম্বন্ধে গিরিশ বাবুর সহিত তাঁহার নানাবিধ তর্ক বিতর্ক হইয়াছিল। সে তর্কে ডাক্তার সরকার এতদূর উৎসাহিত হইয়াছিলেন যে, তিনি পরমহংসদেবের চরণধূলি লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পরমহংস-দেবের প্রতি ডাক্তার সরকারের দিন দিন শ্রদ্ধা ও ভক্তি বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং একদিন বলিয়াছিলেন যে, "এতদিনের পর আমি হৃদয়গ্রাহী বন্ধু পাই-য়াছি।" আর একটী ভক্তের সহিত ডাক্তার সরকারের অনন্ত এবং খণ্ড সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিচার হইয়াছিল। ভক্ত কহিয়াছিলেন, "পৃথিবীতে কোন্ বস্তু খণ্ড বা সীমাবিশিষ্ট এবং কোন্ বস্তু অখণ্ড বা অসীম, তাহা স্থির করা যায় না। একটী বালুকা কণা—স্থূল দৃষ্টিতে খণ্ড পদার্থ বলা যায় বটে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই অবস্থাটী উহার স্বভাবসিদ্ধ নহে। ভূবায়ুর গুরুত্ব এবং উত্তাপের তারতম্যে পদার্থেরা রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। বিশেষতঃ, বালুকাকণা যাহা আমাদের দৃষ্টিতে খণ্ড বলিয়া বোধ হইতেছে, উহা অনুবীক্ষণে প্রকাণ্ড দেখাইবে। বালুকাকণা একটী পদার্থ নহে, উহা দ্বিবিধ পদার্থের সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপ পদার্থদিগের পরমাণুরাই সংযোগ ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে। পরমাণু কথাটীও আনুমানিক এবং অবস্থার কথা। বস্তুতঃ, পরমাণুর আয়তন কি, কেহ বলিতে পারে না এবং বলিবারও অধিকার নাই। যদ্যপি পরমাণুর স্থির না হয়, তাহা হইলে তাহার সমষ্টি লইয়া বাক্‌বিতণ্ডা করা কর্ত্তব্য নহে। ফলে, সকল বস্তুই অসীম বলিতে হইবে।" ডাক্তার সরকার কোন উত্তর দেন নাই।

একদিন পরমহংসদেব ডাক্তার সরকারের পুত্রটীকে দেখিতে চাহিয়া-ছিলেন। ডাক্তার সরকার পরদিন তাহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া গিয়াছিলেন। পুত্রটী যাইবামাত্র পরমহংসদেব তাহার হস্তধারণ পূর্ব্বক স্বতন্ত্র গৃহমধ্যে প্রবেশ

করিয়া কহিয়াছিলেন, "বাবা! আমি তোমার জন্য এখানে আসিয়াছি।" এই বলিয়া তাহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন।

শ্যামপুকুরে অবস্থানকালীন ডাক্তার সরকার ব্যতীত অন্যান্য কয়েকজন ডাক্তার এবং কয়েকটী কবিরাজ তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু কাহারও দ্বারা রোগের উপশম হইল না। কখন দশদিন ভাল থাকিতেন এবং কখন রোগ এত অধিক বাড়িয়া উঠিত যে, তাঁহার দেহের সুস্থতা বিষয়ে আর কোন আশা ভরসা থাকিত না। এই স্থানে তাঁহার সেবা করিবার নিমিত্ত কয়েকটী ভক্ত এবং একটী ব্রাহ্মণ কন্যা আসিয়া জুটিয়াছিলেন। এই স্ত্রীলোকটী ভক্তিমতী বটে, কিন্তু তাঁহার কিঞ্চিৎ তমোগুণাধিক্য-বশতঃ সেবাকার্য্যে বিশেষ ত্রুটি হইতে আরম্ভ হইল। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী এ পর্য্যন্ত দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন। আমরা পরমহংসদেবের চরণ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্মত করিয়া মাতাঠাকুরাণীকে শ্যামপুকুরের বাটীতে আনয়ন করিয়াছিলাম।

পরমহংসদেব সর্ব্বদাই ভক্তগণ বেষ্টিত হইয়া থাকিতেন। ভক্তেরা তাঁহাকে কথা কহিতে নিষেধ করিতেন, কিন্তু তিনি তাহা শুনিতেন না। এই স্থানে ভক্ত ব্যতীত বিস্তর ভদ্রলোকের সমাগম হইত।

এইরূপে শ্যামপুকুরের বাটীতে তিন মাস অতিবাহিত করেন। চিকিৎসায় উপকার হউক, আর নাই হউক, প্রচারকার্য্যই বিশিষ্টরূপে হইত। দিবারাত্র নৃত্য, গীত, ঈশ্বরালোচনায় কাটিয়া যাইত। এই স্থানে প্রত্যহই অদ্ভুত ঘটনা দেখা যাইত, সে সকল লিপিবদ্ধ করিতে যাইলে এক-জনের জীবনে সংকুলান হইতে পারে না। অন্যান্য ঘটনার মধ্যে কালীপূজার দিনের ব্যাপার এই স্থানে বর্ণিত হইতেছে।

মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়কে তিনি গুপ্তভাবে কহিয়াছিলেন যে, "কালী-পূজার দিনটী বিশেষ দিন। সে দিনে মাতার পূজা হওয়া উচিত।" গুপ্ত মহাশয় কালীপদ ঘোষের নিকট তাহা ব্যক্ত করেন। কালীপদ গিরিশ বাবুর দলস্থ একজন ব্যক্তি, পরমহংসদেব কর্ত্তৃক পরিবর্ত্তিত হইয়াছিলেন। কালীপদ তদবধি একজন প্রধান ভক্ত মধ্যে পরিগণিত। পরমহংসদেবের প্রতি তাঁহার ভক্তি অনুকরণীয়। তিনি পরমহংসদেবের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। কালীপদ এই কথা শুনিয়া কালীপূজার রীতিমত আয়োজন করিয়া দিলেন। দীপমালায় বাটী আলোকিত করিলেন এবং সন্ধ্যার পর ধূপ, দীপ, ফুল, বিল্বপত্র

গঙ্গাজল এবং সুজি, লুচি ও মিষ্টান্নাদি পরমহংসদেবের সম্মুখে সাজাইয়া দিলেন। চতুর্দ্দিকে লোকারণ্য। পরমহংসদেবের দুই পার্শ্বে দুইটী মোমের বাতি জ্বালাইয়া দেওয়া হইল। সকলের সংস্কার ছিল যে, পরমহংসদেব নিজে পূজা করিবেন, কিন্তু কোন প্রতিমা আনয়ন করা হয় নাই। কিছুকাল স্থির ভাবে সকলে উপবেশন করিয়া রহিল। অতঃপর কোন ভক্তের মনে উদয় হইল যে, "উনি পূজা করিবেন কি, আমরা ওঁকে পূজা করিব ?" এই ভাবিয়া তিনি গিরিশ বাবুকে সে কথা বলিলেন। গিরিশ একেবারে উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, "বলেন কি ? আমাদের পূজা গ্রহণ করিবেন বলিয়া অপেক্ষা করিতেছেন ?" তিনি "জয় রামকৃষ্ণ" বলিয়া পুষ্পাদি গ্রহণ পূর্ব্বক পরমহংস-দেবের পাদপদ্মে অর্পণ করিলেন। পরমহংসদেব আনন্দময়ীর ভাবে সমাধিস্থ হইয়া যাইলেন। তাঁহার সেই নব ভাবে সকলেই বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। "জয় রামকৃষ্ণ" ধ্বনিতে দিক্‌সমূহ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। নৃত্যের ঘটায় সেই বাটীর ছাদ অসহ্য বোধ করিয়া থাম থাম শব্দে আত্মদুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। এই সময়ে একটী ভক্ত পরমহংসদেবের ভাবাবসান হইতে দেখিয়া সুজির পাত্রটী সম্মুখে উত্তোলন করিয়া ধরিলেন। পরমহংসদেব তাহা ভক্ষণ করিলেন। তদনন্তর সকল প্রকার মিষ্টান্ন ও তাম্বুলাদি ভক্ষণ করিয়া ভক্তদিগকে অপার আনন্দ প্রদান করিয়াছিলেন। এই মহাপ্রসাদ লইয়া যে সেদিন কি আনন্দোৎসব হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা লেখনীর অধিকার-বহির্ভূত। সেবকমণ্ডলীর দ্বারা এই উৎসবটী অদ্যাপি কাঁকুড়গাছীর সমাধিমন্দিরে যথানিয়মে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

ক্রমে ব্যাধি বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। অন্নের মণ্ডও গলাধঃকরণ হওয়া দুষ্কর হইতে লাগিল। স্বরভঙ্গের লক্ষণ প্রকাশ পাইল এবং শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িল। কোন চিকিৎসাই ফলদায়িনী হইল না। ডাক্তার সরকারের পরামর্শে কলিকাতার বাহিরে বায়ু পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত চেষ্টা হইতে লাগিল। পরমহংসদেবের শারীরিক অবস্থা অতি ভয়ানক হইয়া পড়িয়াছিল, উঠিয়া এক পদ চলিবার শক্তি ছিল না এবং উঠিলে ক্ষতস্থানে বেদনা উপস্থিত হইত। কিন্তু স্থান পরিবর্ত্তন করা অনিবার্য্য হইয়াছিল। বাটীওয়ালারাও সেই সময় বাটী ছাড়িয়া দিবার জন্য বড় বিরক্ত করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু করা যায় কি ? কোন্ বাটীতে যাইবেন জিজ্ঞাসা করিলেও বলিবেন না। পরমহংসদেবের অভিমত হইবে, এমন বাটী কোথায়, তাহা কেহ জানে না। এইরূপ

নানাবিধ ভাবিয়া তাঁহার জনৈক সেবক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, “প্রভু! কোন্ দিকে বাটী অনুসন্ধান করা যাইবে।” পরমহংসদেব ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, “আমি কি জানি?” সেবক সে সময়ে কিঞ্চিৎ বিমর্ষ হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, “প্রভু! আমাদের সহিত এখন আপনার এই ভাব! ব'লে দিন কোন্ দিকে যাইব। অনর্থক ঘুরাইয়া মারিবেন না।” সেবক প্রকাশ্যে বলিলেন, “কাশীপুর বরাহনগর অঞ্চলে অন্বেষণ করিব?” তিনি ইঙ্গিতে আজ্ঞা দিলেন। আজ্ঞা পাইবামাত্র তৎক্ষণাৎ সেই সেবক তথায় যাত্রা করিলেন এবং মহিম চক্রবর্ত্তী নামক তাঁহার জনৈক ভক্তের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করায় তিনি একটী সুবৃহৎ উদ্যানের অনুসন্ধান বলিয়া দিলেন। পরে উদ্যানস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ৮০ টাকা মাসিক ভাড়া ধার্য্য হইয়া তিন মাসের জন্য ঐ উদ্যানটী আবদ্ধ করা হইল। যে দিবস বাড়ী ভাড়া হইল, সেই দিবসই পরমহংসদেব তথায় গমণ করিয়াছিলেন। স্থান পরিবর্ত্তন করায় তাঁহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ উপকার হইয়াছিল। গলার ক্ষত আরোগ্যপ্রায় হইয়া বিশেষ বল পাইয়াছিলেন। তিনি উপর হইতে নামিয়া উদ্যানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। ডাক্তার সরকার একদিন তাঁহাকে দেখিতে গিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং উদ্যানের চারিদিক ভ্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের কি দুরদৃষ্ট! পীড়া পুনরায় প্রবলবেগে আক্রমণ করিল। এবার বহুবাজারনিবাসী রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয় চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। তিনি ক্রমাগত তিন চারি মাস ঔষধ প্রয়োগ করিয়া কোন ফল দর্শাইতে পারিলেন না। রাজেন্দ্র বাবু নিরস্ত হইলে বৃদ্ধ নবীন পালকে আহ্বান করা হইল। নবীন পালের ঔষধ ক্রমান্বয়ে কিছুদিন চলিয়াছিল। মধ্যে মধ্যে অন্যান্য ডাক্তারেরাও আসিয়া দেখিতেন। যখন দেখা গেল যে, কাহার দ্বারা কোন প্রকার উপকার হইতেছে না, তখন পরমহংসদেবের সম্মতিক্রমে কলিকাতা মেডিকেল কলেজের সর্ব্বপ্রধান ডাক্তার কোট্‌স্ সাহেবকে একবার দেখান হয়। তিনি তাঁহার অবস্থা দেখিয়া চিকিৎসাতীত বলিয়া ব্যক্ত করেন।

যদিও এতগুলি ইংরাজী চিকিৎসক এবং কবিরাজ মহাশয়েরা তাঁহাকে দেখিলেন, কিন্তু রোগটী কি, তাহা প্রকৃতপক্ষে কেহ স্থির করিতে পারিলেন না। কেহ কণ্ঠরোগ বলিলেন, কেহ গণ্ডমালা এবং কেহ ক্যান্সার বলিয়া সাব্যস্থ করিলেন। মধ্যে মধ্যে ঐ অন্তর্ক্ষত শুষ্ক হইয়া স্ফোটকাকার ধারণ

করিত, তাহাতে তিনি অত্যন্ত ক্লেশ বোধ করিতেন। এমন কি কখন কখন এই স্ফোটক এত বিস্তীর্ণ হইত যে, তদ্দ্বারা শ্বাসক্লেশ উপস্থিত হইত। যতদিন উহা বিদীর্ণ হইয়া না যাইত,ততদিন আর কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারিতেন না। সে সময়ে আহার বন্ধ হইয়া যাইত। একপোয়া দুগ্ধ সেবন করাইলে এক ছটাক উদরস্থ হইত এবং অবশিষ্টাংশ বাহির হইয়া পড়িত। এমন সূত্রবৎ লাল নির্গত হইত যে, সে সময় কোন দ্রব্য ভক্ষণ করিতে পারিতেন না। কিয়দ্দিন পরে এই স্ফোটক বহির্দ্দিকে ফাটিয়া পূঁজ বহির্গত হইত। তাহাতে সাময়িক কিঞ্চিৎ সুস্থতা বোধ করিতেন বটে, কিন্তু রোগের বিক্রম কিছুই কমিত না। এই নিদারুণ রোগের যন্ত্রণা তিনি হাস্যাননে সহ্য করিতেন। একদিন বিমর্ষ অথবা চিন্তিত হন নাই। যখনই যে গিয়াছে, তাহারই সহিত ঐশ্বরিক বাক্যালাপ করিয়াছেন। লোকে ব্যাধির বিভীষিকা দেখাইলে, তিনি হাসিয়া উঠিতেন এবং বলিতেন, "দেহ জানে, দুঃখ জানে, মন তুমি আনন্দে থাক।" কোন কোন ব্যক্তির নিকট তিনি রোগের কথা কহিয়া চিন্তাকুল হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা তাঁহার মনোগত ভাব ছিল না।

শশধর তর্কচূড়ামণি পরমহংসদেবকে কতবার অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, সমাধির সময় ক্ষত স্থানে কিঞ্চিৎ লক্ষ্য করিলে তৎক্ষণাৎ উহা আরোগ্য হইয়া যাইবে। পরমহংসদেব সে কথা অগ্রাহ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "সমাধি করিয়া রোগ আরোগ্য করিতে হইবে? এ অতি রহস্যের কথা।"

পরমহংসদেব যৎকালে দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন, তিনি একদিন কহিয়াছিলেন যে, "আমি যখন যাইব, সেই সময়ে প্রেমভাণ্ড ভাঙ্গিয়া দিয়া চলিয়া যাইব।" এই কথা আমাদের শ্রবণ করা ছিল। ১৮৮৬ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখ উপস্থিত হইল। সে সময়ে তিনি অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ সুস্থ ছিলেন। ছুটীর দিন বলিয়া সে দিন ঐ উদ্যানে অনেক লোকের আগমন হইয়াছিল।

পূর্ব্ব সপ্তাহে তাঁহার কোন সেবক হরিশ মুস্তফীর পরিত্রাণের জন্য পরমহংসদেবের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সে দিবস তিনি কোন উত্তর দেন নাই। ১লা জানুয়ারির দিন হরিশ বাবু পরমহংসদেবের নিকটে গমন করিবামাত্র তাঁহাকে কৃতার্থ করেন। হরিশ আনন্দে উন্মত্তের

ন্যায় অশ্রুপূর্ণ লোচনে নিয়ে আসিয়া উপরোক্ত সেবককে কহিলেন, "ভাই রে! আমার আনন্দ যে ধরে না! এ কি ব্যাপার! জীবনে এমন ঘটনা একদিনও দেখি নাই।" সেবকের চক্ষেও জল আসিল। তিনি কহিলেন, "ভাই, প্রভুর অপূর্ব্ব মহিমা!"

সকল ভক্তগণ একত্রে বসিয়া আছেন,এমন সময়ে পরমহংসদেব দেবেন্দ্রকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। দেবেন্দ্র ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, "পরমহংসদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, রাম যে আমায় অবতার বলে, এ কথাটা তোমরা স্থির কর দেখি? কেশবকে তাহার শিষ্যেরা অবতার বলিত।" তিনি কেন যে এ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার কারণ কে বলিতে পারে? সে ক্ষেত্রে কেহ তাহার মীমাংসা করিতে পারেন নাই। অপরাহ্নকালে ভক্তেরা বাগানে বেড়াইতেছেন। এমন সময়ে দেখিলেন যে, পরমহংসদেব সেইদিকে আসিতেছেন। ভক্তেরা সকলে আগ্রহের সহিত তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সেইদিনকার রূপের কথা স্মরণ হইলে আমরা এখনও আশ্চর্য্য হইয়া থাকি। তাঁহার সর্ব্বশরীর বস্ত্রাবৃত এবং মস্তকে সবুজ বনাতের কাণ ঢাকা টুপি ছিল,কেবল মুখমণ্ডলের জ্যোতিতে দিঙ্মণ্ডল আলোকিত হইয়াছিল। মুখের যে অত শোভা হইতে পারে, তাহা কাহারও জ্ঞান ছিল না। সেই রূপ আর একদিন ইতিপূর্ব্বে নবগোপাল ঘোষের বাটীতে সঙ্কীর্ত্তনের সময় দেখা গিয়াছিল। নিকটে আসিয়া দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক কহিলেন, "আমি আর কি তোমাদের বলিব? আশীর্ব্বাদ করি, তোমাদের সকলের চৈতন্য হউক!" এই বলিতে বলিতে তাঁহার ভাবাবেশ হইল। ভক্তেরা পুষ্পচয়ন পূর্ব্বক, "জয় রামকৃষ্ণ!" বলিয়া তাঁহার চরণে অঞ্জলি প্রদান করিতে লাগিলেন এবং কেহ কেহ পুষ্পগুলি ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করায়, যেন পুষ্পবৃষ্টির ন্যায় দেখাইতে লাগিল। সকলেই আনন্দে পরিপূর্ণ হইলেন। পরমহংসদেব কিঞ্চিৎ ভাবাবসান করিয়া অক্ষয়কুমার সেনের বক্ষে হস্তার্পণ করিলেন। তাঁহার শরীর হইতে যেন প্রেমের বিদ্যুৎ সঞ্চালিত হইল। অক্ষয় বাবু বিভোর হইয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তৎপরে নবগোপাল ঘোষ, তাঁহার পর উপেন্দ্রনাথ মজুমদার, তাঁহার পর রামলাল চট্টোপাধ্যায়, তাঁহার পর অতুলকৃষ্ণ ঘোষ, তাঁহার পর গাঙ্গুলী ইত্যাদি কয়েক জনের পরিত্রাণ হইলে, হরমোহন মিত্রকে সম্মুখে আনয়ন করা হইল। তিনি হরমোহনকে স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "তোমার আজ থাক!"

(ইতিপূর্ব্বে হরমোহনের নিমিত্ত আর একবার পরমহংসদেবের নিকট কৃপা প্রার্থনা করা হইয়াছিল ; কিন্তু সেবারেও তিনি "এখন থাক" বলিয়াছিলেন।) এই বলিয়া তিনি গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন। ভক্তদিগের সে দিন আনন্দের আর অবধি ছিল না, কিন্তু হায়! কে জানিত যে, এই তাঁহার শেষ অভিনয়! কে জানিত যে, আর আমাদের প্রেমদাতা রামকৃষ্ণ প্রেম বিতরণ করিবেন না! তখন আমরা ছন্দাংশেও জানিতে পারি নাই, অথবা একথা মনে উদয় নাই যে, এই সেই পূর্ব্বকথিত প্রেমভাণ্ড ভঙ্গ করিবার দিন আসিল! তখনও আমরা আভাসেও জানিতে পারি নাই যে,পরমহংসদেব লীলা-রহস্য পরিসমাপ্ত করিয়া আনিলেন। মনের কত আশা, কত ভরসা, কত হবে, কত দেখ্‌বো, সে সকল যে এক কথায় সম্পূর্ণ করিয়া দিবেন, তাহা কেহ আমরা স্বপ্নেও দেখিতে পাই নাই, কখন কল্পনায়ও ভাবি নাই। আমরা আনন্দ করিয়া লইলাম, আমাদের স্বার্থ চরিতার্থ হইল, শান্তি আসিয়া সকলকে অধিকার করিল, সে দিনকার রঙ্গ ভূমির যবনিকা পড়িয়া গেল।

তাহার পর আর তাঁহাকে সেরূপ অবস্থায় দেখা যায় নাই, রোগের ক্রম ক্রমাগত বৃদ্ধিই হইতে লাগিল। কথিত হইয়াছে যে, আহার কমিয়া গিয়াছিল ; সুতরাং ক্রমশঃ দেহের মাংস বসা শোষিত হইয়া কেবল চর্ম্মাচ্ছাদিত অস্থি-ক'খানি অবশিষ্ট ছিল মাত্র। এক এক দিনের শোণিত স্রাবের কথা মনে হইলে অদ্যাপি অঙ্গ শিহরিয়া উঠে। এত শোণিত বহির্গত হইত, কিন্তু তথাপি সে সময়ে তিনি কখন বিমর্ষযুক্ত হইতেন না, বরং কত রহস্য করিতেন।

এই সময়ে পূর্ব্বোল্লিখিত সন্ন্যাসী ভক্তদিগের মধ্যে রাখাল, যোগেন, শশী, বাবুরাম, লাটু, শরৎ এবং গোপাল প্রভৃতি কয়েক জন সেবাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। সকলেই প্রাণপণে সেবা করিয়াছেন। তাহার বিরুদ্ধে কে কহিবে? তাঁহাদের সেবাই ধ্যান, সেবাই জ্ঞান, মন প্রাণ যেন সেবাতেই নিমগ্ন ছিল। তাঁহারা সংসার-সুখ একদিকে কাকবিষ্ঠাবৎ জ্ঞান করিয়া, অপরদিকে প্রভুর সেবাই সংসারের একমাত্র কর্ত্তব্য মনে করিয়া আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু শশীর সেবা তুলনারহিত এবং অনুকরণীয়। যদ্যপি সেবা বলিয়া সংসারে কোন কথা থাকে, তাহা হইলে শশীই তাহা জনিত। যদ্যপি কাহাকেও সেবাত বলিয়া কহা যায়, তাহা হইলে

শশীকেই সর্ব্বাগ্রগণ্য বলিয়া কহা যাইবে। যদ্যপি অহেতুকী ভক্তি কেহ দেখিতে চাহেন, তাহা হইলে তিনি শশীকে তাহার আদর্শ দেখিবেন। শশীর গুণই সব, দোষ নাই। তবে মনুষ্য নির্দ্দোষী হইতে পারে না, এইটী প্রবাদ আছে। শশী, বিনা বিচারে, বিনা বাক্‌বিতণ্ডায়, স্বার্থপক্ষে দৃষ্টি না রাখিয়া, একমনে পরমহংসদেবের সেবা করিত। ইহাকে যদ্যপি দোষ কহা যায়, এইটী তাহার দোষ ছিল। হনুমানের দাস্য-ভক্তি আমরা শ্রবণ করিয়াছি; শশী দাস্য ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে। অমন ভক্তচূড়ামণি আমরা পরমহংসদেবের একটী ভক্তকেও দেখি নাই। একথা আমরা অতিরঞ্জিত করিয়া বলিতেছি না। যে কেহ পরমহংসদেবের নিকট গিয়াছেন, সকলেই একটা স্বার্থের সম্বন্ধ রাখিয়াছিলেন। কিসে পরিত্রাণ হইব, কিসে সাধন ভজন হইবে, কিসে যোগমার্গে পরিভ্রমণ করিতে সক্ষম হইব, এইরূপ একটা না একটা ভাব সকলেরই ছিল। শশীর সে সকল কিছুই ছিল না। সে আত্ম-নিবেদন করিয়া নিষ্কাম ধর্ম্ম প্রভুসেবা করিতে শিখিয়াছিল; তাহা জীবনে সাধন করিয়া নিজে কৃতার্থ হইয়াছে এবং যে কেহ শশীর এই দাস্যভক্তির উপাখ্যান শ্রবণ করিবে, তাহারও সেই ভক্তি লাভ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। শশী! তুই ভাই ধন্য! তুই যথার্থ সেবা শিক্ষা করিয়াছিলি! পৃথিবীর সারধর্ম্ম—সারাৎসার কর্ম্ম—গুরুসেবা! যদি দেখিবার কিছু থাকে, তাহা শ্রীগুরুর শ্রীপাদপদ্ম! যদ্যপি করিবার কিছু থকে, তাহা শ্রীগুরুর শ্রীচরণ বন্দনা, এবং যদ্যপি শ্রবণ করিবার কিছু থাকে, তাহা শ্রীগুরুর গুণ-গাথা! শশী! তুই তা করিয়াছিস্! প্রাণ ভরিয়া, আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া করিয়াছিস্! কখন মনে হয়, তুই বুঝি জন্মান্তরে সেবা করিবি বলিয়া পঞ্চ-তপা করিয়াছিলি, অথবা গলা কাটিয়া শোণিত দান করিয়াছিলি, তাই প্রভু তোর জন্য উৎকট ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া সেবা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত তোর নিকট জড়বৎ শয়ন করিয়াছিলেন। তুই ভাই মানব দেহ ধারণ করিয়া প্রকৃত কর্ত্তব্য কর্ম্ম বুঝিয়াছিলি, তুই সেই নিমিত্ত প্রভুর বিশেষ কৃপাপাত্র। তাঁহার দয়াতে তুই আজ সেবক-মণ্ডলীর শিরোমণি। প্রভু যেমন আমাদের গুরু—গুরু বলিয়া মনে স্পর্দ্ধা হয়, তেমনি তুই তাঁহার সেবক। পরিচয় দিবার যোগ্য পাত্র, তুই অদ্বিতীয়।

মাতা ঠাকুরাণী যদিও নিকটে ছিলেন, কিন্তু সেবার জন্য তাঁহাকে ব্যস্ত হইতে হইত না। শশী সকল দিকে দৃষ্টি রাখিত। অন্যান্য সন্ন্যাসীভক্তেরা পরমহংসদেবের সেবায় আত্ম-বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের

জপ-তপ করিবার বড় বাসনা হইয়াছিল। কখন কৌপীন পরিয়া চিম্‌টে লইয়া গাত্রে ভস্ম মাখিয়া সন্ন্যাসী সাজিতেন, কখন ধুনি জ্বালাইয়া অগ্নির উত্তাপ সম্ভোগ করিতেন, কখন উপবাসাদি নিয়ম করিয়া দিন যাপন করিতেন। শশীর এ সকল কিছুই ছিল না।

পরমহংসদেব নাকি কয়েকটী সন্ন্যাসী ভক্তকে ভিক্ষা করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন, তাঁহারা সেইজন্য মধ্যে মধ্যে ভিক্ষা করিতে যাইতেন। তিনি সন্ন্যাসী ভক্তদিগের কথা গৃহী ভক্তদিগকে বলিতেন না এবং গৃহী ভক্তদিগের কথা সন্ন্যাসীদিগকে বলিতেন না। কিন্তু কখন কখন উভয় পক্ষের নিকট উভয় পক্ষের দোষ বলিয়া দিতেন। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে শাসন করিতেন। এইরূপে এই উভয় শ্রেণীদিগের মধ্যে কিঞ্চিৎ বৈরীভাব ছিল।

এই কাশীপুরের উদ্যানে পরমহংসদেব আট মাস অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তথাকার যাবতীয় ব্যয় গৃহী ভক্তেরা সরবরাহ করিতেন।

পরমহংসদেবের অবস্থা দিন দিন পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। যখন আহার কমিয়া গেল, যখন উত্থানশক্তি রহিত হইল, যখন একেবারে স্বরভঙ্গ হইয়া গেল, তখন অনেকেই হতাশ হইয়া পড়িলেন। অনেকেই মনে করিলেন যে, আর রক্ষা নাই। চেষ্টার ক্রটী কিছুই হইল না, ডাক্তারি, কবিরাজি, অবধৌত, টোট্‌কা প্রভৃতি সকলেরই সাহায্য লওয়া হইয়াছিল, কিন্তু কিছুই হইল না। কোন কোন ভক্ত স্ত্রীলোক তারকনাথের সোমবার করিতেন এবং নারায়ণের চরণে তুলসী দিতেন, কোন ভক্ত তারকনাথের চরণামৃত ও বিল্বপত্রাদি আনাইয়া ধারণ করাইলেন এবং কেহ হত্যা দিয়াছিলেন, কিন্তু সকলই বিফল হইয়া গল, সুতরাং সকলের আশা ভরসা আর কিরূপে থাকিতে পারিবে? পরমহংদেবের নিকট কতবার ভক্তেরা কাঁদিয়া বলিয়াছিলেন যে, "আপনি নিজে না আরোগ্য হইলে, কেহ ব্যাধির শান্তিবিধান করিতে পারিবে না।" তিনি হাসিয়া কহিয়াছিলেন, "শরীরটা কাগজের খাঁচা, আর গলায় একটা ছিদ্র হইয়াছে দেখিতে পাই। ইহার জন্য আবার করিব কি?" এইরূপে সকল কথা উড়াইয়া দিতেন। ক্রমে শ্রাবণ মাস অতীতপ্রায় হইল। ৩১শে শ্রাবণ পূর্ণিমা রবিবার। প্রাতঃকালে তিনি কোন ভক্তকে ডাকাইয়া পঞ্জিকা দেখিতে কহিলেন। ৩১শে শ্রাবণের সকল বিবরণ শ্রবণ করিয়া যেই ১লা ভাদ্র মাসটী তাঁহার কর্ণগোচর হইল, অমনি তাহাকে চুপ করিতে কহিলেন।

সেইদিন কেমন একরকম হইয়া উঠিয়াছিলেন। অপরাহ্নের কিঞ্চিৎ পরে নবীন পাল ডাক্তার পুনরায় উপস্থিত হইলেন। পরমহংসদেব কহিলেন, “আজ আমার বড় ক্লেশ হইতেছে, দুইটী পার্শ্ব যেন জ্বলিয়া উঠিতেছে।” এই বলিয়া হস্ত প্রসারণ করিয়া দিলেন। নাড়ী দেখিয়া ডাক্তারের চক্ষু স্থির হইল। পরমহংসদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, “উপায় কি?” ডাক্তার কি বলিবেন ভাবিয়া অজ্ঞান হইলেন, কোন উত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না। পরমহংসদেব পুনরায় কহিলেন, “কিছুতেই কিছু হইতেছে না। রোগ দুঃসাধ্য হইয়াছে?” ডাক্তার, “তাই ত,” বলিয়া অধোবদন হইলেন। পরমহংসদেব দেবেন্দ্রকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক তুড়ি দিয়া কহিলেন, “এরা এতদিন পরে বলে কি? রোগ আরোগ্য হইবে বলিয়া আমায় চিকিৎসা করাইতে আনিয়াছে। যদি রোগই না সারে, তবে বৃথা কেন এ যন্ত্রণা?” তিনি রোগের কথা কিম্বা ডাক্তারের কথা আর মুখে আনিলেন না। অতঃপর তিনি কহিতে লাগিলেন, “দেখ, আমার হাঁড়ি হাঁড়ি ডাল ভাত খাইতে ইচ্ছা হইতেছে।” দেবেন্দ্র ছেলে ভুলাইবার মত কত কি বলিল, কিন্তু তাঁকে ভুলাবে কে?

সে রাত্রে সুজি ও দুগ্ধ অপর দিনের অপেক্ষা সহজে গলাধঃকরণ করিতে পারিয়াছিলেন এবং সুখে প্রায় রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত নিদ্রিত ছিলেন। ১টার পূর্ব্বে উঠিয়া বসিলেন এবং সুজি ভক্ষণ করিলেন। সুজি ভক্ষণান্তর, ১টা ৬ মিনিটের সময় তিনি সহসা সমাধিস্থ হইয়া যাইলেন। ভক্তদিগের প্রাণ পূর্ব্ব হইতে কেমন বিকৃত হইয়াছিল। তাঁহার সমাধিস্থ হওয়ায় সকলেরই আতঙ্ক হইল। তাঁহাদের প্রাণ হু হু করিতে লাগিল এবং যেন সে গৃহ শূন্য বোধ হইল।

অমন পূর্ণিমার রাত্রি, বিশেষতঃ সেইদিন পাইকপাড়ার কাশিপুরের ঠাকুর-বাড়ী হইতে কাঙ্গালী বিদায় হইতেছিল, তজ্জন্য ঐ স্থান দিয়া সমস্ত রাত্রি লোকজন যাতায়াত করিতেছিল, কিন্তু ভক্তদিগের হতাশ-বিভীষিকা আসিতে লাগিল। তাঁহারা নিশ্চয় মহা-সমাধি বলিয়া জ্ঞান করিলেন। সে রাত্রে আকাশে নানাবিধ পরিবর্ত্তন ও চন্দ্রমণ্ডল দেখা গিয়াছিল। এই বিষম সমাচার রজনীযোগেই অধিকাংশ স্থানে প্রেরিত হইয়াছিল এবং সেবকগণ সকলেই তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

এদিকে কাল রাত্র বিদায় হইল। ১লা ভাদ্রের প্রাতঃ সমীরণ রামকৃষ্ণদেব মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন, এই বার্ত্তা ঘরে ঘরে কাণে কাণে প্রদান করিল। যে সংবাদ কেহ প্রত্যাশা করেন নাই, যে সংবাদ পাইবার জন্য কেহ প্রস্তুত

ছিলেন না, আজ সেই অভাবনীয়, অচিন্তনীয় সংবাদ আসিয়া উপস্থিত হইল। হায় রে! এ ত সংবাদ নহে, এ যে বজ্রাঘাত, বজ্রাঘাত অপেক্ষাও কঠিন। বজ্রাঘাতে প্রাণ যায়, তাহাতে যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় না; এর আঘাত বজ্রের ন্যায়, কিন্তু প্রাণ বহির্গত না হওয়ায় যন্ত্রণার বিরাম হয় না। যেমন তাঁহার সহিত নিত্য নব আনন্দ সম্ভোগ হইয়াছিল, এখন তেমনি নব নব বিরহ-জ্বালা সমুত্থিত হইয়া দেহ দাহ করিতে লাগিল। যখনই মনে হয় যে, তিনি আর নাই, আর তাঁহার আদরপূর্ণ অমিয়বৎ কথা শুনিতে পাইব না, নিকটে যাইলে আর তিনি তেমন করিয়া বসিতে বলিবেন না, বিষয়সন্তাপে উত্তপ্ত হইয়া যাইলে আর তিনি শান্তি-বারি প্রদান করিবেন না, আর তিনি আমাদের লইয়া সংকীর্ত্তনে মাতিবেন না, আর তাঁহার অপূর্ব্ব নৃত্য দেখিতে পাইব না, আর তাঁহার বদন-বিনিঃসৃত হরিনামধ্বনি শুনিতে পাইব না, তখনই হৃদয়নিহিত দারুণ বহ্নিজ্বালা আরও প্রবল প্রতাপে জ্বলিয়া উঠে! হায় হায়! আমাদের কি হইল! কেন এমন সর্ব্বনাশ হইল! আর কাহার কাছে যাইব, কোথায় গিয়া প্রাণ শীতল করিব? এই উনবিংশ শতাব্দীর হিল্লোলে পড়িয়া পথহারা হইয়া যাঁহার চরণকৃপায় স্থির হইতে পারিয়াছিলাম, আজ তিনি কোথায়? আমাদের অকূলে ফেলিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন? কুলবালারা—যাহাদের কখন চন্দ্র সূর্য্য দেখিতে পায় নাই, তাহারা পর্য্যন্ত কুলের মস্তকে পদাঘাত করিয়া জন্মের মত সেই রামকৃষ্ণমূর্ত্তি দর্শনের জন্য রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইল! আর ভয় নাই, আর লজ্জা নাই, এখন কুলমানে যেন জলাঞ্জলি দিয়া রামকৃষ্ণ গুণসাগরে লম্ফ প্রদান করিল। কোন সেবিকা, প্রভুকে শেষ দেখা দেখিয়া আসিবার জন্য তাঁহার স্বামীর অনুমতি চাহিয়াছিলেন। তাঁহার স্বামী কোন উত্তর করিতে পারেন নাই। কি বলিবেন? একদিন যে সহধর্ম্মিণীকে, স্বামী যাহা স্ত্রীকে কদাপি প্রদান করিতে সমর্থ হয় না, এমন অমূল্য রত্ন, রত্নের বিনিময়ে যে রত্ন লাভ হয় না, হইবার নহে, তাহাও দিয়াছিলেন, অদ্য তাঁহাকে কি দেখাইতে লইয়া যাইবেন? এই ভাবিয়া উত্তর দিলেন না। আর যদিই তাঁহাকে দেখিবার সাধ হইয়া থাকে, এ জন্মে ত আর সে রূপ দেখিতে পাইবে না, আজ সেই রূপ চিরদিনের জন্য পঞ্চীকৃত করা হইবে, কিন্তু যাইলেও ত দেখিতে পাইবে না, ভক্তেরা তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিয়া আছে, এই ভাবিয়া নিরুত্তর ছিলেন। যাহার প্রাণ উচাটন হয়, যাহার প্রাণ যে কার্য্যে ধাবিত হয়,

মন কি তাহার গতিরোধ করিতে পারে? সেবিকা শুনিল না—সে যথা-সময়ে আপনি যাইয়া উপস্থিত হইল।

নেপাল রাজ-প্রতিনিধি বিশ্বনাথ উপাধ্যায় এই হৃদয়ভেদী সংবাদ প্রাপ্ত হইবামাত্র প্রাতঃকালেই তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন যে, যদিও তাঁহার সর্ব্বশরীর কণ্টকিত ও কঠিন হইয়াছে এবং চক্ষু স্থির হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত তাঁহার মেরুদণ্ড উষ্ণ রহিয়াছে। তিনি এই লক্ষণ দ্বারা মহা-সমাধি বা মৃত্যু কহিলেন না। তাঁহার এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক ডাক্তার সরকারকে আহ্বান করা হইয়াছিল। তিনি আসিয়া মৃত্যু স্থির করিলেন। এক্ষণে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল। ভক্তেরা তখন দিশেহারা পথিকের ন্যায় দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানবিবর্জ্জিত বাতুলপ্রায়, তাঁহারা এই ভব-জলধির মধ্যস্থলে দেহ-তরীর কর্ণধারবিহীন হইয়া স্রোতের আকর্ষণে ইতস্ততঃ বিঘূর্ণিত হইতেছিলেন, তাঁহাদের জীবন মরণের একমাত্র সহায়, সম্পত্তি, সম্বল, জ্ঞান, বুদ্ধি, বল, গুরু, শাস্ত্র, বন্ধুর অভাব জন্য কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়প্রায় হইয়াছিলেন, তাঁহাদের হৃদয়ের পূর্ণ শশধর সহসা কালমেঘাবৃত হইয়া সর্ব্বতোভাবে তমসাচ্ছন্ন করিয়াছিল, সুতরাং তাঁহাদের দ্বারা এ গুরুতর বিষয় মীমাংসা হওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিল। এমন কি, অনেকে তাঁহাকে কি দেখিব, কেমন করিয়া দেখিব ভাবিয়া নিকটে যাইতে পারিলেন না। তাঁহারা এই বিপদকাহিনী সাধারণকে বিজ্ঞাপন করিলেন। যেখানে যে কেহ ছিলেন, সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। লোকে লোকারণ্য হইল। তৎকালে কয়েকটী সন্ন্যাসী আসিয়াছিলেন, তাঁহারা পরমহংসদেবের মহা-সমাধি সাব্যস্থ করিয়া যান। তাঁহাদের কথাই বিশেষ প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করা হইলেও দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা হইয়াছিল।

পরদিন পাঁচ ঘটিকার সময় দ্বিতল গৃহ হইতে মহা-সমাধিস্থ মহাপুরুষের শরীর বাহিরে আনয়ন পূর্ব্বক এক বিস্তীর্ণ পর্য্যঙ্কোপরে উপবেশন করাইয়া আর্দ্র বস্ত্রে অঙ্গ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হইল। তদনন্তর পীতাম্বর পরিধান করাইয়া শ্বেত চন্দন দ্বারা সর্ব্ব শরীর আবৃত করা হইল। শরীর অসুস্থ ছিল বলিয়া আজ বর্ষাধিক কাল চন্দন দেওয়া হয় নাই, অদ্য মনের সাধে জন্মের মত চন্দন পরান হইল। গলদেশে ফুলের মালা, মস্তকে ফুলের চূড়া, কটিদেশে ফুলের বেড়া, চরণে ফুলের নূপুর! প্রভু আমার আজ যেন ফুল শয্যায় শয়ন করিয়াছেন! পালঙ্কখানি ফুলের মালায় সুশোভিত করিলে, ভক্তমণ্ডলী

সহ ফটোগ্রাফ্ লওয়া হইল। প্রভুর সে দিনের শোভা কত হইয়াছিল, তাহা যিনি দেখিয়াছেন, তিনি তাহার পক্ষপাতী হইয়াছেন। এমন সময় ভক্তবীর সুরেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বাটী হইতে পুষ্প ও বিল্বপত্র লইয়া গিয়াছিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি সরোদনে কহিলেন, "গুরুদেব! আজ আপনাকে এই অবস্থায় দেখিতে হইল! আর বলিব কি? সকল আশা ভরসা আপনার সহিত বুঝি শেষ হইল! এ পাপিষ্ঠের এই শেষ পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করুন" বলিয়া তাঁহার চরণে পুষ্প বিল্বপত্রাদি প্রদান করিলেন।

বেলা ছয়টার পর মৃদঙ্গ করতাল সহকারে হরিনাম সংকীর্ত্তন পূর্ব্বক তাঁহাকে জাহ্নবীতটে আনা হইল। পথিমধ্যে হাহাকার রবে চতুর্দ্দিক প্রতি-ধ্বনিত হইতেছিল। এই সময় বৃষ্টিধারা পতিত হওয়ায় অনুমান হইয়াছিল যেন, যাহাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া রামকৃষ্ণদেব পতিতপাবনরূপে জন্মিয়া-ছিলেন, তাঁহার অকালে দেহত্যাগে সেই অগতিদিগের গতি হইবে না ভাবিয়া স্বর্গের দেবদেবীগণ নয়নধারা দ্বারা তাঁহাদের মনোদুঃখ জানাইতেছিলেন।

সন্ধ্যার পূর্ব্বাহ্নে চিতা প্রস্তুত হয় এবং রামকৃষ্ণের দেহ তদুপরি সংস্থাপন পূর্ব্বক অগ্নি সংস্কার করা হইয়াছিল। ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল সেই ক্ষেত্রে তৎকালোপযুক্ত গান করিয়াছিলেন। এক ঘণ্টার মধ্যে চিতা সকার্য্য সাধন করিয়া লইল। যখন চিতানল পূর্ণ প্রভাবে জ্বলিতেছিল, সেই সময় ঠিক চিতার উপর পুষ্পবৃষ্টি হইয়াছিল। এক ঘণ্টার মধ্যে রামকৃষ্ণমূর্ত্তি পঞ্চীকৃত করিয়া তাঁহার চিতাবশিষ্ট অস্থিপুঞ্জ একটী তাম্রের পাত্রে রক্ষা পূর্ব্বক কাশি-পুরের ঘাটে অবগাহনাদি কার্য্য সমাধা করিবার নিমিত্ত সকল ভক্তেরা শূন্য মনে ও শূন্যপ্রাণে সমাগত হইতে লাগিলেন। পথিমধ্যে এক অভাবনীয় বিভ্রাট উপস্থিত হইল। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামক ভক্তটীর পায়ে কাল-ভুজঙ্গ দংশন করিল। সর্পাঘাতে উপেন বসিয়া পড়িল। তাহার পায়ের উপরি-ভাগে বন্ধন দেওয়া হইল এবং ক্ষত স্থানটী উত্তপ্ত লৌহ শলাকা দ্বারা দগ্ধ করান হইল; প্রভুর মহিমায় উপেনের আর কোন ক্লেশ হয় নাই। সেই ক্ষত স্থানটী প্রায় ৪।৫ মাস নীলবর্ণ ও স্ফীত হইয়াছিল।

রামকৃষ্ণের লীলা ফুরাইল। যাঁহাকে লইয়া আমরা গত কয়েক বৎসর হইতে আনন্দ-রঙ্গভূমির অভিনয় করিতেছিলাম, আজ তাহার যবনিকা পতিত হইল। আমাদের ন্যায় পাপীদিগের সহবাস কি পুণ্যময়ের অধিক দিন ভাল

লাগে ? যাহাদের সহবাস সহোদরও কামনা করিয়া পরিত্যাগ করে, সে সহবাস তিনি বলিয়া এত দিন করিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং আমরা তাঁহাকে কৌশল করিয়া তাড়াইয়া দিলাম। সমুদ্র-মন্থনের হলাহল শিব পান করিয়া আপনি নীলকণ্ঠ হইয়াছিলেন। পরমহংসদেবও আমাদের পাপ-বিষ ধারণ করিয়া সেই বিষের অসহ্য জ্বালা আপনি সহ্য করিলেন। পরে যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহা দ্বারা তাঁহার দেহ ভস্মীভূত করিয়া নিরস্ত হইলাম। কর্ম্ম-ভিন্ন কর্ম্ম সূত্র কাটে না। পাপের প্রায়শ্চিত্ত চাই। কিন্তু এতগুলো জুয়াচোর লম্পট, বিশ্বাসঘাতক, বিনা সাধনে, বিনা কর্ম্মে, পরিত্রাণ পাইল কি রূপে ? তিনি বার বার বলিয়াছেন যে, তোমাদের সকলের পাপ ভার গ্রহণ করিয়া আমি অসুস্থতা ভোগ করিতেছি। হায় প্রভু ! আমরা না বুঝিয়া পাপের ভার দিয়াছি। আমরা যদি জানিতাম যে, আমাদের জন্য আপনি এত ক্লেশ পাইবেন, তাহা হইলে হয় ত আনন্দের সহিত সে দুঃখ আমরা সহ্য করিতাম। কিন্তু আমরা স্বার্থপর, একথা পূর্ব্বে স্বকর্ণে শুনিয়াও তখন চেতন হয় নাই, তখন উহা প্রভুর রহস্য বলিয়াই জ্ঞান ছিল। যে দিন রাত্রে অ্যাসেটিক অ্যাসিড সেবন করিয়া শোণিত বমন করিয়া আমাদের গ্রীবা ধারণ পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, "এত রক্ত বাহির হইতেছে, তথাপি প্রাণ যাইতেছে না কেন ?" আমরা পাষণ্ড বর্ব্বর, স্বচ্ছন্দে কহিয়াছিলাম, "যাওয়া উচিত ছিল।" এখন সে রহস্য কোথায় ? এখন সেই কথা স্মরণ হইয়া আপনার শিরোদেশে আপনি করাঘাত করিতেছি। এখন মনে হইতেছে যে, কি সর্ব্বনাশই করিয়াছি ! কেন তখন গর্দ্দভের ন্যায় অমন বুদ্ধি হইয়াছিল। আরে পামর মন ! তোর কথা শুনে এমন বিষাদের দিনও হাসি পায়। তুই গর্দ্দভ ব্যতীত মনুষ্য ছিলি কবে ? প্রভুর চরণধূলিস্পর্শে মনুষ্যপদবাচ্য হইতে পারিয়াছিস্, এখন কি সে কথা মনে নাই ?

রামকৃষ্ণ বিসর্জ্জন দিয়া কেহ পুতনীরে অবগাহন করিলেন এবং কেহ আপনাকে পবিত্র জ্ঞানে কাশীপুরের উদ্যানে অস্থিপূর্ণ পাত্রটী রাখিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিলেন।

অস্থিপুঞ্জ সপ্তাহ কাল কাশীপুরের উদ্যানে রহিল। প্রত্যহ রীতিমত পূজা ও ভোগরাগাদি হইত। জন্মাষ্টমীর দিন অস্থিগুলি কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যানে যথানিয়মে সমাহিত হইয়া তিরোভাব-মহোৎসব কার্য্য মহা সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। তদবধি এই স্থানে নিত্য জার ব্যবস্থা

হইয়াছে। প্রতি বৎসর এই স্থানে দুইটী মহোৎসব হইয়া থাকে। কালী পূজার দিন পরমহংসদেব যেরূপে পূজা করাইয়াছিলেন, অবিকল সেইরূপে তাঁহার পূজা করা হয় এবং তিরোভাব উপলক্ষে জন্মাষ্টমীর পূর্ব্ব এক সপ্তাহ বিশেষ ভোগরাগ এবং সঙ্কীর্ত্তনাদি হইয়া শেষ দিনে নগর কীর্ত্তনাদি হইয়া তাঁহার শেষ দিনের আজ্ঞা, "হাঁড়ি হাঁড়ি ডাল ভাত" ভোগ দেওয়া হয় এবং তাহা উপস্থিত, নিমন্ত্রিত এবং অভ্যাগত ব্যক্তিদিগকে বিতরণ করা হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত শুক্লপক্ষীয় ফাল্গুনী দ্বিতীয়া, বিজয়া, ১লা জানুয়ারী এবং বৈশাখী পূর্ণিমা, এই দিবসচতুষ্টয় তথায় পর্ব্বদিন বলিয়া পরিগণিত করা যায়।

পরিশিষ্ট

—*—

পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্তের এক প্রকার সংক্ষেপে আভাস দেওয়া হইল। তাঁহার এক্কদিনের কাণ্ডকলাপ সুচারুরূপে লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলে, এই গ্রন্থ অপেক্ষা সুবৃহৎ একখানি গ্রন্থতেও সম্পূর্ণ ভাবে তাহা প্রকাশ করা যাইতে পারে কি না, সন্দেহের বিষয়। তাঁহার ইতিবৃত্ত অতিশয় কঠিন, পাঠকের অনেকেই তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। তিনি কোথায় পল্লীগ্রামে সামান্য দরিদ্র ব্রাহ্মণপরিবারে জন্মগ্রহণ করিলেন, লেখা পড়া (যাহা দ্বারা মনুষ্যদিগকে উন্নত এবং বহুদর্শী করিয়া থাকে) যে প্রকার শিক্ষা করিয়াছিলেন, সে প্রকার পাণ্ডিত্যে বাস্তবিক জ্ঞানী হওয়া যায় না এবং রাসমণির দেবালয়ে সাত টাকা বেতনের চাকরী করায় তাহার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু এই অবস্থাপন্ন হইয়াও তাঁহার ভিতরে ভিতরে যে ধর্ম্মভাব ছিল, তাহার দ্বারা বাল্যকালে তিনি সমাদৃত এবং যুবা ও প্রৌঢ়াবস্থায় সাধারণের নিকট ভক্তিভাজন হইয়াছেন।

এক্ষণে কথা হইতেছে যে, বিবিধ বিজ্ঞানশাস্ত্রাদি শিক্ষা করিয়া জ্ঞানী হওয়াই যে ধর্ম্মোপার্জ্জন এবং জীবন গঠন করিবার একমাত্র উপায় এবং পারলৌকিক পুণ্যধামে যাইবার রাজপথবিশেষ, তাহা পরমহংসদেবের জীবনী পর্য্যালোচনা করিয়া বিষম সন্দেহের স্থল হইয়া দাঁড়াইতেছে। যগুপি এ কথা বলা হয় যে, শুনিয়া শিক্ষা হইতে পারে এবং ইহাও প্রকাশ আছে যে, তিনি প্রত্যেক সাধন ভজন গুরুকরণ দ্বারা কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তখন আশ্চর্য্যের বিষয় কি? গুরুকরণ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রত্যেক ভাব আপনা আপনি উপস্থিত হইত এবং তিনি আপনি সমাধা করিয়া লইতেন; গুরু কেবল নিমিত্তমাত্র থাকিতেন। ভাল, তাহা স্বীকার করিলেও, আর একটী আপত্তি আসিতেছে। যে সকল সাধন-ভজনে পৃথিবীর সৃষ্টিকাল হইতে অদ্যাবধি একজনে নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে সিদ্ধ হইতে পারে নাই, তিনি কেমন করিয়া তাহাতে তিন দিনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন? একটী দুইটী নহে, সংখ্যাতীত। উপযুক্ত সিদ্ধ গুরু পাইলে কার্য্যবিশেষের সুবিধা হয় বটে, কিন্তু এ প্রকার দৃষ্টান্ত, আমরা যতদূর জানি, আর নাই। তাঁহার মস্তিষ্ক

সাধারণের ন্যায় ছিল না; তাহা অসাধারণ বলিতে হইবে। তাঁহার সহিত চলিত কথা কহিতে পণ্ডিত, জ্ঞানী, কর্ম্মী, কেহই পারিতেন না। তাঁহার প্রত্যেক কথা গভীরতম ভাবে পরিপূর্ণ থাকিত। যখন যে প্রকার লোক তাঁহার নিকট যাইত, তিনি তাহারই মত কথা কহিতেন। আবার যখন বহু ভাবের ব্যক্তি একত্র মিলিত হইত, তখন এক কথায় সকলের মনোসাধ পূর্ণ করিতেন।

আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাই যে, কেহ কিঞ্চিৎ ভক্তিতত্ত্ব অথবা জ্ঞান-পন্থার কণাবিশেষ লাভ করিয়া আস্ফালনের ইয়ত্তা রাখেন না। আজ এ স্থানে বক্তৃতা, কাল ওস্থানে শাস্ত্র ব্যাখ্যা, পরশ্ব শিষ্য বৃদ্ধি, তৎপরদিন তাহাদিগকে নিজ চিহ্নিত ভেক ধারণ করাইয়া নাম বাহির করিতে প্রাণপণে চেষ্টা পাইয়া থাকেন। কিসে সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা তাঁহার দুটো সুখ্যাতি করিবেন, কিসে ছাপার কাগজে তাঁহার নাম উঠিবে, এই কামনায় সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকেন। পরমহংসদেবের সে ভাব একেবারেই ছিল না। তাঁহার সে ভাব থাকিলে অদ্য এ প্রদেশে একটা হুলস্থুল পড়িয়া যাইত। পাছে লোকে তাঁহাকে জানিতে পারে, এই জন্য তিনি অতি দীনভাবে দিন যাপন করিতেন। তাঁহার কার্য্যকলাপ দেখিয়া নিকটের ব্যক্তিরাই ভ্রমে পতিত হইত, অপরে বুঝিবে কি? লোকে কখন ভক্তির কার্য্য দেখিত, আবার কখন তাহার বিপরীত ভাব দেখিয়া মনের ভিতর নানা প্রকার সন্দেহ আনিয়া উপস্থিত করিত। পাছে তাঁহাকে কেহ চিনিতে পারে, তজ্জন্য তিনি কোন প্রকার ভেকের লক্ষণ ধারণ করিতেন না। এমন সামান্য ভাবে থাকিতেন যে, লোকে তাঁহাকে একজন ভদ্রলোক বলিয়াও বুঝিতে পারিতেন না। একদিন তিনি গঙ্গাতীরে বেড়াইতেছিলেন, একজন কলিকাতার ডাক্তার দক্ষিণেশ্বরে রোগী দেখিতে গিয়া রাসমণির ঠাকুরবাটী দর্শনাভিলাষে সেই সময়ে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি পরমহংসদেবকে বাগানের মালী মনে করিয়া জুঁই ফুল তুলিয়া দিতে হুকুম করিয়াছিলেন। পরমহংসদেব তৎক্ষণাৎ তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়াছিলেন। এই ডাক্তারটী তাঁহার ব্যাধির সময় দেখিতে যাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! আমি করিয়াছিলাম কি! এঁকেই ত ফুল তুলিয়া দিতে বলিয়াছিলাম!"

অভিমান নাশ করিবার নিমিত্ত যে সাধন করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি নিশ্চয় সিদ্ধ হইয়াছিলেন। তাহা না হইলে ডাক্তারের আজ্ঞা পালন করিতে

পারিতেন না। তাঁহার জীবনে আরও এমন অনেক ঘটনা হইয়া গিয়াছে, যাহাতে পূর্ণ অভিমানশূন্য ভাব দেখা গিয়াছে। একদা তাঁহার মনে হইয়াছিল যে, বোধ হয় কামাদি রিপুগণ গিয়াছে, আর ভয় নাই। তিনি তখন বকুলতলার ঘাটে বসিয়াছিলেন। এই কথা মনে হইবামাত্র তাঁহার মনের ভিতর পূর্ণভাবে কামবৃত্তির উদ্দীপন হইয়া যাইল। তিনি বলিতেন যে, "সে সময়ে যগুপি প্রৌঢ়া কিম্বা বৃদ্ধা স্ত্রীলোক সেই পথে গমন করিত, তাহা হইলে আমার ধৈর্য্যচ্যুতি হইত কি না, বলিতে পারি না।" তিনি তন্নিমিত্ত বলিতেন, "কোন বিষয়ে কাহারও অভিমান করিবার অধিকার নাই। অদ্য যাহা আছে, কল্য তাহা না থাকিতে পারে। কখন কাহার মনে কি হয়, কে বলিতে পারে ?"

জীবশিক্ষা, লোকের হিতসাধন, এই সকল সম্বন্ধে তাঁহার নিতান্ত আপত্তি ছিল। ইচ্ছা করিয়া তিনি কখন কাহাকেও কোন কথা কহিতেন না। এক সময়ে ব্রাহ্মণী প্রচারকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার নিমিত্ত কত অনুরোধ করিতেন, বলিতেন, "ভাব নিয়ে ঘরে বসে থাক।" পরমহংসদেবকে বার বার এই কথা বলিলে তিনি বিরক্ত হইয়া উঠিতেন। "কালী যাহা করিবেন, তাহাই হইবে।" এই তাঁহার কথা ছিল।

তাঁহার অভিমান না থাকায়, তিনি ইচ্ছা করিয়া, কিম্বা মনে কোন বিষয় সঙ্কল্প করিয়া, কোন কার্য্য করিতে পারিতেন না। যখন যাহা করিতেন, তাহা ভাবে করাইয়া লইত। তিনি উপদেশে বলিতেন, "ঝড়ের এঁটো পাত হওয়া সকলের উচিত। বাতাসে তাহাকে যে দিকে লইয়া যাইবে, এঁটো পাতের এ প্রকার কোন অভিমান থাকিবে না যে, তাহার বিরুদ্ধে কিছু করিবে।" পরমহংসদেব বাস্তবিক এই ভাবেই থাকিতেন। তিনি কখন কাহাকেও কালীর ইচ্ছা ছাড়া কোন কথা আপনি বলিতেন না। অনেক সময়ে লোকে দেখিত যে, তিনি বলিতেছেন, কিন্তু বাস্তবিক তিনি বলিতেন না। একথা সাধারণ লোকেরা বুঝিতে পারিবেন না। তবে আভাসে একটু বুঝাইতে চেষ্টা করি। যেমন কাম ক্রোধাদি উদ্দীপ্ত হইলে মনুষ্যেরা যে সকল কার্য্য করিয়া থাকে, সহজাবস্থায় তাহা তাহারা কখন করিতে পারে না এবং অনেকে রিপুর পরাক্রমে কোন প্রকার অবৈধাচরণ করিলে, পরে তাহার জন্য সে আপনি অনুশোচনা করিয়া থাকে, এস্থানে যেমন তাহাকে ভাবে কার্য্য করাইয়া লয়, তেমনি, পরমহংসদেব সকল কার্য্যই ঈশ্বরের ভাবে করিতেন। পূর্ব্বেই

বলিয়াছি, এ কথাটী বুঝা অতিশয় কঠিন। ঈশ্বরের ভাবে তাঁহার কার্য্য না হইলে অমানুষ কার্য্য করিতে পারে কে? কি বাল্যকালে, কি কিশোর সময়ে, কি যুবা বয়সে, কি প্রৌঢ়াবস্থায়, তাঁহার যে সকল কার্য্যকলাপ হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমান কালে নিতান্ত অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু ঐ সকল ঘটনা কল্পিত নহে, তাহা যথার্থই ঘটনাবিশেষ। অমানুষ কার্য্য যে স্থানে হয়, সে স্থানে ঐশ্বরিক শক্তি না বলিয়া আর উপায়ান্তর নাই। এই ঐশ্বরিক শক্তির কার্য্য তাঁহার ভিতর দিয়া সম্পন্ন হইত বলিয়া, যাহা অভাবনীয় ও অচিন্তনীয় বিষয়, তাহাও তাঁহার দ্বারা সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

কথিত হইয়াছে যে, পরমহংসদেব অধিক লেখা পড়া জানিতেন না। এ কথা বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে বলা হইল। সংস্কৃত জানিতেন না; কিন্তু সকল প্রকার সংস্কৃত শ্লোক তিনি বুঝিতে পারিতেন। কেবল বুঝা নহে, তাহার গূঢ় তাৎপর্য্য বাহির করিয়া দিতেন। ইংরাজী জানিতেন কিম্বা অন্য কোন ভাষা জানা ছিল, তাহার প্রমাণ কিছুই নাই। এই পাণ্ডিত্যে কি দর্শন, কি জড়বিজ্ঞান, কি মনোবিজ্ঞান, কি ধর্ম্মতত্ত্ব, কি সমাজতত্ত্ব, তাঁহার নিকট কোন তত্ত্বেরই অভাব ছিল না। যে ব্যক্তি মনোবিজ্ঞানে পণ্ডিত, তাহাকে অন্য কোন কথা কহিতেন না। যে জড়বিজ্ঞানে পণ্ডিত, তাহাকে তাহারই উপদেশ দিতেন। এই প্রকার পাত্র বিচার করিয়া উপদেশ দেওয়া মনুষ্য-শক্তির বহির্ভূত কথা। কেবল তাহা নহে। তিনি সময়ে সময়ে শাস্ত্রের মীমাংসাও করিয়া দিয়াছেন। একদা অধরলাল সেন কাশীপুরের মহিমাচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সহিত তন্ত্রের কোন শ্লোক লইয়া বাদানুবাদ করিয়াছিলেন। মহিম বাবু এবং তাঁহার বাটীস্থ জনৈক পণ্ডিত সেই শ্লোকের এক প্রকার অর্থ করিয়া-ছিলেন, অধর বাবু তাহার স্বতন্ত্র অর্থ করেন। পরস্পর অমিল হওয়াতে সে ক্ষেত্রে কোন প্রকার মীমাংসা হইল না। অধর বাবু তথা হইতে পরম-হংসদেবের নিকট গমন করিয়া সে কথা কিছুই উত্থাপন করিলেন না। কারণ, পরমহংসদেব শাস্ত্র পাঠ করেন নাই। তাহা তাঁহার অধিকার বহির্ভূত, এই বিশ্বাস ছিল। অধর বাবু বসিয়া আছেন, এমন সময় পরমহংসদেবের ভাবাবেশ হইল। তিনি অধর বাবুকে ডাকিয়া সেই শ্লোকগুলির সমুদয় অর্থ করিয়া দিয়াছিলেন। অধর বাবুর আর আশ্চর্য্যের সীমা রহিল না। নিতান্ত আবশ্যক না হইলে, পরমহংসদেবের কখন শক্তির পরিচয় প্রকাশ পাইত না। এই প্রকার শক্তির বিকাশ হইলে তিনি বলিতেন, "যেমন ছাদের জল নল দিয়া

পড়ে, কখন বাঘের মুখ কিম্বা স্থানান্তরে কুকুর অথবা মানুষের মুখের ভিতর দিয়া বাহির হয়। নিম্ন হইতে ছাদের জল দেখা যায় না, কেবল যাহা দিয়া জল পড়ে, তাহাই দেখা যায়। লোকে মনে করে যে, বাঘের মুখের ভিতর দিয়া জল আসিতেছে। তেমনি হরি কথা যাহা বাহির হয়, তাহা হরিই বলেন। আধারটী বাঘ-মুখ-বিশেষ, নলমাত্র।" পরমহংসদেবের পক্ষে, এ কথা সম্পূর্ণ প্রযোজ্য, তাহাতে তিলাংশ সন্দেহ নাই।

পরমহংসদেব ঘোর সন্ন্যাসী, ঘোর গৃহী, ঘোর ভক্ত এবং ঘোর জ্ঞানী ছিলেন। তাঁহার কোন দ্রব্যেই প্রয়োজন ছিল না। স্ত্রী বল, পুত্র বল, কন্যা বল, মাতা বল, পিতা বল, ভাই বল, বস্ত্র বল, অর্থ বল, কিছুতেই তাঁহার আবশ্যকতা দেখা যায় নাই, কাহারও সহিত কোন সম্বন্ধ রাখিতেন না। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি এই প্রকার বিবিধ সম্বন্ধ স্থাপন পূর্ব্বক সংসার করেন, তাহাদের অপেক্ষা তিনি সংসারী ছিলেন। স্ত্রীর কোন সম্বন্ধ রাখিতেন না, তথাপি তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন নাই, কালসাপিনী বলিয়া ঘৃণা করিতেন না। তিরোভাবের দিন পর্য্যন্ত যে কোন হেতুতেই হউক, সঙ্গে রাখিয়াছিলেন। আমরা শত শত তাঁহার পুত্র রহিয়াছি। আমাদের কল্যাণের জন্য তিনি যে পরিমাণে কাতর এবং ব্যস্তচিত্ত হইতেন, বাপ মা তেমন কাতর হন না। একদা আমাদের বাটীতে বিসূচিকা রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়ায়, অল্প দিনের মধ্যে তিনটী সন্তান কালগ্রাসে পতিত হয়। আমরা এই নিমিত্ত একটী রবিবারে তাঁহার নিকটে গমন করিতে পারি নাই। তিনি তাহা জানিতে পারিয়া সুরেন্দ্র বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "এরা আজ আসে নাই কেন? এদের বড় বিপদ, তুমি যাইয়া সংবাদ লইবে।" আমরা যখন তাঁহার নিকটে গমন করিলাম, আমাদের জন্য তাঁহার কাতরতা দেখিয়া মনে করিয়াছিলাম যে, আমাদের পিতা যতদূর দুঃখিত না হইয়াছেন, তাঁহা অপেক্ষা তিনি যে কত গুণে কাতর হইয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সন্ন্যাসী তিনি, তাঁহার এ সকল কেন? মায়িক দুঃখ তাঁহার কেন? ভাব বুঝিবে কে? পরক্ষণে তিনিও যেমন হইলেন, আমাদেরও তেমনি পরিবর্ত্তিত করিলেন। ভক্ত, কি অভক্ত, সকলের জন্য তিনি কাঁদিতেন। একদা কালীবাটীতে একটী কাঙ্গালী তিন চারি দিবস প্রসাদ পাইতে আসিয়াছিল। দ্বারবান তাহাকে তিন দিনের অধিক আসিতে দেখিয়া ধাক্কা দিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিল। এই কথা পরমহংসদেব শ্রবণ করিয়া রোদন করিতে আরম্ভ

করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "মা! এ কি তোর বিচার! আহা! দুটী অন্নের জন্য মার খাইল!" তাঁহার এই কথা শ্রবণ করিয়া আমাদের হৃদয় বিচূর্ণ হইয়া গেল! আমরাও তাঁহার সহিত কাঁদিয়াছিলাম। তাঁহার হৃদয় দয়ায় গঠিত ছিল, অথবা যে স্থানে দয়াময় নিজে বসিয়া রহিয়াছেন,সে স্থানের কার্য্য কেন কঠোর হইবে? তিনি যাহার জন্য কাতর, তিনি যাহার জন্য চিন্তিত, যাহার জন্য তাঁহার চক্ষে জল আসে, তাহার কতদূর সৌভাগ্য! যাহার হৃদয়ের ব্যথায় তিনি ব্যথিত হন, তাহার দুঃখ কোথায়? তখনই একটী লোক আসিয়া সংবাদ দিল যে, ত্রৈলোক্য বাবু সেই কাঙ্গালীকে একটী টাকা দিয়াছেন এবং আর তাহাকে কেহ কিছু বলিবে না। পরমহংসদেবের আর হাসি ধরিল না। তিনি আমাদের সামাজিক উন্নতির জন্য সর্ব্বদা ভাবিতেন। উহার এত টাকায় হইতেছে না, উহার মাসে এত খরচ, উহার কিছু টাকা চাই, ইত্যাকার কতই ভাবিতেন। তিনি যাহা ভাবিতেন, তাহার কার্য্য হইতে কত বিলম্ব? এ বিষয়ের একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। তাঁহার কোন ভক্তের অতি অল্প আয় ছিল। তাহার বেতন বৃদ্ধির জন্য যখন উপর আফিসে দরখাস্ত যাইল, পরমহংসদেব অপর ভক্তের মুখে সে কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "আহা! উহার এত টাকার কমে চলে না, বেতন বৃদ্ধি কি হইবে?" ভক্ত কহিলেন, "মহাশয় তাহার জন্য চিন্তিত, অবশ্যই হইবে। হইবে কি, হইয়া গিয়াছে।" আশ্চর্য্য ব্যাপার! সে সময়ে সরকার বাহাদুরের তহবিলে বড়ই খাঁকৃতি। যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্য সকল ব্যয় কমিয়া যাইতেছিল, কিন্তু তাহার যাহা বৃদ্ধি পাইবার আশা ছিল, তাহার দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। আশ্চর্য্য এই জন্য বলি, যে যত টাকা প্রার্থনা করে, উপর-ওয়ালারা তাহা কমাইয়া দিতে পারিলে কোন মতে ছাড়ে না, কিন্তু প্রার্থনা অপেক্ষা বেশী দিতে কেহ কি কখন শুনিয়াছেন? এ ক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছিল।

পিতা মাতা যেমন যে ছেলেটী যাহা ভালবাসে, তাহার জন্য সেই জিনীসটি সংগ্রহ করিয়া রাখেন, যে জিনীসটি যাহার খাইতে ভাল লাগে, তাঁহারা না খাইয়া তাহার জন্য ঢাকা দিয়া রাখেন, পরমহংসদেব তাহাই করিতেন। কোন সেবক পরমান্ন খাইতে বড় ভালবাসিত, তিনি তাহার জন্য তাহা তুলিয়া রাখিয়া দিতেন। কোন কোন ভক্তের বাটীতো বেদানা, মিছরী, বড় বাজারের ক্ষীরের দ্রব্যাদি হয় আপনি যাইয়া দিয়া আসিতেন, না হয় অপরের

দ্বারা পাঠাইয়া দিতেন। এই জন্য বলি তাঁহার পুত্র কন্যা ছিল। এমনও দেখা গিয়াছে যে, কোন ভক্ত সন্তান লইয়া গিয়াছিল; তাঁহার স্ত্রীকে টাকা দিয়া ছেলেটী দেখিতে বলিয়াছিলেন। তিনি কাহাকে টাকা, কাহাকে জামা, কাহাকে বস্ত্র, যাহার যাহা প্রয়োজন বুঝিতেন, তিনি আপনি তাহা দিয়াছেন। একদিন তাঁহার কোন ভক্তকে কোন কথা না ব.লয়া একখানি গরদের কাপড় দিলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি কহিলেন, "দিলাম, লইয়া যাও।" পরে শ্রবণ করা গেল যে, সেই দিন তাহার মাতার একখানি গরদের কাপড় সম্বন্ধে কোন গোলমাল হইয়াছিল। ঘটনাটী ঠিক্ মনে নাই, তিনি তাহা জানিতে পারিয়া সেই অভাব পূর্ণ কারয়া দিয়াছিলেন। অনেকে মনে করিতে পারেন যে, তিনি সামান্য দ্রব্য দিয়া ভক্তের কি ভাল করিয়াছেন? ইহার ভিতরে অর্থ আছে। তিনি কহিতেন যে, যাহার যাহা প্রয়োজন, তাহার অধিক হইলে গোলমাল হয়। সাঁকোর জল যেমন এক দিকের মাঠ হইতে অপর মাঠে যায়, ভিতরে কিছু থাকিতে পারে না; ভক্তদিগের পক্ষেও সেই-রূপ জানিবে। আহার বিহনে তাহারা মরিবে না। আবার তাহার অধিক হইয়া নষ্টও হইবে না। ইহার দ্বারা রজঃ ও তমোগুনের আধিক্যতা বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

তিনি কাহারও নিকটে কিছু গ্রহণ করিতেন না এবং বলিতেন যে, "আমি কাহারও কিছু গ্রহণ করি নাই।" এ কথা লইয়া অনেক কথাই হইত। তিনি যদিও রাসমণির দেবালয়ে থাকিতেন, কিন্তু তাঁহার কথা-প্রমাণ তিনি তথায় কিছু লইতেন না বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, অথচ মন্দিরের সকল দ্রব্যই লইতেন। এই কথায় যে সর্ব্বসাধারণের পক্ষে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? এই নিমিত্ত অনেকে তাঁহাকে দোষারোপ করিত, এখনও করিয়া থাকে। কিন্তু স্থূলদর্শী ব্যক্তিরা মহাপুরুষের চরিত্র যদি সহজে অর্থকরী বিদ্যা বু[illegible] ভেদ করিতে পারিত, তাহা হইলে ধর্ম্ম কর্ম্মের শ্রে[illegible]তা আর থাকিত না। তাহা হইলে কি বর্ত্তমান শতাব্দীর পাস কর্‌া বাবুরা নিরক্ষর ব্যক্তির চরণপ্রান্তে পড়িয়া গড়াগড়ি দিত? তাহা হইলে কি কেশব বাবু প্রভৃতি মহাবিদ্বান্ ব্যক্তিগণ তাঁহার চরণরেণুর প্রত্যাশায় কৃতাঞ্জলি হইয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিতেন? তাহা হইলে কি প্রতাপ বাবু চরণ যাচ্ঞা করিতেন? তাহা হইলে কি বিজয় বাবু "জয় রামকৃষ্ণের জয়!" ধ্বান দিয়া রাজপথে নৃত্য করিতে পারিতেন? সে যাহা হউক, পরমহংসদেব

কি কারণে যে, "কাহারও কিছু গ্রহণ করি নাই" কথা ব্যবহার করিতেন, তাহা আমরা তাঁহার নিকট শ্রবণ করি নাই। এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস হয় নাই। আমরা যখন সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার নিকটে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করি, সেই সময়ে কিয়দ্দিন শনিবারের রজনী শেষ না হইতেই আমরা কলিকাতা হইতে হাঁটিয়া দক্ষিণেশ্বরে গমন করিতাম। মধ্যাহ্নে তথায় প্রসাদ পাইতাম। কয়েক মাস এইরূপে অতিবাহিত হইলে একদিন আমরা পরস্পর বলাবলি করিলাম যে, "বেশ মজা হইয়াছে। পরমহংসদেব কত আদর করিয়া আমাদের আহার করান।" সেইদিন অপরাহ্নে তিনি আমাদের ডাকিয়া কহিলেন, "তোমরা এখানে আহার কর কেন? এস্থান ত তোমাদের জন্য হয় নাই। সন্ন্যাসী ফকিরের নিমিত্ত হইয়াছে। এ অন্ন খাইলে গৃহীদিগের অনিষ্ট হয়। একদা এক ব্যক্তি এই স্থানে এক ছিলিম তামাক খাইয়া যাইবার সময় একটী পয়সা দিয়াছিল।" আমাদের চক্ষুস্থির হইল, মনে মনে আপনাদিগকে শত ধিক্কার দিলাম এবং তদবধি আমরা জলখাবার লইয়া যাইতাম। দোল পূর্ণিমার পূর্ব্ব রবিবারে আমরা যখন প্রণাম পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করি, তিনি দোলের দিন তথায় ভোজন করিবার নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিবে কে? যে আজ্ঞে বলিয়া স্বীকার করিলাম। কিন্তু বাহিরে আসিয়া কতই বিচার করিলাম যে, যিনি একদিন যাহা করিতে নিষেধ করিলেন, তিনিই আবার আপনি তাহাই করিতে আজ্ঞা দিলেন। কেমন করিয়া এ কথার মীমাংসা হইবে? লোকে যে কথা লইয়া আপত্তি করিত, আমরা তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলাম; কিন্তু তখন কিছুই বুঝিতে পারি নাই। কিছু দিনের পর একদিন পরমহংসদেবের ঐ কথার দুইটী কারণ মনে হইল। প্রথমটী এই যে, ঐ দেবালয়ে রাসমণির কোন স্বত্ব নাই। শিবালয় কয়টী তাঁহার নিজনামে প্রতিষ্ঠিত। তাহাতে তাঁহার সম্বন্ধ আছে, কিন্তু পরমহংসদেবের কোন সংস্রব ছিল না। কালী ও রাধাকৃষ্ণ গুরুর নামে হওয়ায় রাসমণির সম্বন্ধ ছেদন হইয়া গিয়াছিল। ভোগ রাগ যাহা হয়, তাহা ঠাকুরের জন্য, সেই প্রসাদে কাহারও নিজ স্বার্থ থাকিতে পারে না। এ হিসাবে তিনি অন্যায় বলিতেন না। কারণ কালীর নামে যে বিষয় আছে, তাহাতে রাসমণি নিজেই নিঃস্বত্ব হইয়া কালীকে প্রদান করিয়াছেন। দান গ্রহণের দোষ গুণ যদি কিছু হইয়া থাকে, তাহা রাসমণি এবং কালীতে হইয়াছে। পরমহংসদেব কেন, যে কেহ সেই বিষয়ের স্বত্ব ভোগ করিবে, তাহা কালীর বুঝিতে হইবে,

কালীর অকর্ম্মণ্য সন্তানে এই বিষয় ভোগ করিবে; কিন্তু কর্ম্মী-সন্তানেরা তাহাতে ভাগ বসাইলে, অকর্ম্মেণ্যেরা আবার যাইবে কোথায়? এই নিমিত্ত গৃহীদিগের তাহাতে অপরাধ হইবে বলিয়া কথিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, পরমহংসদেব তথায় কিছু দিন চাকরি করিয়াছিলেন। যখন কর্ম্ম করিতেন, তখন কার্য্যের বিনিময়ে বেতন এবং খোরাক পোষাক পাইতেন। যে পর্য্যন্ত তাঁহার শক্তি ছিল, সে পর্য্যন্ত পরস্পর বিনিময়ে কার্য্য চলিয়াছিল। যখন অশক্ত হইলেন, তখন তাঁহার পূর্ব্বের কার্য্যকরী শক্তি সমুদয় দেবীর সেবায় ব্যয়িত হইয়াছে জ্ঞান করিয়া, কালীর সেবায়েৎ তাঁহাকে তদবস্থায় যাবজ্জীবন রাখিবার নিমিত্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন। যদিও বাঙ্গালীর পেন্‌সন দিবার প্রণালী প্রচলিত নাই, কিন্তু একেবারে এরূপ দৃষ্টান্ত যে অপ্রতুল, তাহাও নহে। রামপ্রসাদের ইতিহাসে পেন্সনের কথা উল্লেখ আছে। অতএব পরমহংসদেবের, "কাহারও কিছু গ্রহণ করি নাই," বলিবার বিলক্ষণ অধিকার ছিল। পেন্সন পাওয়া বাস্তবিক দাতব্যের হিসাব নহে। এই নিমিত্ত বলি, পরমহংসদেব এক বিচিত্র প্রকার সন্ন্যাসী—সন্ন্যাসীও বটেন, আবার গৃহীও বটেন।

কথিত হইয়াছে যে, পরমহংসদেব সমুদায় ধর্ম্মপ্রণালী সাধন দ্বারা বিশ্লেষণ পূর্ব্বক দুই ভাগে পর্য্যবসিত করিয়াছিলেন। যথা, জ্ঞান বা আত্মতত্ত্ব এবং ভক্তি বা লীলাতত্ত্ব। তিনি জ্ঞানীর শিরোমণি অর্থাৎ জ্ঞান পথে যখন ভ্রমণ করিতেন, তখন সাকার ভাব প্রেম কিছুই স্থান পাইত না। তিনি নির্ব্বিকল্প সমাধিতে নিমগ্ন থাকিতেন। তখন কোন মতে সে সমাধি ভঙ্গ করা যাইত না। এমন কি "ওঁ তৎ সৎ" এর 'তৎ' ব্যতীত 'সৎ' শব্দটীও প্রয়োগ করা যাইত না। তিনি তখন সকলই তন্ময়ত্ব দেখিতেন বা বুঝিতেন। সৎ-শব্দের দ্বারা দ্বৈত ভাব আসিয়া থাকে, অর্থাৎ সৎ বলিলে অসৎ শব্দ অনুমিত হয়। তাঁহার সাধনের মধ্যে সৎ অসৎ একাকার করা ছিল।

লীলা বা ভক্তি পক্ষে তাঁহার জলন্ত দৃষ্টান্তের প্রভাবে আধুনিক নিরাকারবাদীরাও সাকার ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি যখন কালীর সহিত কথা কহিতেন; সে কথা শুনিলে কে বলিবে যে, তথায় তিনি নাই। একদা দোলের দিন তিনি কীর্ত্তন করিতে করিতে একটী ধূয়া ধরিলেন, "সব সখীগণ তোরা সাক্ষী থাক্, আজ ফাগ্ রণে তুমি হার কি আমি হারি!" তখনই নিজে যেন শ্রীমতি হইলেন এবং কৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া ঐ গান করিতে লাগিলেন।

মধ্যে মধ্যে দৌড়াইয়া গিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী অঙ্গুলি দ্বারা কৃষ্ণের বক্ষঃদেশ স্পর্শ করিয়া, "তুমি হার" এমন ভাবে বলিতে লাগিলেন, যেন সেই দৃশ্যটী প্রকৃত রাধাকৃষ্ণের ফাগুয়া খেলা হইতেছে বলিয়া জ্ঞান হইতে লাগিল। সে ঘটনা দেখিলে আর মনে হয় না যে, জগতে রাধাকৃষ্ণপ্রেম বিহার হইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাব আর কিছু আছে। আহা! সে দিনের ব্যাপার এখনও স্মরণ হইলে আমরা হতবুদ্ধি হইয়া যাই। ভগবান্! আমাদের বল দিন, আমাদের একটু কৃপাকণা বিতরণ করুন, যাহাতে এই অদ্ভুত রামকৃষ্ণচরিত কিয়ৎ পরিমাণেও লিপিবদ্ধ করিতে সক্ষম হই। চক্ষের দেখা, প্রাণের জিনীস, কিন্তু শক্তি নাই, ভাব নাই, শব্দ নাই, যে তাহা আভাসেও প্রকাশ করিতে পারি। একদা শিবপুরনিবাসী শ্যামাচরণ পণ্ডিত মহাশয় পরমহংসদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মহাশয়! ঈশ্বর দর্শন করিলে কিরূপ অনুভব করেন, আমার সে কাহিনী শ্রবণ করিতে বড় সাধ হইতেছে।" পরমহংসদেব ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "দেখ, একদিন প্রাতঃকালে দুইটী সমবয়স্ক যুবতী পুষ্করিণীতে আসিয়া একজন অপরকে জিজ্ঞাসা করিল, 'হ্যাঁলা! তোর ভাতার এসেছিল না?' সে কহিল, 'হ্যাঁ।' সঙ্গিনী কহিল, 'তুই কেমন সুখ পেলী?' সে কহিল, 'সে কথা কি মুখে বলা যায় লা? তোর ভাতার যখন আস্‌বে, তখন তুই বুঝ্‌তে পার্‌বি।' ঈশ্বরের রূপ কি, কেমন, সে কি বলিবার কথা?" শ্যামাচরণ পণ্ডিত এই কথা শ্রবণ করিয়া রোদন করিয়া উঠিলেন। আমাদের সেই কথার ভাব আজ স্মরণ হইতেছে। এখন বুঝিতে পারিতেছি, সে বাস্তবিক সম্ভোগের কথা, কথায় বলিবার উপায় নাই।

পরমহংসদেব এইরূপে একদিকে জ্ঞান ও অপর দিকে ভক্তি, উভয়বিধ মতে কখন কি ভাবে থাকিতেন, তাহা কে অনুধাবন করিতে পারিবে? তিনি সেইজন্য কখন জ্ঞানী, কখন ভক্ত এবং কখন এতদুভয়ের সাম্যভাবে অবস্থিতি করিতেন। এই নিমিত্ত তিনি কখন কখন বলিতেন যে, "বেদ, পুরাণ, তন্ত্রাদি সমুদায় সত্য।" আবার কোন সময়ে এ সকল উড়াইয়া দিয়া অনন্ত সচ্চিদানন্দে ডুবিয়া বসিয়া থাকিতেন।

তিনি কাহাকেও ঘৃণা করিতেন না। ধনী নির্ধনীর প্রভেদ রাখিতেন না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ধনীদের সহিত বড় মিশিতেন না, তাহার কারণ স্বতন্ত্র ছিল। তিনি বলিতেন, "ধনীরা পূর্ব্বের সঙ্কল্প হেতু অর্থ পাইয়াছে। তাহাদের কিছুকাল তাহা ভোগ না হইলে হরিকথা লইবে না। কারণ,

প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ সঙ্কল্পের দাস। যখন সঙ্কল্প ফুরাইয়া আসিবে, তখন তাহাদের ঈশ্বরের দিকে যাইতে চেষ্টা হইবে, তখন তাহাদের চমক্ ভাঙ্গিবে। ইচ্ছা করিয়া যাহা পাইয়াছে, তাহা ইচ্ছা করিয়াই পরিত্যাগ করিবে। যেমন, যে মুখে কাঁটা ফোটে, তাহাকে সেই মুখ দিয়া বাহির করিতে হয়। যেমন, কেহ সঙ্ সাজিয়া আসরে আসিয়াই কি তাহা ত্যাগ করিতে পারে? তাহা করিলে রসভঙ্গ হয়। কিয়ৎ কাল রঙতামাসা করিলে তাহার পর আপনি চলিয়া গিয়া রঙ্‌কালী তুলিয়া ফেলিবে।"

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, তিনি ব্যক্তিবিশেষে উপদেশ দিতেন। কাহাকে তিনি সন্ন্যাসী হইতে বলিতেন, কাহাকে গৃহই ধর্ম্মশিক্ষার স্থান বলিয়া উপদেশ দিতেন এবং কাহাকে দিন কতক আম্‌ড়ার অম্বল খাইয়া আসিতে বলিতেন। সন্ন্যাসীর ভাব যাহাদের শিক্ষা দিতেন, সংসার একেবারে নিতান্ত অপদার্থ, হেয় বলিয়া তাহাদের বুঝাইতেন, সুতরাং তাহাদের সেই প্রকার সংস্কার বদ্ধমূল হইয়াছে। যাহাদের গৃহে রাখিয়া সংসারকে কেল্লার সহিত তুলনা দিয়া গিয়াছেন, তাহারা সংসারের ভিতরেই পূর্ণ শান্তি লাভ করিয়া পরমানন্দে দিনযাপন করিতেছে। আর যাহারা দিন কতক আম্‌ড়ার অম্বল খাইয়া অর্থাৎ সংসার সুখ কি জানিয়াই সন্ন্যাসী হইয়াছে, তাহারা উভয় পক্ষেরই পক্ষপাতী হইয়া আছে। এই প্রকার যাঁহার ভাব, তিনি সন্ন্যাসীও বটেন, গৃহীও বটেন এবং গৃহী-সন্ন্যাসীও বটেন।

পরমহংসদেব, সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয়ের ভাব সর্ব্বধর্ম্ম সাধন করিয়া লাভ করিয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহার নিকটে অসাম্প্রদায়িক ভাব ছিল। তাই সকল ভাবের ব্যক্তিরা আনন্দ লাভ করিতেন। সুতরাং, পরমহংসদেবের সম্প্রদায় হয় নাই এবং হইবেও না। কিন্তু এক হিসাবে তাঁহার সম্প্রদায় আছে এবং হইবে। অন্যান্য সম্প্রদায় যে প্রকার আপন মতকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বাপেক্ষা খাঁটি মনে করেন, পরমহংসদেব তাহা করিতেন না। তিনি চলিত সকল মতকেই সত্য বলিতেন। যাহার ভিত্তি এক ঈশ্বর, সেই ভাব অভ্রান্ত বলিয়া তাঁহার নিকট পরিগণিত হইত। এই ভাবে তাঁহার সম্প্রদায় কিরূপে হইবে? কিন্তু তাঁহার শিষ্যেরা ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী হইয়াও যখন ঐ কথা কহিবেন, তখন পরোক্ষ সম্বন্ধে এক মতে এক ভাবে কার্য্য হইবে, সুতরাং তাহাকে একটী সম্প্রদায় বলিলেও ভুল বলা হইবে না। এ প্রকার সম্প্রদায়কে সম্প্রদায় বলা যায় না। তাহাতে সম্প্রদায়ের গোঁড়ামী থাকিবে না, দ্বেষাদ্বেষী থাকিবে

না, পরস্পর টানাটানি থাকিবে না। বিবাদ হয় কেন? একজন বলিল, তোমার ধর্ম্মভাব ভুল। বিশ্বাসীর বিশ্বাস সামান্য কথা নহে। সে অমনি লগুড়াহত নিদ্রিত কালভুজঙ্গের ন্যায় চক্র ধরিয়া তখনই তাহার আততায়ীর বক্ষে দংশন করে। পরিশেষে আঘাত ও দংশন জ্বালায় উভয়ে জ্বলিয়া মরে। উভয়ের অশান্তি-অগ্নিতে উভয়কে পুড়িয়া মারে। পরমহংসদেব যে অসাম্প্র দায়িকতা শিক্ষা দিয়া সম্প্রদায় গঠন করিবার পত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহা যখন সকলে প্রাণে প্রাণে অনুধাবন করিতে পারিবেন, তখন যে কি সুখ ও শান্তির রাজ্য স্থাপন হইবে, তাহা মনে করিলেও হৃদয় নৃত্য করিতে থাকে! ইহার ভিতরে কঠিন কিছুই নাই। কেবল নিজ নিজ অভিমান কিঞ্চিৎ খর্ব্ব করিতে পারিলেই হয়। দুই পাতা গীতা উল্টাইয়া যদ্যপি গীতাই অবলম্বন করিতে আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা হইলে সে কথা নিতান্ত উপহাসজনক হইয়া দাঁড়াইবে। যদ্যপি ভাগবতের স্কন্ধবিশেষ পাঠ করিতে শিখিয়া কেবল লীলাকথা ছড়াইয়া বেড়ান হয়, তাহা হইলে কিরূপে সকলে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইতে পারিবে। ঘোষপাড়ারা ত জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছেন। কি কথায় টোক্কর—প্রত্যেক ধর্ম্মের প্রতি বিদ্রূপাত্মক কথা। কেনরে বাপু! যাহা ভাল বুঝিয়াছ কর, অন্যের বিশ্বাসে হস্তক্ষেপ কেন? ব্রাহ্মেরা দেশ ছাড়া করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তোমরা পরিত্রাণ পাইয়া থাক, ভালই। আমরা সকলে না হয় নিম্নগতি লাভ করিব—বিবাদ কেন? গালাগালি কেন? আর কি কার্য্য নাই? সাকার কি করিয়াছেন? সাধ্যমত চেষ্টা করিতে ক্রটী হইতেছে না; কিন্তু করিয়াছ কি? বৌদ্ধধর্ম্ম এক সময়ে প্রবল হইয়াছিল; কিন্তু তাহা অদ্য কোথায়? তাহা চীন, বর্ম্মা প্রভৃতি দেশ আশ্রয় করিয়াছে। সাম্প্রদায়িকতা দ্বারা কোন পক্ষেরই লাভ নাই, সমূহ অমঙ্গল। উভয়ের উদ্দেশ্য ধর্ম্ম, উভয়েই তাহা করিতেছে। উভয়ের উদ্দেশ্য শান্তি, তাহাও হইতেছে। যদি না হইত, যদ্যপি বিশ্বাসীর প্রাণে আরাম না থাকিত, যদ্যপি বিশ্বাসীর বিশ্বাসে প্রকৃত ঈশ্বর-ভাব না থাকিত, তাহা হইলে আজ কি প্রাচীন হিন্দুধর্ম্ম হিন্দুস্থানে অপ্রতিহত প্রভাবে বিরাজ করিতে পারিত?

সত্য কখন নষ্ট হইবার নহে। যেমন, জড়জগতের জড় পদার্থ কখন বিনষ্ট হয় না। কোহিনুর অদ্যাপি ব্রিটিস্ মস্তকে দেদীপ্যমান রহিয়াছে; তাহার ধর্ম্ম সমভাবে রহিয়াছে; কিন্তু হিন্দুস্থানে নাই—নাই বলিয়া কি কোহিনুরের

অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে? হিন্দুর বিশ্বাস অবিকল সেই প্রকার। হিন্দু, বিজাতীয় অনুকরণ করিতে শিখিয়া আপন বাস, আপন রীতি, আপন নীতি, আপন ধর্ম্ম ছাড়িল, সে ভাব অপর স্থানে যাইয়া প্রকাশ পাইবে। জড়জগতের রূঢ় পদার্থ যেমন স্বভাবসিদ্ধ, ভাব-রাজ্যের ভাবও তেমনি রূঢ়ধর্ম্মাক্রান্ত। আমার ঘরের রূপা সোনা বিক্রয় করিলাম, আমি নিঃস্ব হইলাম, তাই বলিয়া রূপা সোনা অদৃশ্য হইয়া যাইবে? না, কোথাও না কোথাও, কোন না কোন প্রকারে অবশ্যই থাকিবে? এই নিমিত্ত বলা হইতেছে যে, কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান, কি বৌদ্ধ, কি অন্য মতাবলম্বী, কেহ কাহার ভাবে নিন্দা কিম্বা আপন ভাবে কাহাকে আনিবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইও না। যেমন সকলে এক জাতীয় পদার্থসম্ভূত হইয়া ভিন্নাকার, ভিন্নভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, ধর্ম্মভাবও সেইরূপ সকলের স্বতন্ত্র জানিতে হইবে। মাতাল যেমন সকলকে মাতাল করিতে পারে না, যাঁহারা সুরা স্পর্শ না করেন, তাঁহারাও মাতালদের আপন ভাবে পরিবর্ত্তিত করিতে সক্ষম নহেন। সাধু চোরকে চুরি করা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারেন না, চোরও সাধুকে আপন মতাবলম্বী করিতে সমর্থ হয় না; সেইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি স্বভাবগত ধর্ম্ম জন্মকালেই প্রাপ্ত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে। ঈশ্বর সকলের পরিত্রাতা। তিনি তাহার ব্যবস্থা না করিয়া কি প্রেরণ করিয়াছেন? অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বক্তৃতার হিল্লোলে অনেকেই আপন বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়া পরিশেষে পরিতাপযুক্ত হইয়া নিজ পূর্ব্বভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজে এ প্রকার দৃষ্টান্তের অপ্রতুল নাই। এজন্য বলিতেছিলাম যে, পরমহংসদেবের ধর্ম্মভাব সকলেরই কল্যাণকর। অনেকের মুখে শ্রবণ করা যায় যে, "একজনকে ডুবিয়া যাইতে দেখিলে আর একজন কি তাহাকে উত্তোলন করিবে না? দেখিতেছি যে, সকলে ভ্রমান্ধ হইয়া কতকগুলি কুসংস্কারের কুহকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়প্রায় বিঘূর্ণিত হইয়া বেড়াইতেছে।" আমরা এ সকল বিষয়ে এক্ষণে প্রবৃত্ত হইব না, তাহা স্থানান্তরে আলোচনার বিষয়। একথার আলোচনা করিতে হইলে আর একখানি পুস্তক লিখিতে হয়, তাহা পরের কথা। ফলে, পরমহংসদেব যে কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা সুবোধ সুবুদ্ধি এবং পরিপক্ক-মস্তিষ্ক-সম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই অতি আদরের সহিত হৃদয়ে যে ধারণা করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে আজ কাল অপরিপক্ক যুবকদিগের হাতে লেখনী পড়িয়া

বিভ্রাটের দ্বিতীয় পন্থা হইয়াছে। যাঁহাদের অদ্যাপি ধর্ম্ম প্রয়োজন হয় নাই, যাঁহারা ধর্ম্মের লাভালাভ কি, তাহা তিলমাত্রও বুঝিতে পারেন নাই, তাঁহারা ধর্ম্ম লইয়া নাড়াচাড়া ও মতামত প্রকাশ করিতে চাহেন। তাঁহাদের দ্বারা অনেক ব্যক্তির দিক্‌ভ্রম হইয়া থাকে।

এক্ষণে কথা হইতেছে, পরমহংসদেব কোন্ শ্রেণীর ব্যক্তি?

অনেকের বিশ্বাস এবং আমাদের সিদ্ধান্ত যে, পরমহংসদেব সাধারণ সাধু কিম্বা সিদ্ধপুরুষ নহেন। চৈতন্য, মহম্মদ, ঈশা প্রভৃতি যে শ্রেণীর ব্যক্তি, রামকৃষ্ণও সেই শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া ধর্ম্মরাজ্যের প্রত্যেক ব্যক্তির মত। হিন্দুধর্ম্ম সংক্রান্ত সাধু শান্তেরা একথা স্বীকার করিবেন; তাহাতে কোন কথা না হইতে পারে, কিন্তু অন্য ধর্ম্মসংক্রান্ত ব্যক্তিরা যখন সিদ্ধপুরুষ হইতে স্বতন্ত্র শ্রেণীর বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন, তখন সে নিতান্ত উপেক্ষার বিষয় নহে। কেশব বাবুর মনোভাব ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর নিকটে আমরা একদিন পরমহংসদেবের ধর্ম্মভাব বিষয়ে জিজ্ঞাসু হইয়া গমন করিয়াছিলাম। তাঁহার কথায় বলিতে কি, পরমহংসদেবের প্রতি আমাদের ভক্তি সহস্রগুণে বৃদ্ধি হইয়াছিল। তাঁহার সে দিনকার সেরূপ কথা না শুনিলে, হয় ত, পরমহংসদেবকে বিশ্বাস করিতে আমাদের আরও বিলম্ব হইত। তিনি বলিয়াছিলেন যে, "পরমহংসদেব যাহা উপদেশ দেন, সে সকল কথা কোন না কোন পুস্তকে লিখিত আছে। সেজন্য তাঁহার মহত্বতা না থাকিতে পারে, তবে মহত্বতা কোথায়? তিনি যে অনুরাগে গঙ্গাতীরে পতিত হইয়া মা! মা! বলিয়া কাঁদিতেন, সে অনুরাগ কাহার আছে? এই প্রকার অনুরাগ চৈতন্যের ছিল। তিনি কৃষ্ণদর্শনের জন্য কেশোৎপাটন এবং মুখঘর্ষণ করিতেন। এইরূপ অনুরাগ ঈশার ছিল। তিনি চল্লিশ দিন অনাহারে ছিলেন। এইরূপ অনুরাগ মহম্মদের ছিল। তিনি গুহাভ্যন্তরে বসিয়াছিলেন, তাঁহার স্ত্রী নিকটে যাওয়ায়, তাঁহাকে তরবারি দ্বারা কাটিতে আসিয়াছিলেন। ঈশ্বরের জন্য আত্ম-সমর্পণ, ঈশ্বরের জন্য জগৎ-সুখে জলাঞ্জলি দেওয়া, এমন অনুরাগ নিতান্ত বিরল। ঈশার উপাসকেরা ঈশাকে বলিয়াছিলেন, তুমি আমাদের লবণ স্বরূপ। কোন পদার্থ লবণ বিরহিত হইলে যেমন আস্বাদবিহীন হয়, তেমনি প্রকৃত সাধু সাধারণ জীবের বিষয়াত্মক মনে প্রেম শিক্ষা দিয়া তাহাদের জীবনের বলাধান করিয়া থাকেন। পরমহংসদেবও তদ্রূপ। এমন ধর্ম্মাত্মা চারিশত বৎসরান্তে যে প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন, সে দেশে ধর্ম্মের অভাব হয় না।"

পরমহংসদেবের অনেক ভক্ত গাজীপুরের পওহারীবাবা নামক প্রসিদ্ধ সিদ্ধযোগীর নিকটে গমন করিয়াছিলেন। তিনি পরমহংসদেবের নাম শ্রবণ করিয়া কহিয়াছিলেন, তিনি ত অবতার! এই সাধুর নিকটে পরমহংসদেবের একখানি ফটোগ্রাফ্ ছিল। পরমহংসদেব এই নিমিত্ত হিন্দু মতে অবতার-বিশেষ, সাধু কিম্বা ভক্ত নহেন এবং অন্য শ্রেণীর মতে, তিনি সাধারণ সাধু অপেক্ষা যে উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তিরা মধ্যে মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া আচার্য্যবিশেষে কার্য্য করিয়া ধর্ম্মভাবের তরঙ্গ উঠাইয়া দিয়া থাকেন, রামকৃষ্ণ পরমহংস-দেব সেই শ্রেণীর ব্যক্তি ছিলেন। ফলে, উভয় শ্রেণীর মত এক প্রকারই দাঁড়াইতেছে। কেবল কথার অর্থের কিঞ্চিৎ তারতম্য আছে। সে যাহা হউক, আমরা সর্ব্ব প্রথমে অবতার কাহাকে বলে, তাহার আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

আমাদের শাস্ত্রের আভাসে দুই প্রকার অবতারের বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রথম, বিশেষ অবতার এবং দ্বিতীয়, খণ্ডাবতার। প্রথম শ্রেণীর মধ্যে দশ অবতারের উল্লেখ আছে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে অবতারের পরিমাণ করা হয় নাই, তাহা সংখ্যাতীত। এই নিমিত্ত প্রয়োজনানুসারে নূতন অবতার অবতীর্ণ হইয়া থাকেন

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ কহিয়া গিয়াছেন যে, শিষ্টের পালন এবং দুষ্টের দমনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি। এই নিমিত্ত নূতন অবতার না হই-বার কোন কারণ নাই। অবতার কাহাকে কহে? যেমন জড় জগতে সকল প্রকার পদার্থই প্রস্তুত হইয়া আছে, কিন্তু সাধারণ লোকে তাহা সম্পূর্ণরূপে অবগত নহে। যখন কোন অজ্ঞাত পদার্থ কোন ব্যক্তির দ্বারা প্রকাশিত হয়, সেই ব্যক্তিকে আবিষ্কারক কহা যায়। যাহারা তাঁহার উপদেশ মতে উহা শিক্ষা করিয়া থাকে, তাহাদিগকে সেই বিষয়ে পণ্ডিত কহে। চৈতন্য রাজ্যেও তদ্রূপ। অবতারেরা আবিষ্কারকদিগের ন্যায় এবং সিদ্ধপুরুষেরা পণ্ডিতদিগের সমতুল্য। যেমন আবিষ্কারকের সংখ্যার সীমা নাই এবং তাহা হইবার নহে। কারণ, কে কখন কোন্ পদার্থ আবিষ্কার করিবেন, তাহা কে বলিতে পারে? সেই প্রকার অবতারেরও সীমা হইতে পারে না। ভগবান্ বিশ্বপতি, তাঁহার বিশ্ব সংসারের অনন্ত ব্যাপারে ও অনন্ত কাণ্ডকারখানায় কোথায় কোন্ সময়ে কিরূপ প্রয়োজনানুযায়ী কার্য্য করেন বা করিবেন, তাহা মানুষ কখন ইয়ত্তা করিতে পারে না এবং তাহাতে প্রয়াস পাইলেই মূর্খতার প্রকাশ পাইয়া থাকে। তবে

দূরদর্শী ব্যক্তিরা কার্য্যের পদ্ধতি দেখিয়া আভাসে কিছু বলিতে পারেন। তাহা সর্ব্বদা সম্পূর্ণ হইতে পারে না এবং হইতেও দেখা যায় না।

দেশ কাল পাত্র বিচার-পূর্ব্বক অবতারের প্রয়োজন হইয়া থাকে। যখন অধর্ম্মের প্রাবল্য ও ধর্ম্মের সঙ্কুচিতাবস্থা উপস্থিত হয়, তখনই অবতারের প্রয়োজন হইয়া থাকে। যখন ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের কার্য্য হইতে আরম্ভ হয়, যখন লোকে পাপের সীমা অতিক্রম করিয়াও যাইতে উদ্যত হয়, যখন প্রত্যেক ব্যক্তি ধর্ম্মের বর্ণমালা না পড়িয়া ধর্ম্মোপদেষ্টা হইয়া দাঁড়ায়, যখন লোকে শাস্ত্র-বাক্য বিকৃত করিয়া আপনার সুবিধামত অর্থ করিয়া অনর্থপাত ঘটাইতে আরম্ভ করে, তখনই ধর্ম্ম-বিপ্লব কহা যায় এবং সেই বিপ্লবের তাড়নায় প্রকৃত ধার্ম্মিকেরা নিতান্ত ক্লেশ পাইতে থাকেন। ধর্ম্মরাজ্যের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে দেখা যায় যে, যখন কোন অবতার আবির্ভূত হইয়াছেন, তখনকার অবস্থা অবিকল ঐ প্রকার হইয়াছিল। যখন কংশের অধর্ম্মাচারে পৃথিবী উত্যক্তা ও উৎপীড়িতা হইয়াছিলেন, সে সময়ে ভূভারহারী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্ম-স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন। রাবণের উৎপাতে রামচন্দ্রের অবতরণ। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদিগের অত্যাচারে পশু হনন নিবারণের নিমিত্ত বুদ্ধের জন্ম। অদ্বৈত জ্ঞান বিলুপ্তপ্রায় হইয়া পৌরাণিক তেত্রিশ কোটি দেব দেবীর ভাব বিকৃত হওয়ায় শঙ্করের উদয়। তান্ত্রিক মতের বামাচারপদ্ধতির কদাকার স্রোত প্রবাহিত হওয়ায় শ্রীগৌরাঙ্গদেব হরিনাম বিতরণ করিয়া গৌরাঙ্গীয় প্রণালী প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান ভাব-সঙ্কর কালে প্রকৃত ধর্ম্মভাব পুনঃ স্থাপন হওয়া প্রয়োজন, তাহার সন্দেহ নাই। এই নিমিত্ত এখন অবতারের প্রয়োজন। আমরা প্রথমে পরমহংসদেবকে সাধুর হিসাবে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিতেছি। সাধু যাহাদের বলে, তিনি তাহা ছিলেন না। তিনি যদিও পূর্ব্বপ্রচলিত ধর্ম্মপ্রণালী সাধন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কখন আবদ্ধ থাকিতেন না। শাক্ত হউন, শৈব হউন, বৈদান্তিক হউন, কিম্বা অন্য কোন মতাবলম্বীই হউন, তাঁহারা কেহ কখন তাঁহাদের মত পরিত্যাগ করিতে পারেন না। কারণ, মনুষ্য খণ্ড এবং ভাব অনন্ত। এই নিমিত্ত আমাদের দেশে যিনি যখন যে মতে সাধু কিম্বা সিদ্ধ হইয়াছেন, তিনি সেই মতের শিষ্যই করিয়া গিয়াছেন। পরমহংসদেবের তাহা ছিল না। এই নিমিত্ত তাঁহাকে সিদ্ধ বলা যায় না। সিদ্ধ বলিলে যাঁহাকে বুঝায়, তিনি কিন্তু তাহা ছিলেন এবং সিদ্ধপুরুষেরা যাহা নহেন, তিনি তাহাও ছিলেন। অর্থাৎ সকল প্রকার মতে

তাঁহার অধিকার ছিল। যে মতে যে কেহ সাধন ভজন করিবার উপায় জিজ্ঞাসা করিয়াছে, তিনি তখনই তাহার বাসনা পূর্ণ করিয়াছেন এবং যে কেহ সাধন কার্য্যে অশক্ত হইয়াছে, তিনি নিজে তাহা সম্পন্ন করিয়া দিয়াছেন। এ প্রকার সিদ্ধপুরুষ কস্মিন্ কালে কেহ দেখেন নাই এবং শ্রবণও করেন নাই। এক ব্যক্তি মুসলমানকে মুসলমান ধর্ম্মে শিক্ষা দিতেছেন, সেই ব্যক্তি খৃষ্টানকে উপদেশ দিতেছেন, এবং সেই ব্যক্তিই আবার হিন্দু ধর্ম্মের কাণ্ড, শাখা এবং প্রশাখা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের গুরুরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। এ প্রকার সিদ্ধপুরুষ কোন্ জাতিতে এবং কোন্ সম্প্রদায়ে ছিলেন বা আছেন? সুতরাং, তিনি সাধারণ সিদ্ধপুরুষ নহেন। কিন্তু তিনি যে সকল মতেই সিদ্ধ ছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। যে সকল সম্প্রদায়দিগের সহিত পরস্পর কস্মিন্ কালে মিল নাই এবং তাহা হইবার সম্ভাবনা নহে, যথা শাক্ত ও বৈষ্ণব, হিন্দু এবং মুসলমান, ইত্যাদি এ প্রকার বিভিন্ন মতের লোকেরাও তাঁহার নিকটে তৃপ্তিলাভ করিতেন। কেবল তৃপ্তি নহে, সাধন লব্ধ বস্তু লাভ করিয়াছেন। কেবল তাহাও নহে, তাঁহাকে সেই সেই ভাবের অদ্বিতীয় গুরুরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এ প্রকার সিদ্ধপুরুষের বিবরণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। এক্ষণে কথা হইতেছে, তবে তিনি কি? কোন্ শ্রেণীর ব্যক্তি? সাধারণ সিদ্ধপুরুষ নহেন। তিনি মনুষ্য হইয়া এত ভাব, এত মত, মনুষ্য যাহা কখনও সাধন করিতে সক্ষম হয় নাই, তাহা আয়ত্ত করিলেন কিরূপে? পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, তোতাপুরী ৪১ বৎসরে কুম্ভকাদি সাধন করিয়া সমাধি প্রাপ্ত হন। পরমহংসদেব তাহা তিন দিনে সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। এ সামান্য রহস্যের কথা নহে! একথা সাধু ব্যতীত কি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী অথবা তৎপল্লিস্থ ব্যক্তির মস্তিষ্কে প্রবেশ করিবে? না আকাট সাম্প্রদায়িক গোঁড়াদিগের বুদ্ধি-বৃত্তি ধারণা করিতে সক্ষম হইবে? হঠযোগের একটী আসনে সিদ্ধ হইতে হইলে ক্লেশের পরিসীমা থাকে না, তাহা যাঁহারা করেন, তাঁহারাই জানেন। প্রাণায়ামের বায়ু ধারণা করিতে কত লোকের কাশ রোগের উৎপত্তি হইয়া গিয়াছে। নেতি ধৌতি প্রক্রিয়ায় অন্ত্ররোগে কত সাধকের জীবনান্ত হইয়া গিয়াছে। এই সকল ক্রিয়ায় সিদ্ধ হইলে, তবে মনঃসংযম হইতে পারে এবং সেই সংযত মন ক্রমে সমাধি প্রাপ্ত হয়। অতএব সমাধি কথাটা কথার কথা নহে। যত প্রকার সাধন আছে, তাহাদের প্রত্যেকটী নিতান্ত ক্লেশকর। সামান্য বর্ণপরিচয় শিক্ষা করিতে কত ক্লেশ, সামান্য অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা

করিতে কত যন্ত্রণা পাইতে হয়, তখন ঈশ্বর সাধনা কি মুখের কথা? না কেবল বিচারের বিষয়?

পরমহংসদেব প্রত্যেক সাধনপ্রণালীতে সিদ্ধ ছিলেন, তাহার আরও প্রমাণ আছে। যে ব্যক্তি যে বিষয়ে বিচক্ষণ, সে ব্যক্তি সেই বিষয়ের উপদেশ এমন সরলভাবে প্রদান করিতে পারেন যে, তাহা পঞ্চম বর্ষীয় বালকেও বুঝিতে পারে এবং যে বিষয়ে যে নিজে অজ্ঞ, সে তাহা কাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেও কিছু বুঝাইতে পারে না। আমি কাশী চক্ষে দেখি নাই। আমার দ্বারা কাশীর বর্ণনা যেরূপ হওয়া সম্ভব, অনভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা উপদেশও তদ্রূপ। পরমহংসদেব গভীর ব্রহ্মতত্ত্ব, চলিতভাবে চলিত রহস্যচ্ছলে বুঝাইয়া দিয়াছেন, এই জন্য তিনি সিদ্ধ ছিলেন। যে ব্যক্তি সর্ব্ব ধর্ম্মে সিদ্ধ, তিনি কে? তাঁহাকে সাধারণ সাধু বলা যায় না। সিদ্ধপুরুষদিগের নিকটে সাধন ভজন আছে। তথায় কেহ শিষ্য হইলে তাহাকে নিয়মিত সাধন ভজন করিতে হয়, কিন্তু পরমহংসদেবের নিকট তাহা ছিল না। সকলকেই বিনা সাধনে ও ভজনে তত্ত্বজ্ঞানী করিতে চাহিতেন কিন্তু কালের বিচিত্র গতি, তাহা সকলের মনোমত হইত না। এমন কি কত লোকের জপের থলি তিনি নিজে কাড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছেন, সহস্রবার বলিয়াছেন, "বিশ্বাস কর, কোন চিন্তা নাই, আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা কখন মিথ্যা হইবার নহে।" তাহারা কোনমতে সে কথা লইল না! পুনরায় সাধন ভজন আরম্ভ করিল। তিনি আক্ষেপ করিয়া কতবার বলিয়াছেন, "গুরু কৃষ্ণ, বৈষ্ণবের তিনের দয়া হলেন, একের দয়া না হ'তে জীব ছারে খারে গেল।" তথাপি তাঁহার কথা লইল না। সময়ে সময়ে বলিতেন, এসে ঠেকেছি যে দায়, সে দায় কব কায়, যার দায় সেই জানে, পর কি জানে পরের দায়।" লোকে বিশ্বাস করিয়াও করিতে পারিল না। যাহারা বিশ্বাস করিয়াছে, অদ্য তাহারা সুখ দুঃখ সমভাবে সহ্য করিয়া যাইতেছে, সম্পদে যেমন বিপদেও তেমন। সম্পদে তাঁহাকে মঙ্গলময় বলিয়া যেমন আনন্দ করিতে পারে, বিপদেও তেমনি তাঁহকে মঙ্গলময়রূপে দর্শন করে। এই বিশ্বাসী ভক্তদিগের সাধন নাই, ভজন নাই তথাপি পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানী। তাঁহার প্রসাদে যাহা হইবার নহে, তাহাও স্বচ্ছন্দে হইয়া গিয়াছে। অতএব তিনি সাধারণ সাধু কিম্বা সিদ্ধ ছিলেন না। সিদ্ধব্যক্তিদিগের নিকট পবিত্রতা সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজন। অপবিত্র কিম্বা দুশ্চরিত্র পাষণ্ডদিগের তথায় গমন করিবার অধিকার নাই।

তথায় কার্য্য এবং অকার্য্য বলিয়া দুইটি তালিকা আছে। কতকগুলি কার্য্য করিলে পুণ্য হয় এবং কতকগুলি কার্য্য দ্বারা পাপ হয়। কতকগুলি কার্য্য নিষেধ এবং কতকগুলি কার্য্য প্রতিপালন করিতে হয়। সকল সম্প্রদায়ে কার্য্যের নিয়ম আছে। পরমহংসদেবের নিকটে তাহাও ছিল এবং তাহার বহির্ভূত ভাবেও কার্য্য হইত। সমাজ ছাড়া, ধর্ম্ম ছাড়া, জ্ঞান ছাড়া, কর্ম্ম ছাড়া পাষণ্ডদিগের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্তের দ্বারা তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব এ প্রকার শক্তি সাধারণ সাধু বা সিদ্ধপুরুষদিগের হইতে পারে না। তাহার দৃষ্টান্তও এ পর্য্যন্ত কেহ প্রাপ্ত হন নাই। সিদ্ধ বা সাধু ব্যক্তিরা যে অন্তর্যামী হইয়া থাকেন তাহার প্রমাণাভাব, কিন্তু তিনি অন্তর্যামী ছিলেন, তাহার পরিচয় অগ্রেই দিয়াছি। তিনি অঘটন সংঘটন করিতে পারিতেন, তাহা ভক্তের বিশ্বাসের জন্য কখন কখন দেখাইয়াছেন, কিন্তু এ প্রকার শক্তি দেখান তাঁহার নিতান্ত অনিচ্ছাক্রমেই হইত।

আমাদের শাস্ত্রে যদিও লিখিত আছে যে, সেকালের মুনি ঋষিরা যোগ বলে ত্রিভুবন দেখিতে পাইতেন। সুতরাং তাহারা প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরের সমাচার প্রাপ্ত হইতে পারিতেন। মুনি ঋষিরা মনুষ্য, অতএব অন্তর্যামী হইলে সিদ্ধ বা সাধু বলা যাইবে না, তাহার হেতু কি? মুনি ঋষিরা সাধন করিয়া সে শক্তি পাইতেন এবং যোগাবলম্বন ব্যতীত সে শক্তি থাকিত না। কিন্তু পরমহংসদেবের ভাব স্বতন্ত্র প্রকার ছিল, তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি সম্বন্ধে যে কয়েকটী দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে যোগাবলম্বন কিম্বা কোন প্রক্রিয়া বিশেষ দ্বারা যে অপরের মনোভাব জ্ঞাত হইতেন, এ প্রকার কোন ঘটনা প্রকাশ নাই। এই নিমিত্ত তাঁহাকে সাধারণ সিদ্ধ শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। যদিও কেহ কেহ বলেন যে, সিদ্ধপুরুষেরা মনের কথা বলিতে পারেন, তাহা স্বীকার করিলেও, সকল শক্তির সমষ্টি ধরিলে মিলিবে না। সিদ্ধ ব্যক্তিদিগের যে সকল শিষ্য থাকে, তাহারা স্থানান্তরে ইচ্ছা করিলে গুরুর সাক্ষাৎকার পাইতে পারে না। এ প্রকার প্রবাদ আছে যে, কোন কোন শিষ্য ভক্তির জোরে গুরুর দর্শন পাইয়াছেন। সে ক্ষেত্রে ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার গুরু সে বিষয় কিছুই জানিতে পারেন নাই। ভগবান্ গুরুর কার্য্য সম্পন্ন করেন। পরমহংসদেবের তাহা ছিল না। তিনি কখন ঢাকায় যাইয়া বিজয় বাবুর সম্মুখে বসিয়াছেন, আবার কখন রানিগঞ্জের পাহাড়ে বিষ্ণুর নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন। কখন

বলিতেন যে, "আমি স্বপ্নে দেখি যে, কত সাধু ভক্ত আমার নিকটে আসে।" আবার সাধু ভক্তেরা কহিতেন যে, "পরমহংসদেব আমাদের নিকটে সর্ব্বদাই আগমন করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিয়া যান।" তাঁহার সেই চৌদ্দপোয়া দেহটী একস্থানে রাখিয়া এক সময় চারিদিকে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন, ইহা সাধারণ সিদ্ধ ব্যক্তির শক্তিতে সঙ্কুলান হয় না।

সিদ্ধব্যক্তিরা ঈশ্বরের ঐশ্বরিক শক্তি কিঞ্চিৎ লাভ করেন বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে সেই শক্তির বিকাশ কখন কখন দেখা যায়। কিন্তু তাঁহাদের ভিতর দিয়া যে শক্তির কার্য্য হয়, তাহা হইতে পরমহংসদেবের শক্তির কার্য্য স্বতন্ত্র প্রকার। সিদ্ধ ব্যক্তির নিকটে যে যাহা প্রার্থনা করে, তিনি প্রসন্ন হইলে নিজ ক্ষমতানুসারে তাহা সম্পূর্ণ করিতে পারেন। যেমন, কেহ পুত্রার্থী হইলে পুত্র পায়, ধন চাহিলে ধন পায় এবং সাধন ভজন করিতে চাহিলে, তাহাও পাইয়া থাকে। কিন্তু এক সময়ে ঐশ্বর্য্য এবং সাধন তাঁহারা প্রদান করিতে পারেন না। পরমহংসদেবের সে শক্তি ছিল। এই মর্ম্মে একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে নেপালের রাজপ্রতিনিধি বিশ্বনাথের কথা উল্লেখকালীন বলা হইয়াছে যে, তিনি সর্ব্বপ্রথমে ঘুসুড়ীর শালকাষ্ঠের কারখানায় গোমস্তাবিশেষ ছিলেন। পরমহংসদেবের নিকট যখন যাতায়াত করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহাকে তহবিল তছরূপ অপরাধে নেপালদরবারে হাজির হইবার জন্য আজ্ঞা করা হইয়াছিল। উপাধ্যায়ের মস্তকে এই সংবাদ অশনিপতনপ্রায় বোধ হইল। তিনি স্পষ্ট বুঝিলেন যে, তাঁহার সর্ব্বনাশ উপস্থিত। কি করিবেন কোথায় যাইবেন, ইতস্ততঃ চিন্তা করিয়া তিনি পরমহংসদেবের শরণাপন্ন হইলেন এবং চরণে পতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। পরমহংসদেবের দয়া হইল। তিনি বলিলেন, "কালীর ইচ্ছায় আবার তুমি আসিবে।" তিনি কখন নিজ শক্তি দেখাইতেন না। বিশ্বনাথ নেপালে যাইয়া এমন হিসাব নিকাশ দিয়াছিলেন যে, তিনি পুনরায় রাজপ্রতিনিধি হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন, উপাধ্যায় ছিলেন রাখাল, হ'লেন রাজা, কিন্তু তিনি বিষয়ে লিপ্ত হইয়াও নিতান্ত ধর্ম্মপরায়ন ছিলেন। এই প্রকার দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি আছে, তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি করা নিষ্প্রয়োজন। এ প্রকার শক্তি কি সাধারণ সিদ্ধপুরুষে সম্ভবে?

সিদ্ধপুরুষেরা মনে করিলেই লোকের মন পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়া তাহাকে একেবারে অন্য প্রকার ছাঁচে ঢালিয়া নূতন গঠন দিতে পারেন না, এ কথা

অস্বীকার করে কে? সিদ্ধপুরুষেরা আপন ভাবে, বোধ হয়, চেষ্টা করিলে, আর একজনকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারেন, কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিকে নূতন নূতন ভাবে রঞ্জিত করা তাঁহাদের শক্তির বহির্ভূত কথা। পরমহংসদেবের সে শক্তি ছিল। সেই জন্য তাঁহাকে সাধারণ সিদ্ধপুরুষ বলিলে অযৌক্তিক কথা বলা হইবে। তর্কচ্ছলে সিদ্ধপুরুষদিগের এই সকল শক্তি স্বীকার করিলেও সে কথা আমাদের হিসবের বাহিরে যাইতেছে। কোন্ সিদ্ধপুরুষ দুঃখী তাপী পাপীর জন্য চিন্তিত হইয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেছেন? কোন্ সিদ্ধপুরুষ অজ্ঞান ভবঘোরাক্রান্ত নরনারীর জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়া দিবার জন্য আপন ইচ্ছায়, অনুসন্ধান করিয়া, তাহার বাটীতে যাইয়া কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন? কোন্ সাধুর প্রাণ অনাথ অনাথিনীর জন্য কাঁদে? পামর দুশ্চরিত্র ব্যক্তিদিগের তাড়না অঙ্গের ভূষণ স্বরূপ জ্ঞান করিয়া—তাহারা বাটীতে যাইতে দিবে না, পবিত্রতা লইবে না—তথাপি জোর করিয়া, কোন্ সাধু যাইয়া কৃতার্থ করিয়া থাকেন? যিনি সিদ্ধ তিনি সিদ্ধ, তাহাতে তোমার আমার কি? যে ধনী, সে আপনার বাটীতে বড়, তাহাতে কি আমার উদর পূর্ণ হইবে? কিন্তু যে ব্যক্তি মুক্তহস্ত হইয়া দীন দরিদ্রের দুঃখমোচন করিবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকেন, তাঁহাকেই দাতা বলে। তিনিই লোকের উপকারী বন্ধু, তিনিই প্রকৃত ধনী।

পরমহংসদেব নিজে যে সাধনকষ্ট পাইয়াছেন, তিনি তাহার পুরস্কার কত পাইয়াছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণের দশ হাজার, মথুর বাবুর পঞ্চাশ হাজার, অন্ততঃ এ সকল টাকায় তিনি কত সুখ সম্ভোগ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া অতি সামান্য ভাবে থাকিয়া সাধারণের হিতসাধনেই জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এ প্রকার সাধু বা সিদ্ধ কস্মিন্ কালে কেহ আসেন নাই। অতএব পরমহংসদেব কোন শ্রেণীর ব্যক্তি? গৌরাঙ্গ প্রভৃতি অবতারদিগের যেরূপ স্বভাব ছিল, পরমহংসদেবের স্বভাব প্রায় সেই প্রকার ছিল। গৌরাঙ্গদেব যেমন জীবের দুঃখে সর্ব্বদাই কাতর থাকিতেন, পরমহংসদেব সে সম্বন্ধে তাঁহা অপেক্ষা কোনমতে কম ছিলেন না। জগাই মাধাই কর্ত্তৃক গৌরাঙ্গদেব যে প্রকার উৎপীড়িত হইয়াছিলেন, পরমহংসদেব সে বিষয়ে নিতান্ত অব্যাহতি পান নাই। গৌরাঙ্গদেব বিদ্যাবলে সার্ব্বভৌম প্রভৃতি পণ্ডিতদিগকে পরাস্ত করিয়া মহিমা বিস্তার করিয়াছিলেন, পরমহংসদেব নিরক্ষর হইয়া কেশব সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, প্রোফেসার মহেন্দ্রনাথ

গুপ্ত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী যুবকদিগকে বিচারবলে পরাজয় করিয়া গিয়াছেন। গৌরাঙ্গদেব অলৌকিক কার্য্য দ্বারা অবিশ্বাসীর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। পরমহংসদেবের সে শক্তির ভূরি ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে। গৌরাঙ্গদেব ষড়্ভুজাদি দেখাইয়াছিলেন, পরমহংসদেব মথুর বাবুকে কালী-রূপে এবং অন্যান্য ব্যক্তিকে অন্যরূপে দেখা দিয়াছেন। এই সকল লক্ষণের সহিত উভয়ের সাদৃশ্য দেখিয়া সকলেই তাঁহাদের এক শ্রেণীতে আবদ্ধ করিতে চাহেন। মোট কথা, অবতারদিগের যে সকল লক্ষণ যথা;—১ম জীবে দয়া, ২য় সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান, ৩য় পতিত ব্যক্তির উদ্ধারকর্ত্তা, ৪র্থ ধর্ম্মের সামঞ্জস্য-ভাব, ৫ম পরম বৈরাগী, ৬ষ্ঠ জৈবধর্ম্মবিবর্জ্জিত, ৭ম অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন, ৮ম আদিষ্ট ধর্ম্মের নূতন ভাব, ৯ম অবতারদিগের নিকটে কর্ম্ম থাকে না; পরমহংসদেবের এ সকল লক্ষণই ছিল। এইজন্য তিনি অবতার শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া দেখা যাইতেছে।

এক্ষণে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, আমাদের শাস্ত্রের দ্বারা এই অবতারের প্রমাণ করা যায় কি না।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া, কিরূপে মানবগণ সংসারে থাকিয়া যোগ, ভোগ এককালীন সাধন করিতে পারিবে, তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত আপনি দেখাইয়া গিয়াছেন। সংসারে থাকিতে হইলে ভাব আশ্রয় ব্যতীত কেহ বাঁচিতে পারে না। সেইজন্য তিনি বৃন্দাবনে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরাদি পঞ্চবিধ ভাবের পূর্ণ ভোগ এবং তাহা হইতে এককালে বিরত হইয়া মথুরাদি স্থানে লীলাবিস্তারকালীন যোগ বা বৈরাগ্য ভাবের পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় কার্য্য এইরূপ যোগ ভোগের দৃষ্টান্ত-স্থল। আপনি যদুবংশ বিস্তার করিয়া তাহা নিজ কৌশলে সংহার করিয়া-ছেন। কুরুপাণ্ডবদিগের যুদ্ধে উভয়কুল নির্ম্মূল হইবে জানিয়াও অর্জ্জুনকে তত্ত্বোপদেশ প্রদান পূর্ব্বক তাহাতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অবতারের পূর্ব্বোক্ত ভাবের কার্য্য দেখিয়া লোকে তাঁহাকে পূর্ণাবতার বলিয়া থাকে। কেবল যোগ ভোগের নিমিত্ত যে তাঁহাকে পূর্ণাবতার কহা যায়, তাহা নহে। তাঁহাকে যে কেহ যে কোন ভাবে, যে কোন নামে ডাকিবে, সেই সাধকদিগের সেই ভাবে ও সেই নামে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। ইহাতেই পূর্ণ ভাবের আভাস পাওয়া যাইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ সংসারে থাকিয়া বৈরাগ্য শিক্ষা যে সুন্দররূপে দিয়া গিয়াছেন,

তাহা গীতায় প্রকাশ রহিয়াছে। শরীর সম্বন্ধে ভোগ অর্থাৎ পরস্পর সম্বন্ধ-বিশেষে কার্য্য করা দেহের ধর্ম্ম এবং ভগবানে যোগ, তাহা মনের কর্ম্ম। অর্থাৎ মনে ঈশ্বর,দেহে সংসার, ইহাকেই পরমহংসদেব নির্লিপ্তভাব কহিতেন। তাহার দৃষ্টান্ত যেমন, "বাটীর পরিচারিণী। গৃহস্থের সকল কাজ কর্ম্ম সে আপনার ন্যায় সমাধা করে, সন্তানাদিকে স্নেহ ও যত্ন করে, মরিয়া গেলে কাঁদে, কিন্তু মনে জানে যে, এরা তাহার কেহ নহে। তাহার দেশ, ঘর, বাড়ী, ছেলে পুলে স্বতন্ত্র আছে।"

শ্রীকৃষ্ণ যোগ ভোগ শিক্ষা দিয়া সরাট এবং বিরাট রূপ দেখাইয়া পরে বলিয়াছিলেন, "যে আমায় যেরূপে উপাসনা করে, আমি তাহার মনোরথ সেইরূপে পূর্ণ করিয়া থাকি। হে অর্জ্জুন! পৃথিবীর লোকেরা যদিও নানা মতাবলম্বী, কিন্তু তাহারা আমারই উপাসনা করিতেছে।"

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিলেন, তাহা তিনি কার্য্য করিয়া দেখাইলেন না, কারণ তখন তাহার সময় উপস্থিত হয় নাই। বহু মত, বহু ভাব, বহু সম্প্রদায় না হইলে, ওকথার প্রয়োজন হইবে না। কিন্তু তাহার প্রয়োজন হইবে জানিয়া তিনি প্রস্তাবনা করিয়া গিয়াছিলেন। প্রস্তাবনা না করিলে তাহা এক্ষণে লোকের বুঝিবার পক্ষে গোলযোগ হইত। সে সময়ে শ্রীকৃষ্ণ একথা না বলিলে আজ কি আমরা পরমহংসদেবের ভাব অনুধাবন করিতে পারিতাম?

কৃষ্ণাবতারের পর গৌরাঙ্গ অবতার। কৃষ্ণাবতারে যাহা বিশেষ করিয়া জীবের শিক্ষা হেতু প্রদান করেন নাই, তাহা অভিনয় করাই তাঁহার অবতীর্ণ হইবার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমতঃ তিনি সাধক হইয়া কিরূপে নাম সাধন করিতে হয় এবং তাহার ফলই বা কিরূপ, তাহাই শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট জাতিভেদ, মান অপমান, ধনী নির্ধনী, সকলই সমান, তাহারও ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। অবতারের নিকট সাধন ভজন করিতে হয় না। একবার যে ভাগ্যবান্ তাঁহার সাক্ষাৎ পায়, তাহার সকল বিষয়ই সিদ্ধ হইয়া যায়। গৌরাঙ্গ-লীলায় তাহার সবিশেষ প্রমাণ প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে। তিনি অদ্বৈত, চৈতন্য ও নিত্যানন্দ, এই তিন রূপে মানবদিগের আধ্যাত্মিকতত্ত্বের শিক্ষা বিধান করিয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ সাধকদিগের প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে যে যে অবস্থার প্রয়োজন, তাহা উপরোক্ত রূপত্রয় দ্বারা সাব্যস্ত হইতেছে। জীব, একমেবাদ্বিতীয়ং, অর্থাৎ

দ্বৈতভাব বিরহিত হইলে, তাহার তখন সর্ব্বত্র চৈতন্যোদয় হইয়া থাকে। সর্ব্বচৈতন্যময় যাঁহার বোধ হয়, তিনিই তখন নিত্য বস্তু লাভ করেন, সুতরাং নিত্য আনন্দ তাঁহারই সঞ্চারিত হইয়া থাকে। শ্রীগৌরাঙ্গদেব, নামের মহিমা, জাতিভেদ চূর্ণ করিয়া সর্ব্বজীবে সম দয়া দ্বারা প্রেমের অপূর্ব্ব ভাব, অপবিত্র, পতিত, পাপপরায়ণ এবং পূর্ণ পাপিষ্ঠদিগকে উদ্ধার করিয়া পতিতপাবন নাম এবং অদ্বৈত, চৈতন্য ও নিত্যানন্দ দ্বারা জীবের আধ্যাত্মিক-ভাব প্রচার করিয়া গিয়াছেন। যেমন বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি দ্বারা ব্রহ্ম এবং হ্লাদিনী শক্তির কার্য্যের ভাব দেখাইয়াছেন, অর্থাৎ তথায় আনন্দ ব্যতীত আর কিছুই নাই, সখীদিগের কার্য্য দ্বারা মনোবৃত্তিদিগের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, সেইরূপ ঐ তিন রূপে জীবগণের তিনটী ভাবের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। জীবের যে পর্য্যন্ত অদ্বৈত জ্ঞান লাভ না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহাদের চৈতন্যোদয় হইতে পারে না। অদ্বৈত জ্ঞান হইলে সে ব্যক্তির তখন সর্ব্বত্রে চৈতন্য স্ফূর্ত্তি পায়, অর্থাৎ "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে"। যাঁহার সর্ব্বচৈতন্যজ্ঞান হয়, তাঁহার সুতরাং নিত্য আনন্দ সর্ব্বদাই সম্ভোগ হইয়া থাকে, নিত্যানন্দ দ্বারা জীবের এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু এতদ্ব্যতীত আর যে সকল ভাব অবশিষ্ট ছিল, তাহা তিনি তৎকালে প্রকাশ করা কর্ত্তব্য বোধ না করিয়া, পুনরায় দুই বার আসিবেন, এই প্রকার স্পষ্ট আভাস দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কিরূপে এবং কোন্ সময়ে, তাহার কোন বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

পরমহংসদেব নূতন দুইটী ভাব সম্পূর্ণ করিয়াছেন। গীতার "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে" শ্লোকটীর তাৎপর্য্য তিনি আপনি সাধন করিয়া এই বর্ত্তমান ধর্ম্ম-প্রলয় কালের শান্তিবিধান করিবার উপায় করিয়া গিয়াছেন। তিনি কহিয়াছেন, "যেমন কোন পুষ্করিণীর চারিটী ঘাট আছে, এক ঘাটে হিন্দু, এক ঘাটে মুসলমান, অপর ঘাটে অপর ব্যক্তিরা জল পান করিতেছে। এক জলাশয়ের ৪টী ঘাট, এই নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন ঘাটে জল পান করিলেও কাহারও দোষ হইতেছে না, কিম্বা কাহারও পিপাসা নিবারণের ব্যতিক্রম হইতেছে না। অথবা গঙ্গায় কত বিভিন্ন জাতি স্নান করিতেছে, জল পান করিতেছে, তাহাদের ইচ্ছামত ঘাটও নির্ম্মাণ করিতেছে। হিন্দুর ঘাট, মুসলমানের ঘাট, সাহেবদের ঘাট প্রভৃতি কত ঘাট রহিয়াছে, কিন্তু তাহাতে এক অদ্বিতীয় গঙ্গার কি পরিবর্ত্তন হয়? হিন্দু দেখে পতিতপাবনী গঙ্গা, তাঁহাদের প্রাণ মন সেই ভাবে

বিভোর হইয়া যায়, অন্য জাতিতে দেখে সুন্দর নদী, তাঁহাদের সেই ভাবে আনন্দ হয়। অতএব এক পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভিন্ন প্রকার কার্য্য হয়।" যদিও ইতিপূর্ব্বে কোন কোন শাস্ত্রে এবং আধুনিক রামপ্রসাদ, তুলসীদাস ও কমলাকান্ত প্রভৃতি সাধকগণ, সকলই একের কার্য্য বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু গীতার ভাব ঠিক তাহা নহে। গীতার প্রকৃত ভাব পরমহংসদেবের পূর্ব্বে কোন ঋষি মুনিও তাহা জানিতেন কি না, সন্দেহের বিষয়। তাহা হইলে, তাহার কার্য্য হইতে দেখা যাইত। পরমহংসদেব, যেরূপে গীতার পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের শিক্ষা দিয়াছেন, সে প্রকার কার্য্য হইলে কি আজ এ দেশে ঘরে ঘরে স্বতন্ত্র ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়া পরস্পর কলহ ও বিবাদ হইতে পারিত? পরমহংসদেব প্রদর্শিত ভাবটী কার্য্যে পরিণত হইতে যে কত দিন লাগিবে, তাহা এখন বলা যায় না, কারণ তাঁহারই শিষ্যবৃন্দের মধ্যে অদ্যাপি অনেকেই তাহার মর্ম্ম সম্যকরূপে আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহারা এখন যে যাঁহার মতে সাধন করিতেছেন, তাহাতে সিদ্ধ হইলে, এই ভাবে রঞ্জিত হইবেন। এ কথা আমাদের নিজের দৃষ্টান্ত দ্বারা সিদ্ধান্ত করিলাম। কথিত রামপ্রসাদ প্রভৃতি সিদ্ধপুরুষেরা, সকল মূর্ত্তি ও ভাব একের স্বীকার করিয়া আপনাপন ভাবে পর্য্যবসিত করিয়া গিয়াছেন। সিদ্ধপুরুষদিগের নিকট ইহার অতীত কিছুই প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। রামপ্রসাদ কহিয়াছেন, "কালী হ'লি মা রাসবিহারী নটবর বেশে বৃন্দাবনে" ইত্যাদি। এ স্থানে কালীতে অর্থাৎ প্রসাদের নিজ ভাব দ্বারা কৃষ্ণকে দেখিতেছেন। যেমন আমার ঘাট যে পুষ্করিণীতে, সেই পুষ্করিণীতে জলপান করিতেছে; কিন্তু গীতার ভাব তাহা নহে। কারণ ঘাট হইতে পুষ্করিণী হয় না, পুষ্করিণী হইতে অনন্ত ঘাটের উৎপত্তি হইতে পারে। কালী হইতে কৃষ্ণ নহেন, শিব নহেন, রাম নহেন। কারণ কালী বলিলে ভাববিশেষ বুঝায়। আদি শক্তি পুষ্করিণী-বিশেষ। অনন্ত রূপাদি বা ভাব, ঘাটের ন্যায় বুঝিতে হইবে। অথবা যেমন সূর্য্য এক মধ্যবিন্দু। তাহার রশ্মিছটা ঐ বিন্দু হইতে পরিধি পর্য্যন্ত সরল-রেখাবিশেষ। এই পরিধি বিন্দু হইতে সরল-রেখা দ্বারা সূর্য্য দেখা যায় বটে, কিন্তু তাই বলিয়া পরিধির বিন্দু অপর বিন্দুর উৎপত্তির কারণ বলা যাইতে পারে না। সূর্য্য হইতে সকল বিন্দুর উৎপত্তি হয়। এই জন্য সকল বিন্দুই সত্য। যেমন, "গঙ্গার ঢেউ হয়, ঢেউয়ের গঙ্গা হয় না," কিম্বা মাতা হইতে সন্তান জন্মে, সন্তান হইতে পিতামাতার উৎপত্তি হয় না, সেইরূপ এক আদি

স্থান হইতে সকল ভাব ও রূপাদি জন্মিয়া থাকে, ভাব বা রূপাদি হইতে অন্য ভাব বা রূপাদি হয় না। যেমন মাটি হইতে বাসন প্রস্তুত করা হয়। মৃন্ময় পাত্রবিশেষ অন্যান্য পাত্রের আদি কারণ নহে।

যে সকল দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল, ইহার দ্বারা পরমহংসদেব এই দেখাইয়াছেন যে, ভাবটী স্বতন্ত্র, কিন্তু যাহা হইতে ভাবের উৎপত্তি হয়, তাহা স্বতন্ত্র নহে। তেমনি, যিনি কালী, তিনি শিব, তিনিই রাম বটেন। কিন্তু কালী শিব, রাম এক বলিলে ভাবের ভুল হয়। এই নিমিত্ত রামপ্রসাদের "কালী হ'লি মা রাসবিহারী" কথার ভাবে দোষ ঘটিয়াছে। যেমন এক স্বর্ণ হইতে নানাবিধ অলঙ্কার প্রস্তুত হয়। যতগুলি যে ভাবের অলঙ্কার হউক না কেন, উপাদান কারণ স্বর্ণের তারতম্য হয় না। এস্থলে এক সোনা সকল অলঙ্কারের আদি কারণ, কিন্তু কর্ণাভরণ কণ্ঠাভরণের উৎপত্তির কারণ বলিলে ভাবের ভুল হয়। তেমনি তুলসীদাসের কথায় দেখা যায়, "ওই রাম দশরথকি বেটা, ওই রাম ঘট ঘটমে লেটা, ওই রাম জগৎপসেরা, ওই রাম সব্‌সে নেহারা।" তুলসীদাস এস্থলে দশরথাত্মজ রামকে সর্ব্বত্র দেখিতেছেন। ফলে, কর্ণাভরণকে কণ্ঠাভরণ কহার ন্যায় হইতেছে। যদ্যপি একথা বলা হয় যে, আদি কারণ ধরিয়া তাঁহারা কহিয়াছেন, তাহা হইলে দশরথাত্মজ শব্দ প্রয়োগ করায় ভাবের দোষ ঘটিয়া গিয়াছে। দশরথাত্মজ পরিধির বিন্দু-বিশেষ, তাহা মধ্যবিন্দু সূর্য্যস্বরূপ নহে। পরমহংসদেবের ভাব এই জন্য বলিতে হইতেছে, গীতার ভাবের সহিত সম্পূর্ণ ঐক্য হইয়াছে। এই ভাবটী সেইজন্য একটী নূতন, সুতরাং তিনি অবতার।

দ্বিতীয় নূতন ভাব এই যে, তিনি একাধারে অদ্বৈত, চৈতন্য এবং নিত্যা-নন্দের ভাব দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি নিজে সর্ব্বত্রে এক দেখিতেন, এক জানিতেন এবং এক ভাবেই কার্য্য করিতেন। তাঁহার উপদেশ এই যে, "অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তাই কর।" অর্থাৎ সাধনই কর আর ভজনই কর, যে পর্য্যন্ত অদ্বৈত জ্ঞান লাভ না হইবে, সে পর্য্যন্ত কোন কার্য্যই হইবে না, প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইবার পক্ষে বিঘ্ন ঘটিবে। ঈশ্বর এক এবং তিনিই বহু, এ জ্ঞান না থাকার নিমিত্ত, আমাদের দেশে এত দলা-দলি ও দ্বেষাদ্বেষী জন্মিয়াছে। কিন্তু পরমহংসদেব কি বলিয়াছেন? যেমন ক'রে ইচ্ছা ধর্ম্ম সাধন কর, যেমন ভাবে হউক, যেমন রূপেই হউক, এক ঈশ্বর জ্ঞান করিয়া যেউপাসনা করে, তাহার উপাসনাই প্রকৃত উপাসনা। তিনি

এই নিমিত্ত বলিতেন, এক জ্ঞান অর্থাৎ এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই, এই জ্ঞানকে প্রকৃত জ্ঞান এবং যে স্থানে বহু জ্ঞান থাকিবে, সে স্থানে অজ্ঞান কহিতে হইবে। যেমন আলোক দেখিলে এক সূর্য্যেরই জ্ঞান হয়, তেমনি বহু জ্ঞান থাকিলেও এক জ্ঞানে তাহা পর্য্যবসিত করা উচিত। ঈশ্বরতত্ত্ব লাভ করিতে হইলে যাহাতে অদ্বৈত জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। যে পর্য্যন্ত "একমেবাদ্বিতীয়ং" জ্ঞান ধারণা না হয়, সে পর্য্যন্ত তত্ত্ববোধ হইতে পারে না। একের দৃষ্টান্তে, তিনি এই নিমিত্ত কহিতেন, মনুষ্যজাতি এক, জল সর্ব্বত্রে এক, বায়ু সর্ব্বত্রে এক, সোনা, রূপা, লৌহ, সর্ব্বত্রে এক। একের বহু, যথা, মনুষ্যজাতি এক হইয়াও কেহ কাহারও সহিত সমান নহে। এক মাতৃগর্ভের দুইটী সহোদর এক প্রকার নহে। জল এক জাতি, কিন্তু বরফ বাষ্প এক প্রকার নহে। পাতকোয়া, খাত, নদী, সমুদ্র এক প্রকার নহে। সেইরূপ ধর্ম্মও এক, কিন্তু আধারবিশেষে রূপান্তর দেখায় মাত্র। অতএব যাহার অদ্বৈত জ্ঞান থাকিবে, সে কখন ধর্ম্মের ভাল মন্দ বিচার করিতে পারিবে না।

ধর্ম্ম যদ্যপি এক হয়, তাহা হইলে যে যাহা করিবে, সে তাহার আপন অবস্থানুসারে পরিচালিত হইবে। সে অবস্থা পরিবর্ত্তন করিবার কাহারও অধিকার কিম্বা সাধ্য নাই। তাহার দৃষ্টান্ত, আজ শতাধিক বৎসর অতীত হইল, খৃষ্টানেরা এদেশে ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু হিসাব করিয়া দেখা যাউক, কয়জনকে খৃষ্টান করিতে পারিয়াছেন? যাঁহারা ধর্ম্মত্যাগ করিয়াছেন বা করিতেছেন, তাঁহাদের কিছুই ধর্ম্ম জ্ঞান ছিল না। এরূপ ভাবে প্রচার না করিয়া যদ্যপি খৃষ্টানেরা ধর্ম্মের প্রকৃত অর্থ বুঝাইবার চেষ্টা পাইতেন, তাহা হইলে বাস্তবিক কার্য্য হইত। কিন্তু সে ভাব পাইবেন কোথায়? পরমহংসদেব যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, তাহার দ্বারা কাহার না প্রাণ উত্তেজিত হয়? কাহার মস্তক না তাঁহার চরণতলে যাইয়া আপনি পতিত হয়? এক ঈশ্বরের শক্তিবিশেষ জ্ঞান করিয়া যে যাহা করিবে, তাহাতেই তাহার পরিত্রাণ হইবে। তিনি এপর্য্যন্ত বলিয়া দিয়াছেন যে, যদিই ভাবে কোন প্রকার দোষ থাকে, তাহা অকপট এবং সরলতায় পূর্ণ থাকিলে ভগবান্ নিজে তাহা সংশোধন করিয়া লইবেন। কারণ, তিনি সৎ অসৎ নহেন, তিনি অন্তর্যামী, সুতরাং মনের ভাব লইয়া তাঁহার কার্য্য। "ভাবের ঘরে চুরি" না থাকিলে ঈশ্বর প্রাপ্তির কোন ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে না।

তিনি সর্ব্বত্র চৈতন্যময় দেখিতেন। তাহা তাঁহার সাধন বর্ণনাকালীন বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহাকে যে যখন যেমন অবস্থায় দেখিয়াছেন, আনন্দবিরহিত বলিয়া কখন দেখা যায় নাই। তবে সাধকাবস্থায় কিম্বা অন্য কোন সময়ে যদিও সাময়িক ভাবান্তর দেখাইয়াছেন, তাহা জীবশিক্ষার্থ লীলা-বিশেষ।

পরমহংসদেব পূর্ব্বাবতারের অসম্পূর্ণ ভাব সকল সম্পূর্ণ করিয়া তাঁহার নিজের শক্তিও দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি কহিয়াছেন, "যে কেহ এস্থানে কিসে ঈশ্বরকে জানিব, কিসে তত্ত্বজ্ঞান হইবে, এই উদ্দেশ্যে আসিবে, তাহারই মনোরথ পূর্ণ হইবে।" এ কথা স্বয়ং পরিত্রাতা ভিন্ন অন্য কাহারও বলিবার অধিকার নাই। মহাসিদ্ধাবস্থায় উপনীত হইয়াও আপনাকে কেহ কখন আর একজনের জন্য দায়ী করিতে পারেন না। পাপীর পাপ লইয়া এক ভগবান্ ভিন্ন জীবকে পরিত্রাণ করিতে কে পারেন? অবতারেরা এক জাতি। তাঁহারা যে দেশে যেরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদের-কার্য্যধারা যেন সকলেরই এক প্রকার। যীশু যেমন পাপাদিগের পরিত্রাণের জন্য আপনার শোণিত দান করিয়াছিলেন, পরমহংসদেবের ব্যাধি অবিকল তদনুরূপ। ইহা তাঁহার শ্রীমুখের কথা।

পরমহংসদেব যে সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সে সময়টীকে বাস্তবিক ধর্ম্ম-বিপ্লব কাল কহা যায়। ধর্ম্ম কোথায়? কোন্ সম্প্রদায়ে পূর্ণ ধর্ম্মভাব আছে? যে সম্প্রদায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, তাহাদের অধিকাংশ ব্যক্তিকে প্রকৃত ব্যবসাদার ব্যতীত অন্য নামে উল্লেখ করা যায় না। তাঁহারা নিজে ধর্ম্মের বর্ণমালা কণ্ঠস্থও করিতে পারেন নাই, তাঁহারা দেশের জন্য ব্যতিব্যস্ত! আমরা নানা স্থানে দেখিয়াছি, তাঁহারা উপাসনা করেন ভ্রাতা ভগিনীর জন্য, দেশ বিদেশস্থ ছোট বড় নরনারীর জন্য, কিন্তু আপনি পরক্ষণেই ভিক্ষাপ্রাপ্তির নিমিত্ত হাত পাতিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন। এ সকল অধর্ম্মের ভাব। নিজে অসিদ্ধ, নিজে মূর্খ, অপরকে সিদ্ধ করিবার জন্য, অপরকে পণ্ডিত করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করা হইতেছে, ইহার অর্থ কি?

এইস্থানে আমাদের স্ব-সম্পর্কীয় সাধারণ হিন্দুদিগকে দু'কথা বলিয়া এই গ্রন্থ পরিসমাপ্তি করিব। কারণ আপনারা নিজে দৃষ্টান্তস্বরূপ না গঠিত হইতে পারিলে, অপরকে তাহা বলা বিড়ম্বনা মাত্র।

আমাদের ত কথাই নাই, পুরাতন বনিয়াদি পরিবার দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলে যেমন হয়, আমরা তদ্রূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছি অর্থাৎ বিষ নাই, কুলোপনা চক্র।

হিন্দুর আচারভ্রষ্ট, ব্যবহারভ্রষ্ট, ভাবভ্রষ্ট ও কার্য্যভ্রষ্ট হইয়া পুরাতন কথাগুলি লইয়া মস্তক নাড়িয়া আস্ফালন করিয়া থাকি। অবসর, সুবিধা এবং স্বার্থ হিসাবে আপনাকে তদনুরূপ পরিচয় দেওয়া বর্ত্তমান হিন্দুদিগের স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আপনাতে আর্য্যের এক পরমাণু লক্ষণ নাই, আর্য্য আর্য্য করিয়া মেদিনী বিকম্পিত করা হইতেছে। যাহা হইবার নহে, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত গলাবাজী কিম্বা কলমবাজী করা যারপরনাই মূর্খতার কার্য্য, তাহাও হইতেছে। ধর্ম্মের উদ্দেশ্য এ কালে আর নাই বলিলে প্রকৃত কথা বলা হয়। বাহ্যিক ধূমধামই হ'ল কাল ধর্ম্ম। বক্তৃতা, ভোজন, বস্ত্রদান, পয়সা দিয়া বক্তা আনয়ন, ধর্ম্মের চূড়ান্ত হইয়া গেল। হরিসভাগুলি এই মর্ম্মে সংগঠিত হইয়াছে। বিলাতী ঢংএ ব্রাহ্মসমাজ গঠিত হয়, তাহার নকল হরিসভা। হিন্দুদিগের কোন্ শাস্ত্রে কোন্ কালে সভা ছিল? সভা থাকিবে কি? সর্ম্ম সাধন করা ত দেখাইবার নহে, তাহা প্রাণের কথা, সময়ের নিয়মাধীন নহে। গৌরাঙ্গদেব সভার আভাস দেন নাই। তিনি নামসঙ্কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাই হউক। বক্তৃতা কেন? এ ইংরাজী ঢং হরিসভায় না প্রকাশ করাইলে কি চলিত না? আমরা দেখিয়াছি যে, বারো বৎসরের শিশু কোন হরিসভায় বক্তৃতা করিয়াছে। সে দুগ্ধপোষ্য বালক, আজও স্কুলে পাঠ করিতেছে। ধর্ম্মের মর্ম্ম হয় ত তাহার পিতামহ আজও বুঝেন নাই, সে বালক বক্তৃতা দিল, হরিনামের মহিমা বিস্তার করিল, চতুর্দ্দিকের করতালীতে তাহাকে মাতাইয়া তুলিল!

বিদ্যালয়ে গমন পূর্ব্বক বিদ্যাভাস না করিয়া কেহ কি কখন সভায় গমন করিতে পারেন? না তথায় কোন বিষয়ের মতামত প্রকাশ করিবার অধিকার হয়? ধর্ম্মসভাদিও তদ্রূপ। ধর্ম্ম শিক্ষা কর, ধর্ম্ম কি জান, তাহার পর বাহ্যিক আড়ম্বর করিতে যদি ভাল লাগে, ত করিও, বৃথা সময় অতিবাহিত করা কর্ত্তব্য নহে। দিন দিন গণা দিন কমিতেছে। যাইতে হইবে। কোন সময়ে, কখন, তাহার স্থিরতা নাই। জীবন-খাতা খানা একবার খুলিয়া দেখ, কোন খাতায় কত জমা এবং খরচের খাতায়ই বা কি লিখিত হইতেছে। বাল্যকাল খেলাধূলায়, কৈশোর অর্থকরীবিদ্যোপার্জ্জনে, যৌবন রসক্রীড়ায়, প্রৌঢ়াবস্থা সন্তানসন্ততির পরিণাম চিন্তায় এবং অর্থোপার্জ্জনের গোলযোগে কাটিয়া গেল, পরে বার্দ্ধক্য—তখন সকল শক্তি ফুরাইয়া আসিল! ব্যাধি দুশ্চিন্তা প্রভৃতি নানা উপদ্রব আসিয়া জুটিল! তখন উপায় কি

হইবে ভাবিয়া যে আর কূল কিনারা দেখা যায় না। কিন্তু আমাদিগের ধর্ম্মের জন্য চিন্তা কি? আমরা ইচ্ছা করিয়া আপনারা ক্লেশ পাইব, ইচ্ছা করিয়া ভাব বিকৃত করিব, ইচ্ছা করিয়া বাহিরের লোকের নিকট উপদেশ লইব, তাহাতে কষ্ট না হইয়া আর কি হইবে? প্রত্যেক পরিবারের কুলগুরু আছেন, বিশ্বাস করিয়া তাহাদের নিকট দীক্ষিত হউন, একমনে আপন ইষ্ট চিন্তা করুন, দেখিবেন কি সুখের পারাবার উপস্থিত হইবে! ভাল জিজ্ঞাসা করি, এতদিন ত খৃষ্টানেরা এ দেশে আসেন নাই, এতদিন ত ব্রাহ্মদল বাঁধে নাই, এত দিন ত ধর্ম্মের রূপক অর্থ বাহির হয় নাই, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কি সকলেই নিম্নগামী হইয়া গিয়াছেন? যদ্যপি তাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহাদের মানসিক শক্তির একটা দৃষ্টান্ত কেহ মনে করেন, তাহা হইলে দেখিবেন যে, তাঁহারা কি ছিলেন এবং কি গুণে তাঁহারা নিরবচ্ছিন্ন সুখে দিনযাপন করিয়া গিয়াছেন। একথা কেন বলিলাম? দ্বেষভাবে নহে। আমরা হিন্দুসন্তান, হিন্দুস্থানে জন্ম, হিন্দুশোণিতে ও হিন্দুভাবে জন্ম, সুতরাং এ অবস্থায় ইংরাজী ধর্ম্মভাব আমাদের সম্পূর্ণ বিদেশীয়। আমাদের শারীরিক কিম্বা মানসিক কোন্ ধর্ম্মের সহিত ইউরোপীয়দিগের শারীরিক বা মানসিক তুলনা করা যাইতে পারে? যদিও কতকগুলি বৃত্তি বা ধর্ম্ম, এক মনুষ্যজাতি হিসাবে স্থুল ভাবে মিলিবে, কিন্তু সূক্ষ্মাদিতে কখনই মিলিতে পারে না। এই নিমিত্ত হিন্দু হইয়া যাঁহারা ইউরোপীয়ভাব লইতে যান, তাঁহাদের কেবল অনুকরণই হইয়া যায়। যে পর্য্যন্ত সেই হিন্দুশোণিত পরিবর্ত্তিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত সে ভাব কখনই প্রস্ফুটিত হইতে পারিবে না। এইজন্য ভাব বিকৃত হইবার ভয়ে এ প্রকার কথা বলা হইল।

আমরাও এখনকার লোক, তাহার পরিচয় দিয়াছি। আমরাও সভায় ঘুরিয়াছি, বিজ্ঞান শাস্ত্র পড়িয়াছি, পরিমার্জ্জিত বুদ্ধিপ্রসূত ধর্ম্মকথা শুনিয়াছি, কিন্তু সে সকল তৃণ অপেক্ষাও মূল্যবিহীন বলিয়া ধারণা এবং প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

ঈশ্বর-জ্ঞান লাভ করিবার জন্য বেশী বুদ্ধি, বেশী বিদ্যা, বেশী জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। পরমহংসদেব তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। এই শিক্ষা দিবার জন্য তিনি জন্মিয়াছিলেন। যদিও তাঁহাকে আমরা অবতার বলিলাম, কিন্তু সে কথা অন্যে এক্ষণে না'ও বলিতে পারেন। তাঁহাকে একজন মনুষ্য বলিয়া, তাঁহার জীবনের স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন কি সুন্দরভাবে সংঘটিত হইয়াছিল, যদ্যপি কেহ, তাহাই আদর্শ স্বরূপ রাখিয়া দেন, তাহা হইলে কল্যাণের

ইয়ত্তা থাকিবে না। এতদ্দ্বারা এ কথা তিনি স্পষ্ট বুঝিবেন যে, ঈশ্বরের হাতে পড়িয়া থাকিলে তিনি অতি সামান্য ব্যক্তিকেও অতি উচ্চ স্থান প্রদান করিতে পারেন। পরমহংসদেবকে কি গুণে আমরা ঈশ্বর স্থানে বসাইয়াছি? অবশ্য তাহার কারণ আছে। কারণ না থাকিলে আমরা সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে হাস্যাস্পদ হইব, এ কথা কি এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে জ্ঞান হয় নাই? এ কথা কি বুঝিতে অপারক যে, ইহা দ্বারা সামাজিক প্রতিপত্তির কিঞ্চিৎ খর্ব্ব হইবে—বন্ধুবান্ধবেরা মনুষ্যপূজক বলিয়া গাল কাৎ করিয়া হাসিবে। কিন্তু এ সকল কথা আমাদের বিশ্বাসের নিকট অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়। মনে হয় যাহাদের এই প্রকার ভাব, তাহারা নিতান্ত অজ্ঞান। তাহারা ঈশ্বর-বিমুখ ব্যক্তি বলিয়া তাহাদের জন্য দুঃখিত হইয়া থাকি।

যদ্যপি কাহারও গুরু না থাকেন, তিনি ঈশ্বরের মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকুন, এক দিন অবশ্য গুরু মিলিবেই মিলিবে! আমরা জীবনে তাহা দেখিয়াছি! সাবধান! অবিশ্বাসীর উপায় নাই, তার্কিকের কল্যাণ নাই, গোঁড়াদিগের পরিণাম অতিশয় ভয়াবহ।

পরমহংসদেব সর্ব্বদা যে গীতগুলি গান করিতেন, তাহার কয়েকটী এই স্থানে প্রদত্ত হইল।

শক্তিবিষয়ক গীত।

শ্যামা মা কি কল ক'রেছ, কালী মা কি এক কল ক'রেছে;
চৌদ্দপুয়া কলের ভিতর, কত রঙ্গ দেখাতেছে।
যে কলে চিনেছে তারে, কল হ'তে হবে না তারে,
কোন কলের ভক্তি-ডোরে, আপ্‌নি শ্যামা বাঁধা আছে।
যতক্ষণ কালী কলে রয়, কলের কল স্ববশে রয়,
কমল বলে কালী গেলে, কেও না যায় সে কলের কাছে।

কখন কি রঙ্গে থাক মা, শ্যামা সুধা তরঙ্গিনী;
লম্ফে লম্ফে অপাঙ্গে অনঙ্গে ভঙ্গ দেও জননী।
লম্ফে ঝম্ফে কম্পে ধরা, অসিধরা করালিনী,
তুমি ত্রিগুণ ধরা, পরাৎপরা ভয়ঙ্করা কালকামিনী;
সাধকেরই বাঞ্ছা পূর্ণ কর নানারূপধারিণী,
কভু কমলের কমলে নাচ মা, পূর্ণব্রহ্মসনাতনী।

শ্যামাপদ আকাশেতে মন ঘুড়ি-খানি উড়্‌তেছিল ;
কলুষের কু-বাতাস পেয়ে, গোঁপ্তা খেয়ে প'ড়ে গেল।
মায়া কান্নি হ'লো ভারি, আর আমি উঠাতে নারি ;
দারা সুত কলের দড়ি, ফাঁস্ লেগে সে ফেঁসে গেল।
জ্ঞান-মুণ্ড গ্যাছে ছিঁড়ে, উঠিয়ে দিলে অমনি পড়ে ;
মাথা নেই সে আর কি উড়ে সঙ্গের ছ'জন জয়ী হ'ল।
ভক্তি ডোরে ছিল বাঁধা, খেল্‌তে এসে লাগলো ধাঁধা ;
নরেশচন্দ্রের হাসা কাঁদা, না আসা এক ছিল ভাল।

ভাবিলে ভাবের উদয় হয়, ভাবিলে ভাবের উদয় হয় ;
যে জন কালীর ভক্ত, জীবন্মুক্ত, নিত্যানন্দময়।
যেমন ভাব, তেমন লাভ, মূল সে প্রত্যয়।
কালী পদ সুধা হ্রদে চিত্র * ডুবে রয়, যদি চিত্র ডুবে রয়,
তবে জপ যজ্ঞ পূজা বলি কিছুই নয়।

যা অনায়াসে হয় তাই কর রে।

কাজ কি আমার কোষাকুশি, আয় মন বিরলে বসি,
ভাব শ্যামা এলোকেশী, বারাণসী পাবি রে।
ভস্মমাখা ত্রিলোচন, শিবের কোন পুরুষে ছিল ধন,
শ্যামা নির্ধনের ধন, তাই সদা জপ রে।

* পরমহংসদেব চিত্ত শব্দ প্রয়োগ না করিয়া চিত্র শব্দ ব্যবহার করিতেন বলিয়া অনেকেই তাঁহার উচ্চারণ দোষ ধরিতেন; কিন্তু স্থূল বুদ্ধি ব্যক্তিরা ভাবুকের ভাব উপলব্ধি করিতে কোন কালেই সক্ষম নহেন। চিত্ত শব্দে মন। কালী পাদপদ্মে মন মগ্ন হইলে যে, সকল কার্য্য স্থগিত হইয়া যায়, তাহা নহে। কারণ, মন বুদ্ধি এবং অহঙ্কার, এই তিন লইয়া মনুষ্যদিগের কার্য্য হয়। কোন বিষয়ে মন সংযোগ হইলে বুদ্ধি এবং অহঙ্কারের কার্য্য রহিত হইয়া যায়, তাহা নহে। অতএব কালীপদে মন মগ্ন হইলেই যে কার্য্য উঠিবে, তাহার হেতু নাই। চিত্র শব্দের দ্বারা প্রকৃত ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। চিত্র অর্থে ছবি। মনুষ্যরূপের প্রতিরূপ জীবাত্মার পরমাত্মায় মিলনকে সমাধি কহে। তদবস্থায় আর বহির্জ্ঞান থাকে না, কার্য্য করিবে কে?

আপনাতে আপনি থেকো, যেও না মন কার ঘরে।
যা চাবি তাই ব'সে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে,
পরমধন এই পরেশ মণি, যা চাবি তাই দিতে পারে,
কত মণি প'ড়ে আছে, আমার চিন্তামণির নাচদুয়ারে।

তার তারিণী।

এবার ত্বরিত করিয়ে, তপন-তনয়-ত্রাসে ত্রাসিত প্রাণ যায়।
জগত অম্বে জন পালিনী, জন মোহিনী জগৎ জননী;
যশোদা জঠরে জনম লইয়ে, করিলে হরি লীলে।
বৃন্দাবনে রাধা বিনোদিনী, ব্রজবল্লভ বিহার কারিণী;
রসরঙ্গিনী রসময়ী হ'য়ে, রাস করিলে লীলাপ্রকাশ।
গিরিজা, গোপজা, গোবিন্দ মোহিনী, তুমি মা গঙ্গে গতি দায়িনী;
গান্ধার্ব্বিকে গৌরবরণী, গাওয়ে গোলকে গুণ তোমার।
শিবে সনাতনী, সর্ব্বাণী, ঈশানী, সদানন্দময়ী সর্ব্বস্বরূপিণী;
সগুণা নির্গুণা সদাশিবপ্রিয়া, কে জানে মহিমা তোমার।

যশোদা নাচা'ত গো মা বলে নিলমণি; গো মা—
সে বেশ লুকালে কোথা করাল বদনী।
একবার নাচ গো শ্যামা,—
হাসি বাঁসি মিশাইয়া; মুণ্ডমালা ছেড়ে, বনমালা পরে;
অসি ছেড়ে বাঁশি লয়ে; আড়নয়নে চেয়ে চেয়ে; গজমতি নাশায় দুলুক;
যশোদার সাজান বেশে; অলকা আবৃত মুখে; অষ্ট নায়িকা, অষ্ট সখী হোক;
যেমন ক'রে রাসমণ্ডলে নেচেছিলি; হৃদিবৃন্দাবন মাঝে; ললিত ত্রিভঙ্গঠামে;
চরণে চরণ দিয়ে; গোপীর মনভুলান বেশে, তেমনি তেমনি তেমনি করে;
(দেখে নয়ন সফল করি) বড় সাধ আছে মনে;
তোর শিব বলরাম হোক, (হেরি নীলগিরি আর রজতগিরি)
একবার বাজা গো মা;—(সেই মোহন বেণু,
যে বেণু রবে ধেনু ফিরাতিস্; সেই মোহন বেণু,
যে বেণু রবে যোগীর মন ভুলাতিস্; যে বেণু রবে যমুনায় উজান ধরিত

বাজুক তোর বেণু বলায়ের শিঙ্গে।
শ্রীদামের সঙ্গে নাচিতে ত্রিভঙ্গে গো মা;
তা থেইয়া তা থেইয়া, তা তা থেই থেই বাজত নূপুর ধ্বনি।
শুন্‌তে পেয়ে, আস্‌তো ধেয়ে, ব্রজের রমণি॥ (গো মা)
গগণে বেলা বাড়িত, রাণী ব্যাকুল হইত;
বলে ধর ধর ধর, ধর রে গোপাল, ক্ষীর সর ননী।
এলাইয়ে চাঁচর কেশ রাণী বেঁধে দিত বেণী॥ (গো মা)

এবার কালী তো'কে খাব।
গণ্ডযোগে জনমিলে সে যে হয় মাখেকো ছেলে;
এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা! দুটোর একটা ক'রে যাব।
ডাকিনী যোগিনী দুটো, তরকারী বানায়ে খাব।
তোর মুণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে, অম্বলে সান্তার চড়াবো।
(তোরে বনমালা পরাইব।)
খাব খাব বলি গো মা! উদরস্থ না করিব,
হৃদি পদ্মে বসাইয়ে মন মানসে পূজিব।
হাতে কালী মুখে কালী মা! সর্ব্বাঙ্গে কালী মাখিব;
যখন আস্‌বে শমন ধ'ত্তে কেশে, সেই কালী তার মুখে দিব।

এবার আমি ভাল ভেবেছি;
ভাল ভাবীর কাছে ভাব পেয়েছি।
যে দেশে রজনী নাই, সেই দেশের এক লোক পেয়েছি;
আমি কিবা রাত্র কিবা দিবা সন্ধ্যারে বন্ধ্যা ক'রেছি।
সোহাগা গন্ধক দিয়ে খাসা রং চড়ায়েছি;
এবার ভাল ক'রে মেজে ল'ব অক্ষ দুটী ক'রে কুঁচি।

শিব সঙ্গে সদা রঙ্গে, আনন্দে মগনা;
সুধা পানে ঢল ঢল কিন্তু ঢ'লে পড়ে না মা!
বিপরীত রতাতুরা, পদভরে কাঁপে ধরা,
উভয়ে পাগল পারা, লজ্জা ভয় ত মানে না মা!

আয় মন বেড়াতে যাবি। (যদি না বেড়ালে তুই রইতে নারিস্)
কালীকল্পতরুমূলে রে মন চারি ফল কুড়ায়ে পাবি ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা ভক্তি খোঁটায় বেঁধে থুবি ;
জ্ঞান খড়্গে বলি দিয়ে উভয়ে কৈবল্যে দিবি।
শুচি অশুচিরে লয়ে, দিব্য ঘরে কবে শুবি ;
দুই সতীনে পিরীত হ'লে তবে শ্যামা মাকে পাবি।
রামপ্রসাদ বলে ভক্তি মুক্তি উভয়কে মাথায় রেখেছি ;
এবার কালীর নাম ব্রহ্ম জেনে কর্ম্মাকর্ম্ম সব ছেড়েছি।

সুরাপান করিনে আমি, সুধা খাই জয় কালী ব'লে ;
মন মাতালে মাতাল করে, সব মদ-মাতালে মাতাল বলে।
গুরুদত্ত গুড় লয়ে, প্রবৃত্তি তায় মসলা দিয়ে মা !
জ্ঞান শুঁড়ীতে চুয়ায় ভাঁটি, পান করে মোর যত মাতালে।
মূলমন্ত্র যন্ত্র ভরা, আমি শোধন করি বলে তারা মা,
রামপ্রসাদ বলে এমন সুরা খেলে চতুর্ব্বর্গ মেলে।

মা ! ত্বং হি তারা। (আমার)
তুমি ত্রিগুণধরা পরাৎপরা।
তুমি জলে, তুমি স্থলে, তুমি আদি মূলে গো মা,—
থাক সর্ব্ব ঘটে, অক্ষ পুটে, সাকার আকার নিরাকারা।
তুমি সন্ধ্যা তুমি গায়ত্রী, তুমি জগদ্ধাত্রী গো মা,—
তুমি সর্ব্বজীবের ত্রাণকর্ত্রী, সদা শিবের মনোহরা।

মজ্‌লো আমার মন ভ্রমরা শ্যামাপদ নীল কমলে।
বিষয় মধু তুচ্ছ হ'লো, কামাদি রিপু সকলে ॥
চরণ কালো ভ্রমর কালো, কালোয় কাল মিশে গেল ;
পঞ্চ তত্ত্ব প্রধান মত্ত, রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে।
কমলাকান্তের মনে, আশা পূর্ণ এত দিনে,
দুখসুখ সমান হ'ল, আনন্দ সলিল স্থলে॥

(মা তোদের) ক্ষেপার হাট বাজার, গুণের কথা ক'ব কার ॥
তোরা দুই সতীনে, কেউ বুকে কেউ মাথায় চ'ড়ে তাঁর।
কর্ত্তা যিনি ক্ষেপা তিনি, ক্ষেপার মূলাধার; (মা তারা)
চাক্‌লা ছাড়া চ্যালা দুটো সঙ্গে অনিবার।
গজ বিনে গো আরোহণে, ফিরিস্ কদাচার, (মা তারা)
মণি মুক্তা ছেড়ে পরিস্ গলে, নর-শির হার।
শ্মশানে মশানে ফিরিস্, কার্ বা ধারিস্ ধার, (মা তারা)
রামপ্রসাদকে ভব-ঘোরে ক'র্ত্তে হবে পার।

গয়া গঙ্গা প্রভাস আদি, কাশী কাঞ্চী কেবা চায়।
কালী কালী কালী ব'লে, অজপা যদি ফুরায় ॥
ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সেকি চায়।
সন্ধ্যা যার সন্ধানে ফিরি, কভু সন্ধি নাহি পায় ॥
কালী নামে কত গুণ, কেবা জান্তে পারে তায়।
দেবাদিদেব মহাদেব যাঁর পঞ্চ মুখে গুণ গায় ॥
জপ যজ্ঞ পূজা বলি, আর কিছু না মনে লয়।
মদনের জপ যজ্ঞ, ব্রহ্মময়ীর রাঙ্গা পায় ॥

যখন যেরূপে কালী রাখিবে আমারে।
সেই সে মঙ্গল যদি না ভুলি তোমারে ॥
বিভুতি বিভূষণ, রতন মণি কাঞ্চন।
বৃক্ষমূলে বাস, কি রতন সিংহাসনোপরে ॥

নামেরই ভরসা কেবল কালী গো তোমার।
কাজ কি আমার কোশাকুশি, দেঁতোর হাসি লোকাচার।
নামেতে কাল পাশ কাটে, জোটে তা দিয়েছে র'টে,
আমি তো সেই জোটের মুটে, হ'য়েছি আর হ'ব কার।
নামেতে যা হবার হবে, মিছে কেন মরি ভেবে;
নিতান্ত ক'রেছি শিবে, শিবের বচন সার ॥

দুর্গা দুর্গা ব'লে, মা যদি মরি।
আখেরে এ দীনে, না তার কেমনে, জানা যাবে গো শঙ্করী।
আমি নাশি, গো ব্রাহ্মণ; হত্যা করি ভ্রূণ, সুরা পান আদি বিনাশি, নারী,—
এ সব পাতক, না ভাবি তিলেক, ব্রহ্মপদ তুচ্ছ করি॥

গো আনন্দময়ী হ'য়ে মা! আমায় নিরানন্দ ক'রো না।
তপন-তনয়, আমায় মন্দ কয়, কি বলিবি তাকে বল না॥
ভবানী বলিয়ে, ভবে যাব চ'লে, মনে ছিল এই বাসনা,
অকূল পাথারে ডুবাবি আমারে, স্বপনেও তাতো জানি না।
আমি অহর্নিশি, দুর্গা নামে ভাসি, দুঃখরাশি তবু গেল না;
আমি যদি মরি, ও হরসুন্দরী, দুর্গা নাম কেউ লবে না॥

বল রে শ্রীদুর্গা নাম।
দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে, পথে চলে যায়, শূল হস্তে মহাদেব রক্ষা করেন তায়
শঙ্করী হইয়ে মাগো গগনে উড়িবে, মীন হ'য়ে রব জলে নখে তুলে লবে।
নখাঘাতে ব্রহ্মময়ী যাবে এ পরাণী, সে সময়ে দিও রাঙ্গা চরণ দু'খানি।
যখন বসিবে মাগো শিব সন্নিধানে, বাজন নূপুর হ'য়ে বাজিব চরণে।
তুমি সন্ধ্যা তুমি গায়ত্রী, তুমি মা সকল,
তোমা হ'তে ব্রহ্মা বিষ্ণু, দ্বাদশ গোপাল।

কে! মা এলি গো, গিরে দাদার বেটী।
দোনো ছোক্‌রা বি সাথ্, দোনো ছুকরী বি সাথ্
আর এক ব্যাটা জুল্‌পি কাটা কাম্‌ড়ে নিল টুঁটী॥

যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে।
(মাকে) তুমি দেখ মন আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাই দেখে॥
কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, আয় মন বিরলে দেখি,
রসনারে সঙ্গে রাখি, সে যেন মা ব'লে ডাকে॥ (মাঝে মাঝে)
কুরুচি কুমন্ত্রী যত, নিকট হ'তে দিও নাকো।
জ্ঞানেরে প্রহরী রেখো, সে যেন সাবধানে থাকে॥ (খুব)

রাধাকৃষ্ণ ও অন্যান্য বিষয়ক গীত।

প্রেম নগরে রাই মহাজন, তস্য খাতক শ্রীহরি।
কস্য কর্জ্জ পত্র লিখে, দিয়েছেন বংশীধারী॥
খৎ দেখালে হবে বা কি? ওয়াশীল শূন্য বাকীর বাকী;
সম্ভাবন তার আছে বা কি, কেবল বাঁশের বাঁশরী।
পরিশোধের কথা আছে, দিবে ধড়া চুড়া বেচে,
তস্য খতে লেখা আছে, ইসাদী অষ্টমঞ্জরী॥

আমি মুক্তি দিতে কাতর নই।
শুদ্ধ ভক্তি দিতে কাতর হই॥
আমার ভক্তি যেবা পায়, তারে কেবা পায়, সে যে হয় রে ত্রৈলোক্য জয়ী।
ভক্তির কথা শুন বলি চন্দ্রাবলী, ভক্তি মিলে কভু ভক্তি মিলে কই;
ভক্তির কারণে পাতাল ভুবনে, বলির দ্বারে আমি দ্বারী হ'য়ে রই।
শুদ্ধ ভক্তি এক আছে বৃন্দাবনে, গোপ গোপী বিনে অন্যে নাহি জানে;
ভক্তির কারণে নন্দের ভবনে, পিতা জ্ঞানে নন্দের বাধা মাথায় বই॥

কে জানে তোমার মায়া, ওহে শ্রীহরি।
পুরুষ প্রকৃতি হও কভু ত্রিপুরারী॥
কভু ব্যাঘ্র চর্ম্ম পর, কভু বা মুরলী ধর;
কভু হও নর-হর, রণস্থলে দিগম্বরী॥
তব মায়ায় বদ্ধ বলি, ত্রিপাদ ভূমি দিবে বলি,
ছলনা করিয়ে ছলি, পাঠাইলে নাগপুরী।
জয় বলে রামারাম, আকার ভেদ, ভেদ নাম,
যেই শ্যামা সেই শ্যাম, ভাব মন ঐক্য করি॥

এসে ঠেকেছি যে দায়, সে দায় কব কায়।
যার দায় সেই জানে, পর কি জানে পরের দায়॥
হ'য়ে বিদেশিনী নারী, লাজে মুখ দেখাতে নারি;
ভয়ে মরি লাজে মরি, নারী হওয়া একি দায়।

আমার কি ফলের অভাব, তোরা এলি বিফল ফল যে লয়ে ;
পেয়েছি যে ফল, জনম সফল, রাম কল্পতরু রোপেছি হৃদয়ে।
শ্রীরাম-কল্পতরু-বৃক্ষ-মূলে রই, যে ফল বাঞ্ছা করি, সে ফল প্রাপ্ত হই,
ফলের কথা কই, ও ফল গ্রাহক নই, যাব তোদের প্রতিফল যে দিয়ে।

ভাব শ্রীকান্ত নর-কান্তকারীরে।
নিতান্ত কৃতান্ত ভয়ান্ত হবি ॥
ভাবিলে ভব ভাবনা যার রে—তারে অপাঙ্গে ভ্রূভঙ্গে ত্রিভঙ্গে যেবা ভাবে।
এলি কি তত্ত্বে, এ মর্ত্ত্যে, কুচিত্ত কুবৃত্ত করিলে কি হবে রে,—
উচিত তো নয় দাশরথিরে ডুবাবি রে,
কর এ চিত্ত, প্রাচিত্ত, সে নিত্য পদ ভেবে।

কীর্ত্তন।

দে দে দে, মাধব দে।
আমার মাধব, আমায় দে, দিয়ে বিনা মূলে কিনে নে—
মীনের জীবন, জীবন যেমন, আমার জীবন মাধব তেমন।
তুই লুকাইয়ে রেখেছিস্ (ও মাধবী)—
আমি বাঁচি না, বাঁচি না,
(মাধবী ও মাধবী মাধব বিনে, মাধব অদর্শনে)

শ্যামের নাগাল পেলুম না লো সই
আমি কি সুখে আর ঘরে রই ॥
শ্যাম যদি মোর হ'তো মাথার চুল।
যতন ক'রে বাঁধতুম্ বেণী সই, দিয়ে বকুল ফুল।
(কেশব-কেশ যতনে বাঁধতুম্ সই,
কেউ নকৃতে পারত না সই,—শ্যাম কাল আর কেশ কাল)—
কেউ নকৃতে পারত না—
কালোয় কাল মিশে যেতো গো—কেউ নকৃতে ;—
শ্যাম যদি মোর ব্যাসর হইত, নাসা মাঝে সতত রহিত,—
অধর চাঁদ অধরে র'ত, সই।

যা হবার নয়, মনে হয় গো—
শ্যাম কেন ব্যাসর হবে সই ?
শ্যাম যদি মোর কঙ্কণ হ'তো, বাহু মাঝে সতত রহিত—
কঙ্কণ নাড়া দিয়ে চ'লে যেতুম সই, (বাহু নাড়া দিয়ে)
শ্যাম কঙ্কণ হাতে দিয়ে, চলে যেতুম সই, (রাজপথে)—

ঘরে যাবই না গো।
যে ঘরে কৃষ্ণ নামটী করা দায়;—
যেতে হয় তোরাই যা, গিয়ে ব'লবি,
যার রাধা তার সঙ্গে গেল।
তোদের হ'ল বিকি কিনি, আমার হ'ল নীলকান্তমণি।
যদি কারুর বাড়ী যাই, বলে এল কলঙ্কিনী রাই।
যদি চাই মেঘপানে, বলে কৃষ্ণকে পড়েছে মনে।
যদি পরি নীলবসন, বলে ঐ কৃষ্ণের উদ্দীপন।
যখন থাকি রন্ধনশালে, কৃষ্ণরূপ মনে হ'লে, আমি কাঁদি সখি ধুঁয়ার ছলে।

দে দে দে, বাঁশী দে।
বাঁশী তো মথুরার নয়,—
রাধা নামের সাদা বাঁশী, বাঁশী তো মথুরার নয়—
তুই থাক না কেন শ্যাম, বাঁশী দে—
বাঁশী দে, চূড়া দে, তোর মা ব'লেছে, পীত ধড়া দে,—
(যে ধড়ায় ননী বেঁধে দিতো রে,)
তোর মা নন্দরাণী, এখন তো বিনে পথের কাঙ্গালিনী; তোর মা বলেছে
দে দে রায়ের গাঁথা চিকণ মালা দে, তোর পিরীতি ফিরায়ে নে।

একটী নবীন রাখাল।
তোমার শ্রীদাম হবে কি সুবল হবে॥
সে যে কাদছে যমুনার ঘাটে, একটী নূতন বৎস কোলে লয়ে।
কানাই কানাই বল্‌তে চায়, তার "কা" বই কানাই বেরোয় না।

ব'ল্‌তে ডরাই, না ব"ল্লেও ডরাই ;
জ্ঞান হয় তোমায় হারাই হা রাই।
আমরা জানি যে মন্‌তোর্‌, দিলাম তোকে সেই মোন্তর্‌
এখন মন তোর্‌, আমরা যে মন্ত্রে বিপদে তরি তরাই।

কে কানাই নাম ঘুচালে তোর।
ওরে ব্রজের মাখন চোর॥
কোথায় রে তোর পীত ধড়া, কে নিল তোর মোহন চূড়া ?
নদে এসে ন্যাড়া মুড়া, পরেছ কৌপীন ডোর।
অশ্রু কম্প স্বরভঙ্গ, পুলকে পূর্ণিত অঙ্গ, সঙ্গে লয়ে সাঙ্গোপাঙ্গ,
হরিনামে হ'য়ে ভোর।

তোমরা দু'ভাই পরম দয়াল হে প্রভু গৌর নিতাই।
(অধম তারণ হে প্রভু গৌর নিতাই।)
আমি গিয়েছিলাম কাশীপুরে, আমায় ক'য়ে দিলে বিশ্বেশ্বরে,
সেই নন্দের নন্দন শচীর ঘরে। (আমি জেনেছি হে)
আমি গিয়ে ছিলাম অনেক ঠাঁই, কিন্তু এমন দয়াল দেখি নাই।
(তোমাদের মত)
তোমরা ব্রজে ছিলে কানাই বলাই, এখন নদে এসে হ'লে গৌর নিতাই।
(সে রূপ লুকায়ে)
তোদের ব্রজের খেলা ছিল দৌড়াদৌড়ি, এখন নদের খেলা ধূলায় গড়াগড়ি।
(হরি বোল বলে।)
তোমার ব্রজে ছিল উচ্চ রোল, এখন নদে এসে কেবল হরিবোল।
(ওহে গৌর নিতাই)
তোমার সকল অঙ্গ গেছে ঢাকা, কেবল চেনা আছে দুটী নয়ন বাঁকা।
(ওহে দয়াল গৌর)
তোমার পতিতপাবন নাম শুনে, বড় ভরসা ক'রেছি মনে।
(ওহে পতিত পাবন)
বড় আশা ক'রে এলুম ধেয়ে, আমায় রাখ চরণ ছায়া দিয়ে।
(ওহে দয়াল গৌর)

জগাই মাধাই ত'রে গেছে, প্রভু সেই ভরসা আমার আছে।
তোমরা আচণ্ডালে দাও কোল, কোল দিয়ে বল হরিবোল।
(ওহে কাঙ্গালের ঠাকুর)

আমার গৌর নাচে।
নাচে সঙ্কীর্ত্তনে, শ্রীবাস অঙ্গনে, ভক্তগণ সঙ্গে॥
হরিবোল বলে বদনে গোরা, চায় গদাধর পানে;
গোরার অরুণ নয়নে, (আমার গোরার) বহিছে সঘনে প্রেমধারা হেম অঙ্গে।

নাচেরে।
শ্রীগৌরাঙ্গ আমার, রাধা প্রেম ব'লে হরি হরি॥
উথলিল প্রেম সিন্ধু ব্রজলীলা মনে করি;
গোরা ক্ষণে বৃন্দাবন, করয়ে স্মরণ, ক্ষণে ক্ষণে বলে কোথায় প্রাণেশ্বরী।

যা'দের হরি ব'ল্‌তে নয়ন ঝরে, তারা দু'ভাই এসেছে রে।
তারা—তারা দু'ভাই এসেছে রে।
যা'রা জীবের দুঃখ সৈতে নারে।
যা'রা ব্রজের মাখন চোর, য'ারা জাতি বিচার নাহি করে,
যা'রা আপামরে কোল দেয়, যা'রা আপনি মেতে জগৎ মাতায়,
যা'রা হরি হ'য়ে হরি বলে, যা'রা জগাই মাধাই উদ্ধারিল,
য'ারা মার খেয়ে প্রেম বিলায়, যা'রা আপন পর নাহি বাচে,
জীব-তরাতে তারা দু'ভাই এসেছে রে। (নিতাই গৌর)

মধুর হরি নাম নিসেরে। জীব যদি সুখে থাক্‌বি।
সুখে থাক্‌বি বৈকুণ্ঠে যাবি, ওরে মোক্ষ ফল সদা পাবি। (হরিনামের গুণে রে)
যে নাম শিব জপে, জপে দিবা নিশি, আজ সেই হরি নাম দিব তোকে।
দয়াল নিতাই ডাকে রে—
নারদ ঋষি—ঋষি দিবানিশি, যে নাম বিনা যন্ত্রে গান করে।
ও জীব আয় রে ও জীব আয় রে, কে পারে যাবি আয় রে;
হরি নামের তরি ঘাটে বাঁধা রে; আমার প্রেমদাতা নিতাই ডাকে।

রাধে গোবিন্দ বল।
রাধে গোবিন্দ বল, শ্রীরাধে গোবিন্দ বল।
রাধে রাধে রাধে বল, নাম ব'লতে ব'লতে প্রাণ গেলেও ভাল, থাকলেও ভাল
রাধা নামে বাঁধ ভেলা, এড়াবি শমনের জ্বালা।
রাধা নাম সুধানিধি, পান কর নিরবধি।
রাধা রাধা বল মুখে, জনম যাইবে সুখে।
রাধা নাম বল সদা যাবে তোর ভবের ক্ষুধা।

তারে কৈ পেলুম সৈ আমি যার জন্যে পাগল।
ব্রহ্মা পাগল বিষ্ণু পাগল আর পাগল শিব।
তিন পাগলে যুক্তি করে' ভাঙ্গল নবদ্বীপ॥
আর এক পাগল দেখে এলুম বৃন্দাবন মাঝে।
রাইকে রাজা সাজাইয়ে আপনি কোটাল সাজে।
আর এক পাগল দেখে এলুম নবদ্বীপের পথে।
রাধা প্রেম সুধাবে ব'লে করোয়া কিস্তি হাতে।

সুরধনী তীরে হরি বলে কেরে।
প্রেমদাতা নিতাই এসেছে। (বুঝি)
তা নৈলে প্রাণ জুড়াবে কিসে। (নিতাই নৈলে) (দয়াল নৈলে

প্রেমধন বিলায় গৌর রায়।
দয়াল নিতাই ডাকে আয় আয়।
শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়।
আপনি পড়িয়ে নিতাই বলে সামাল রে ভাই। (প্রেমের বন্যা এলরে)

বাউল সঙ্গীত।

আয় গো আয় গোষ্ঠে গোচারণে যাই।
শুনছি নিধুবনে, রাখাল রাজা হবেন রাই, হায় শুনতে পাই।
পীত ধড়া মোহন চূড়া, রাইকে পরাবে, হাতে বাঁশরি দিবে—
রাইকে রাজা সাজাইয়ে, কোটাল হবে প্রাণ কানাই।

ললিতা বিশাখা আদি অষ্ট সখীগণ রাখাল হবে পঞ্চজন—
তারা আবা দিয়ে বনে বনে ফিরাবে ধবলী গাই।

গৌর প্রেমের ঢেউ লেগেছে গায়।
তার হিল্লোলে পাষণ্ড দলন, এ ব্রহ্মাণ্ড তলিয়ে যায়।
মনে করি ডুবে তলিয়ে রই, গৌর চাঁদের প্রেম কুমীরে গিলেচে গো সই।
এমন ব্যথার ব্যথী কে আর আছে, হাত ধ'রে টেনে তোলায়।

ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপ সাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজ্‌লে পাবিরে প্রেম রত্ন ধন।
খুঁজ্ খুঁজ্ খুঁজ্ খুঁজ্‌লে পাবি হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন।
দীপ্ দীপ্ দীপ্ জ্ঞানের বাতি হৃদে জ্বল্‌বে অনুক্ষণ॥
ড্যাঙ্ ড্যাঙ ড্যাঙ্ ডাঙ্গায় ডিঙ্গে চালায় আবার সে কোন্ জন।
কুবীর বলে শোন্ শোন্ শোন্ ভাব গুরুর শ্রীচরণ॥

নিত্যানন্দের জাহাজ এসেচে।
তোরা পারে যাবি ত ধর এসে॥
ছয় মানোয়ারি গোরা, তারা দেয় সদা পারা, বুক পিটে তার ঢাল খাঁড়া ঘেরা,
তারা সদর দুয়ার আল্‌গা ক'রে, রত্ন মাণিক বিলাচ্চে।

মনের কথা কৈব কি সৈ, কইতে মানা।
দরদী নৈলে প্রাণ বাঁচে না।
মনের মানুষ হয় যে জনা, নয়নেতে যায় গো জানা, সে দুই এক জনা—
সে ওজন পথে করে আনাগোনা। (মনের মানুষ). (রসের মানুষ)
রসে ভাসে রসে ডোবে ও সে ক'র্চ্চে রসের বেচা কেনা।

হিন্দি গীত।

রাম কো যো চিনা হ্যায় নাহি চিনা হ্যায় সে কেয়া রে?
আওর বিখম রস চাকা হ্যায় সে কেয়ারে।
ওহি রাম দশরথ কি বেটা, ওহি রাম ঘট ঘট মে লেটা
ওহি রাম জগৎ পসেরা, ওহি রাম সব সে নেহারা।

হরি সে লাগি রহ রে ভাই
তেরা বনত বনত বনিযাই।
অঙ্কা তারে বঙ্কা তারে, তারে সুজন কশাই
সুগাপড়ায়কে গনিকা তারে তারে মীরাবাই।
দৌলত দুনিয়া মাল খাজনা বেনিয়া বয়েল চরাই;
এক বাত্ সে ঠাণ্ডা পড়েগা খোঁজ্ খবর না পাই।
আয়্সি ভক্তি কর ঘট ভিতর ছোড় কপট চতুরাই;
সেবা বন্দি আওর অধীনতা সহজে মিলি রঘুরাই।

পরমহংসদেবের তিরোভাব উপলক্ষে বাৎসরিক নগর সঙ্কীর্ত্তন।

আমি সাধে কাঁদি।
হৃদয় রঞ্জনে, না হেরে নয়নে, কেমনে প্রাণ বাঁধি।
বিদায় দিছি পাষাণ প্রাণে, চাব কার মুখ পানে;
ফুল্ল ফুলহারে, সাজাইব কারে, পোড়া বিধি হ'লো বাদী।
ভাবে ভোরা মাতোয়ারা, দুনয়নে বহে ধারা;
ঢলে ঢলে ঢলে, নাচ কুতুহলে—এস গুণনিধি সাধি॥
চ'লে গেলে আর এলে না, জীব ত হরিনাম পেলেনা;
পার পাবেনা ঋণে, যদি দীন হীনে, কর পদে অপরাধী॥

আজ ধিরে জাগিছে স্মরণ।
হ'য়েছি রতন হারা, বিহনে যতন॥
সেই রবি শশি তারা, সেই ধরা-ফুল হারা;
বহিছে সময় ধারা, বহিত যেমন।
সেই পক্ষী কুল-কল, অনিলে দোলে কমল,
কেবল না হেরি নাথ তোমার বদন॥
রসিক প্রেমিকবর, জন মন ফুল্লকর,
ধ'রেছিলে কলেবর, আমার কারণ।
তব প্রেম নাহি মনে, ভুলে আছি তোমাধনে—
শত ধিক্ এ জীবনে, ধিক্ তোরে মন॥

কাতরে
ডাকি হে—এস, আঁখিবারি ঢালি রাঙ্গা পদে !
ভুলে আছি কমল চরণ, মত্ত মহামোহ মদে।
বিষয়-সাধনা, বিষয়-কামনা, হারায়েছি হায় !
পরম সম্পদে !
রাখ, নাথ, রাখ দাসে, রাখ রাখ এ বিপদে—
ফিরি লক্ষ্য হীন, ঘুরি দিন দিন—তৃণ পাকে পাকে,
যেন মহাহ্রদে।
বিষাদে ব্যাকুল কভু, কভু মাতি ছার আমোদে ;
হৃদয় সমল, কুঞ্চিত কমল—বিকাশি বসে হে
হৃদি-কোকনদে।

ত্রিতাপ দিবানিশি দহিছে শ্রীপদে দেহ আশ্রয়।
নামে ভব ত্রাস হয় হে হয় বিনাশ ;
হর ভয় হে সদয় হৃদয়॥
কলুষ মোহিত, কলুষ জড়িত ;
বিহিত নাহিক পাই—
বিষয় পিপাসা, ভোগে বাড়ে আশা,
(আমার কবে বা যাবে হে) (পিয়াস গেল না, গেল না)
(আর কত দিন রবে হে)
জ্বলে মরি তবু চাই।
নিয়ত তাড়না, সহেনা যাতনা,
করুণা করহে দীনে—
নিবিড় তিমিরে, মন সদা ফিরে,
(একবার দেখা দাও হে) (চরণে শরণ নিলাম)
(আর গতি নাই হে)
চরণ অরুণ বিনে॥
শঙ্কা চিতে, বুঝি পদাশ্রিতে,
ভুলে আছ হে দয়াময়॥

বিষম বিষয় তৃষা গেলনা হ'লনা দীনের উপায়।
পেয়ে শ্রীচরণ, করি নাই হে যতন,
পরম রতন হারালেম হেলায়॥
বিবেক রহিত, বাসনা তাড়িত, ভ্রমে মত্ত চিত্ত হায়।
আশায় নিরাশ, হতাশে হুতাশ—
(আশা কবে বা যাবে হে, আশা গেলনা,)
দীর্ঘশ্বাসে দীন যায়॥
ব্যাপিত অবনী, রোদনের ধ্বনি, শুনিয়া শিহরে প্রাণ।
ঘুমে অচেতন না ম্যালে নয়ন—
(চেতনা হ'লনা, হ'লনা, আরে রে পামর মন, গোনা দিন ফুরায়ে গেল,)
মোহ নহে অবসান॥
ভবে ভীম দরশন, অবিরত কুস্বপন,
মায়ার নেশায় মন, জাগিতে না পারে।
পাথারে তরঙ্গ রোলে, পৈশাচিক গণ্ডগোলে,
(প্রাণ শিহরে উঠে হে তরঙ্গের রঙ্গ দেখে,
প্রাণ আকুল যে হ'লো হে—অকূলে না কূল পেয়ে,
আমি কোথা বা যাব হে, চরণে শরণ নিলাম)
সুখ দুঃখ মাঝে দোলে, নিবিড় আঁধারে॥
অকূলে না কূল পায়, দারুণ শৃঙ্খল পায়।
নিরানন্দ নিরুপায়, পলাইতে নারে—
হও হে উদয় আসি, বিকাশি প্রেমের হাসি।
(আমি জ্বলে যে মলাম হে—ত্রিতাপ দাবানলে,
আর কেবা আছে হে—অনাথ ব'লে দয়া করে ;
আমার হৃদয় কমলোপরে, দীন হীন কাঙ্গালে ডাকে,
কমল কুঞ্চিত আছে হে—চরণ অরুণ অদর্শনে)
ঘোর তম রাশি নাশি নিস্তার দুস্তারে॥
তোমা ধনে, প্রভু নাহি মনে ; রাখ রাঙ্গা পায় হে করুণাময়॥

হৃদয় শূন্য করি লুকাল কোথায় হৃদয় রতন,
দহি অনুক্ষণ দেহ নাথ দরশন, জীবন বিহনে শুকাল জীবন ॥
পরাণ-রতনে না হেরে নয়নে, (কোথায় গেলে দেখা পাব)
শূন্যময় হেরি হায়—
চিত্ত মন হরি, র'য়েছ পাশরি (হরি কোথায় লুকালে হে)
কিঙ্করে ঠেলিয়া পায়।
দেহ-কারাগার, নিবিড় আঁধার, (তোমার চরণ অরুণ বিরহে)
উঠে সদা হাহাকার ;
তাপিত তৃষিত, প্রাণ বিচলিত, (প্রেম সুধা বিহনে)
সহিতে না পারি আর ॥
বরষি নয়ন-বারি, জ্বালা নিবারিতে নারি,
হৃদয়সন্তাপহারী হও হে উদয় ঃ—
তব অদর্শনে হায়, দেখ আছি কি দশায়,
(একবার দেখে যাও হে, কি দশায় আছি মোরা,
সবে শবাকার প্রায়, কোথায় আছ রামকৃষ্ণ,
তোমার সাধের প্রেমের হাট)
কোথা হরি করুণাময়, রাখ প্রেমময়।
পদে প্রাণ সমর্পিয়ে, কেন হে দহিছে হিয়ে,
প্রাণ সখা দেখা দিয়ে জুড়াও হৃদয় ॥
ভাসায়ে অকূল জলে, কোথায় লুকালে ছলে,
(আমি ডুবে মরি হে, অকূল পাথারে,
এই কি বিধি হ'ল হে, দীন হীন কাঙ্গালের প্রতি ;
কার কাছে যাব হে, তুমি বিধির বিধি,
আর কেবা আছে হে, মরমব্যথার ব্যথী,
দীনের মরম ব্যথা বুঝে, একবার দেখা দাও হে,
অভয় মুরতি ধরি, দেখা দাও, প্রাণ জুড়াও ;
চারি দিক শূন্য হেরি, অকূল জলধি-মাঝে)
কেন হে নিদয় হ'লে দীনে দয়াময়।
হৃদি মাঝে, এস মোহন সাজে, প্রেম-সুধা কর বিতরণ ॥

আমার নয়ন-মণি বিহনে নয়নে হেরি আঁধার।
হৃদি শূন্যাগার, কাঁদে প্রাণ অনিবার,
দহিছে জীবন কত স'ব আর ॥
হৃদয়-বিহারী, পাশরিতে নারি,
(কোথায় গেলে দেখা পাব)
ভুলিবার সেত নয়।
আঁখি মেলি চাই, দেখিতে না পাই,
(এই ছিল কোথায় গেল)
হেরি সব শূন্যময় ॥
এ ভবে কি পাব, আর কি জুড়াব,
(সে দিন আমার কবে হবে,
সে দিন কবে বা হবে হে,
আমার কুদিন গিয়ে সুদিন হবে)
হেরি হৃদি-প্রতিমায়।
ভাসায়ে অকূলে, কোথা আছ ভুলে,
(এই কি হে ছিল মনে)
গুণমণি রাখ পায় ॥
দুখ ধামে ফিরি একা, কোথা সখা দেহ দেখা,
করুণা-নয়নে দীনে, হের প্রেমাধার।
যতন জানিনি বলে, অভিমানে গেছ চলে,
(যতন জানিনা জানিনা প্রেমহীন স্বার্থযুত)
রোদনে কি হবে শোধ মমতার ধার ॥
আসিছে যামিনী ঘোরা, কোথা আছ মন-চোরা,
সকাতরে ডাকি নাথ, হও হে সদয়—
বিপদে শ্রীপদে স্থান, কিঙ্করে করহে দান,
কেনহে নিঠুর হ'লে নহত নিদয় ॥
আঁধার পুরি, এস আলো করি,
তাপিতে হে দেহ সুধাধার ॥

আমার হৃদয়-চাঁদে, এনে দে, বিষাদে রাখ জীবন।
তাপিত অন্তর, দহিছে নিরন্তর, কর সুধাকর কর বরিষণ॥
হৃদি-কুমুদিনী, হের বিষাদিনী, (কুমুদ কুঞ্চিত কৈল গো, রাহু আসি গ্রাসি শশী) না হেরি বিনোদ ঠাম।
নিবিড় আঁধার, সদা হাহাকার, (হায় একি হ'ল রে, বিধির একি বিধি রে, কেন সাধে বাদ সাধিল) নিরানন্দ ধরাধাম॥
পরাণ-পুতলী, হৃদয় উজলি, (এই ছিল কোথায় গেল, হৃদয়-আকাশ আলো ক'রে, এসে উদয় হও হে, হৃদয়-আকাশ শূন্য আছে, প্রাণ বাঁচেনা বাঁচেনা, তব বিরহ অনলে) হও হে উদয় আসি।
ভুবনমোহন, কর বিতরণ, (শুধুই মোহন নয় রে সে যে— অনেক দিন দেখি নাই, কোথায় আছ দেখা দাও) প্রেমালোক সুধারাশি॥
বিকাশি করুণা-রাশি,বলেছিলে ভাল বাসি,সাধের সাগরে ভাসি,সঁপেছি হৃদয়।
এ ভবে ভুলায়ে ছলে, একা রেখে গেলে চ'লে, (এই কি মনে ছিল হে, একা রেখে চ'লে যাবে)
কি দোষে হে প্রেমময়, হ'য়েছ নিদয়। (দোষী কবে বা নই হে)
মরু মাঝে তরু প্রায়, তাপে তনু জ্বলে যায়, দহিতে সহিতে শুধু র'য়েছে জীবন ;—(তবু গেল না রে, নিলাজ প্রাণ, বঁধুর পাছে পাছে প্রাণ)
মনাগুনে মরি মরি, আশায় পরাণ ধরি, (আমি ম'লাম ম'লাম হে, মরি তাতে ক্ষতি নাই, পাছে কলঙ্ক হয় হে, অকলঙ্ক রামকৃষ্ণ নামে)
এ সন্তাপে রাখ নাথ দেহ দরশন॥ (একবার দেখা দাও হে, ভুবনমোহন রূপে, পূরুবের ভাবে, প্রেমমাখা হাসিমুখে, কোথায় আছ রামকৃষ্ণ, পতিতপাবন অধমতারণ, কোথায় হে কাঙ্গালের ঠাকুর, তোমায় দীন হীন কাঙ্গালে ডাকে, আমাদের আর কেউ নাই)
হৃদয়-সখা, আসি দেহ—দেখা, বঞ্চনা ক'রনা প্রাণধন॥
হৃদয়রতন কোথা লুকা'ল ফুরা'ল সুখ-স্বপন।
পাষাণ হৃদয়, তাইতে হে এত সয়, হারায়ে তোমায় র'য়েছে জীবন॥
শূন্য ধরা পুরী, নাহি সে মাধুরী, শোকাচ্ছন্ন সমুদয়।
স্তব্ধ শাখী পাখী, ঝরে ফুল-আঁখি তোমা বিনে প্রেমময়॥
হের তোমা হারা, রবি শশী তারা, নিরানন্দে সবে ফিরে।
হৃদয়ের চাঁদ, হেরিতে বিষাদ, আর কি আসিবে ফিরে॥

আয়েরে দারুণ বিধি, পাষাণে গড়েছ হৃদি,
কোথা আছে হৃদি-নিধি রয়েছি কোথায়।
শোকের সাগরে ভাসি, প্রেমময় দেখ আসি,
গুণমণি তোমা বিনে আছি কি দশায়॥

শূন্য ধরা সুখহীনা, নাহি হাহাকার বিনা,
তাপিত অন্তর তনু, সন্তাপ আগার।
দেখ হে দেখ অনলে, ধিকি ধিকি হৃদি জ্বলে,
দারুণ বিরহ জ্বালা নাহি সহে আর॥
হৃদয় শশী, হৃদয় মাঝে বসি, প্রেম-সুধা কর বরিষণ॥

নিদয় হ'য়ে কেন ত্যজিলে ভাসালে দুঃখ-পাথারে॥
যাতনা না সয়, নেহার হে প্রেমময়, আছি যে দশায়, হারায়ে তোমারে॥
কার তরে আর, এজীবন ভার, বহরে নিঠুর প্রাণ।
দিয়ে হৃদি-নিধি, হ'রে নিল বিধি, (বিধি তোর মনে কি এতই ছিল)
সুখ আশা সমাধান॥

কত ছিল সাধ, সে সাধে বিষাদ,
(মনের সাধ মনেই র'ল, সাধ মিটিল না, মিটিল না)
কি পাপে ঘটিল নাথ।
ভাবিনি কখন, হবে যে এমন, বিনা মেঘে বজ্রাঘাত॥ (হায় একি হলো রে)
শূন্য হৃদি-সিংহাসন, এস এস প্রাণধন,
করিনি যতন তাই গেছ অভিমানে।
(যতন কিবা জানি হে, দীনহীন কাঙ্গাল মোরা)
তুমি যে পরম ধন কি তব জানি যতন
জুড়াও তাপিত প্রাণ প্রেম বারি দানে॥
(প্রাণ জ্বলে যে যায় হে, তোমার বিরহানলে)
মোহন রূপের ছাঁদে— বাঁধা, প্রাণ সদা কাঁদে,
(একবার দেখা দাও হে, অনেক দিন দেখি নাই, কোথা আছ রামকৃষ্ণ)
সাধ হেরি সেরূপ মাধুরী একবার।

[illegible]ষাদ, [illegible] পূরাও দীনের সাধ,
[illegible]র চাঁদ হর হৃদয়-আঁধার ॥
(একবার উদয় হও হে, তমোরাশি দূরে যা'ক)
বিনয় করি, চরণ তব ধরি, এস ব'স হৃদয় মাঝারে ॥

সদয় শমন কবে হবে হে জুড়াবে মনোবেদন।
নাথের বিরহ দহিছে হে অহরহ, সে যদি নিদয় কি কাজ জীবন ॥
আর কি তোমার, পাব দরশন, কোথা আছ নাথ ভুলে।
নয়নের বারি, মুছায়ে যতনে, লবে কিহে কোলে তুলে ॥
করিনি যতন, তাই প্রাণধন, অভিমানে গেছ চলে।
এ স্মৃতি অনল, দহিছে প্রবল, নেভেনা নয়নজলে ॥
তোমা বিনে আর কে আছে আমার, না দেখি আপন জন।
ওহে তাপহারী, ঢাল কৃপা করি, কর তাপ বিমোচন ॥
এস এস গুণধাম, পূর্ণ কর মনস্কাম,
ব'স হৃদি সিংহাসনে হৃদয়রতন।
অন্তরের তমো নাশি, দেখাও সে রূপরাশি,
জুড়াও তাপিত চিত্ত তৃষিত নয়ন ॥
কত ভালবেসেছিলে, একেবারে ভুলে গেলে,
অভাগা কপালদোষে বিধির লিখন।
দেখ নাথ মরি মরি, কেমনে জীবন ধরি,
নিবিড় আঁধারময় নেহারি ভুবন ॥
হৃদয়শশী, উদয় হও আসি, কর দুখ তমো নিবারণ ॥

আমার জীবন-ধন বিহনে আঁধার হেরি এ ভুবন।
প্রাণের সখা, আর কি দিবে দেখা, বিরহ বিষাদে দহি অনুক্ষণ ॥
হৃদি-চন্দ্র বিনে, মরি মরি প্রাণে, দেখা দিয়ে কোথা হ'ল অদর্শন।
জান যদি যাও, দাও এনে দাও, হেরিয়ে রতন জুড়াব জীবন ॥
আশা-পথ চেয়ে, গেল দিন বয়ে, সহে না সহেনা আর।
কবে দেখা পাব, চরণে লুটাব, মরমের ব্যথা জানাব আবার ॥

এস এস গুণনিধি, সাধি তোমা নিরবধি গড়েছি
বিরহ-জলধি আজি কর নাথ পার।
তৃষিত তাপিত প্রাণ, চাহে সদা সুধাদান,
প্রেমময় প্রেমহীনে হের একবার ॥
দেখ হ'য়ে তোমাহারা, ভ্রমি ভবে দিশেহারা,
মুছাতে নয়ন-ধারা না হেরি আপন।
যাব নাথ কার কাছে, কেবা বল আর আছে,
দীন ব'লে কোলে তুলে করিবে যতন ॥
চাহি মুখ পানে, রাখ হে চরণে, বঞ্চনা ক'রনা হৃদয় রতন ॥

কাতর প্রাণে ডাক দেখি রে আজ।
রামকৃষ্ণ বলে, বাহু তুলে, পরিহরি লোক লাজ ॥ (ওরে)
(সেতো) নিঠুর নয় আমার, (অকূল) প্রেমেরি পাথার,
দয়ার শশী, প্রেম বিলাসী প্রেমের অবতার ;
ডাক প্রেম সোহাগে, অনুরাগে ; আসবেন ফিরে রসরাজ।
নয়নজলে, দুখ যাবে না ম'লে ; যতন বিনে, অভিমানে সে গেছে চলে
হাতে পেয়ে রতন, চিন্‌লি না মন,
ও তুই হেলায় হারালি কাজ ॥
নাথ ! আমরা অসার, যতন জানি কি তোমার,
তাই ব'লে কি ক'র্ত্তে হয় নাথ এম্‌নি ব্যবহার,
তুমি পরের মত চলে গেলে হৃদয়ে হানিয়ে বাজ ॥
তোমায় জানি আপনার, দোষ লয়ো না আমার ;
ভক্তসঙ্গে রসরঙ্গে এসহে একবার ;
আমার তাপিত জীবন শীতল ক'রে,
হৃদয়ে কর বিরাজ ॥ (আমার)

সম্পূর্ণ।